# SHADOWS IN PARADISE

by Erich Maria Remarque

Translated into Bengali by Asit Sarkar

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৬২

প্রকাশিকা :

লতিকা সাহা / মডার্ন কলাম

১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রণ :

জি. শীল / ইম্প্রেসন প্রবলেম

২৭এ, তারক চ্যাটার্জী লেন, কলকাতা-৭০০০০৫

প্রচ্ছদ : কুমারঅজিত

গেস্টাপোর হাতে নিহত বিপ্লবী সৈনিকদের

## আমাদের প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ

# এক

কয়েক মাস আগে মালবাহী একটা জাহাজে করে আমি লিসবন থেকে এখানে এসে পৌঁছেছি। ইংরিজি প্রায় জানি না বললেই চলে। এ যেন বোবা-কালা অবস্থায় আমাকে ফেলে দেওয়া হয়েছে অন্য কোনো গ্রহে। এবং আমেরিকা সত্যিই সেই অন্য গ্রহ, কেননা ইউরোপে তখন যুদ্ধ চলছে।

তাছাড়া আমার কাগজপত্রও স্বাভাবিক অবস্থায় ছিলো না। বলতে গেলে এক রকম অলৌকিক ভাবেই বৈধ একটা আমেরিকান ভিসার সাহায্যে আমি এ দেশে ঢুকতে পেরেছি, কিন্তু ছাড়পত্রে আমার নিজের নাম ছিলো না। অভিবাসন কর্তৃপক্ষের সন্দেহক্রমে আমাকে কিছু-দিনের জন্যে এলিস দ্বীপে আটকেও পড়তে হয়েছিলো। ছ সপ্তা পরে ওরা আমাকে তিন মাসের জন্যে থাকার অনুমতি দিয়েছিলো। আশা করছিলাম ওই সময়ের মধ্যে অন্য কোনো দেশের অনুমতিপত্র জোগাড় করতে পারবো। ইউরোপে থাকার সময় থেকেই আমি এই ধরনের অবস্থার সঙ্গে পরিচিত। শুধু দিন বা মাস নয়, বছরের পর বছর এই ভাবে বসবাস করে আসছি। ১৯৩৩ সাল থেকে জার্মান-উদ্বাস্তু হিসেবে আমি সরকারী ভাবে মৃত। তবু এই তিনটে মাস অন্তত আমাকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হবে না, কেননা স্বপ্ন আজ নিজেই বাস্তবে পরিণত হয়েছে। এবং মৃত মানুষের ছাড়পত্র নিয়ে বেঁচে থাকাটা আমার কাছে আদৌ রহস্যময় মনে হয়নি। ছাড়পত্রটা আমার হাতে এসেছিলো ফ্রাঙ্কফুর্টে। মরার ঠিক আগের মুহূর্তে যে লোকটা আমাকে ছাড়পত্রটা দিয়েছিলো, তার নাম ছিলো রস। তাই আমার নাম এখন রস। আমার প্রকৃত নামটা প্রায় ভুলেই গেছি। কারুর জীবন যখন বিপন্ন তখন তাকে অনেক কিছুই ভুলে যেতে হয়।

এলিস দ্বীপে তুরস্কের এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিলো, যিনি বছর দশেক আগে আমেরিকায় ছিলেন। সেই ভদ্রলোকই আমাকে নিউ ইয়র্কে বসবাসকারী একজন রুশীর ঠিকানা দিয়েছিলেন, যে কুড়ি বছর আগে রাশিয়া থেকে পালিয়ে এসেছিলো। বছর দশেক আগে যথেষ্ট হৃদ্যতা থাকা সত্ত্বেও রাশিয়ান লোকটা এখনও বেঁচে আছে কিনা সে সম্পর্কে তিনি সুনিশ্চিত ছিলেন না। এলিস দ্বীপ থেকে ছাড়া পাওয়ার দিনই আমি নিউ ইয়র্কের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমালাম এবং সেখানে পৌঁছেই সেই লোকটিকে খুঁজে বার করলাম।

লোকটির নাম মেলিকভ। ব্রডওয়ের কাছে ছোট একটা হোটেলে কাজ করে। পরিচয় দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বয়স্ক সেই লোকটা সোজা আমাকে তার ঘরে নিয়ে গেলো। অভিজ্ঞ একজন উদ্বাস্তু হিসেবে সে এক নজরেই বুঝতে পারলো আমার কি কি প্রয়োজন—মাথা গোঁজার আস্তানা আর যে কোনো একটা কাজ। আস্তানাটা তেমন কোনো সমস্যা নয়, তার নিজেরই একটা বাড়তি শয্যা আছে। কিন্তু কাজের ব্যাপারটাই যা একটু জটিল, কেননা পর্যটনপত্রের নিয়ম অনুসারে আমার এখানে কাজ করার কোনো অধিকার নেই। আর যদি কোনো কাজ পাইও, আমাকে তা করতে হবে লুকিয়ে-চুরিয়ে। এসব আমার অজানা নয়, আর এর জন্যে খুব একটা ভাবিও না। এখনও আমার কাছে সামান্য কিছু অর্থ আছে।

'প্রয়োজনের জন্যে কি ধরনের কাজ করতে পারেন, সে সম্পর্কে কি কিছু ভেবেছেন?' মেলিকভ আমাকে জিগেস করলো।

'শেষবার আমি ফ্রান্সে সন্দেহজনক চিত্র আর নকল প্রাচীন নিদর্শন কেনা-বেচার কাজ করেছি।'

'এ সম্পর্কে বিশেষ কোনো ধারণা আছে?'

'না, তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। তবে একেবারে যে নেই, তাও নয়।'

'কোথায় শিখেছেন?'

'ব্রুসেলস্ জাদুঘরে বছর দুয়েক ছিলাম।'

'কাজ করেছেন?' অবাক হয়ে মেলিকভ প্রশ্ন করলো।

'না, লুকিয়ে ছিলাম।'

'পুলিসের ভয়ে?'

'না, বেলজিয়াম অধিকার করে রাখা জার্মানদের ভয়ে।'

'দু বছর! ওরা আপনাকে খুঁজে পায়নি?'

'না। তবে দুবছর পরে যে ভদ্রলোক আমাকে লুকিয়ে রেখেছিলেন, তাঁকে ওরা ধরতে পেরেছিলো।'

বিস্ময় ভরা চোখে মেলিকভ তাকালো আমার মুখের দিকে। 'আর আপনি পালাতে পেরেছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'সেই ভদ্রলোকের আর কোনো খবর পাননি?'

'ওরা তাঁকে একটা শিবিরে পাঠিয়ে দিয়েছিলো।'

'ভদ্রলোক কি জার্মান?'

'না, বেলজিয়ান। জাদুঘরের তত্ত্বাবধায়ক।'

'কিন্তু এতদিন ধরা না পড়ে আপনি কাটালেন কেমন করে? জাদুঘরে কেউ যায় না?'

'যায়। দিনের বেলায় মাটির নিচের ভাঁড়ার ঘরে উনি আমাকে চাবি দিয়ে রাখতেন। সন্ধ্যে বেলায় বন্ধ হয়ে যাবার পর উনি আমার খাবার নিয়ে আসতেন। রাতটার জন্যে আমি ছাড়া থাকতাম। ভাঁড়ার থেকে বেরিয়ে আমি জাদুঘরের ভেতরেই ঘুরে বেড়াতাম, কিন্তু আলো ব্যবহার করতে পারতাম না।'

'অন্য কর্মচারীরা জানতে পারেনি?'

'না, মাটির নিচের ভাঁড়ার ঘরটায় কোনো জানলা ছিলো না। লোকজনও বড় একটা সেখানে যেতো না। আমার শুধু ভয় ছিলো হেঁচে ফেলার।'

'সেই জন্যেই কি ওরা আপনাকে খুঁজে পেয়েছিলো?'

'না, কেউ কেউ লক্ষ্য করেছিলো বন্ধ হয়ে যাবার পরেও অনেকক্ষণ

পর্যন্ত তত্ত্বাবধায়ক প্রায়ই জাদুঘরে উপস্থিত থাকতেন।'

'এবার বুঝতে পেরেছি।' মেলিকভ যেন কিছুটা স্বস্তি পেলো। 'পড়তে পারতেন?'

'খুব সামান্য। গ্রীষ্মের বিকেলগুলো আর উজ্জ্বল চাঁদের আলোয় কেবল যতটুকু সম্ভব ছিলো।'

'কিন্তু রাত্তিরে ঘুরে ঘুরে পুরাতত্ত্বের যত নিদর্শন আর ছবি দেখতে পারতেন?'

'হ্যাঁ, অন্তত যতক্ষণ পর্যন্ত আলো থাকতো।'

হঠাৎ মনে পড়ার ভঙ্গিতে মেলিকভ মুচকি মুচকি হাসলো। 'রাশিয়া থেকে পালিয়ে আসার সময় ফিনল্যাণ্ডের সীমান্তে একগাদা কাঠের গুড়ির মধ্যে আমাকেও ছদিন লুকিয়ে থাকতে হয়েছিলো। বেরিয়ে আসার পর মনে হয়েছিলো যেন কতকাল সেখানে লুকিয়ে ছিলাম। অবশ্য তখন বয়েস অল্প ছিলো, আর অল্প বয়েসে সব কিছুই মনে হতো মন্থর।'

'হ্যাঁ, তা অবশ্য ঠিক।'

'দিনের বেলায় ভাঁড়ার ঘরে কি করতেন?' মেলিকভ জানতে চাইলো। 'অন্তত পাগল হয়ে যাওয়ার হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে?'

'সন্ধ্যেগুলোর জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকতাম। সব সময়েই আপ্রাণ চেষ্টা করতাম—আমি যে বিপদের মধ্যে রয়েছি সে সম্পর্কে কিছু না ভাবতে। তারপর রাত্তিরে ঘরগুলো ঘুরে ঘুরে দেখতাম, প্রতিটা ছবি গেঁথে নিতাম মনের মধ্যে। কিছু দিনের মধ্যেই আমার সমস্ত ছবি মুখস্থ হয়ে গিয়েছিলো। দিনের বেলায় ভাঁড়ার ঘরের অন্ধকারে বসে আমি সেইসব ছবি স্মরণ করার চেষ্টা করতাম। এলোমেলো নয়, বরং অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ভাবেই একটার পর একটা ছবি আমি বিশ্লেষণ করতাম। কখনও কখনও একটা মাত্র ছবিকে নিয়ে—তার গঠন প্রণালী, তার রীতি, তার বিন্যাস, তার অভিব্যক্তি, তার রঙের কথা ভাবতে ভাবতেই আমার সারাটা দিন কেটে যেতো। কখনও যদি হতাশায় ম্লান হয়ে উঠতাম,

আমি আবার গোড়া থেকে ভাবতে শুরু করতাম। ফলে দেওয়ালে মাথা না কুটে, মাঝে মাঝে আমার মনে হতো—না, সত্যিই আমার স্মৃতি-শক্তির যথেষ্ট উন্নতি ঘটছে।'

'ওখানে কোনো প্রহরী থাকতো না?'

'শুধু দিনের বেলায়। রাত্তিরে চাবি দেওয়া থাকতো। সেটা আমার পক্ষে সৌভাগ্যই বলতে পারেন।'

'কিন্তু দুর্ভাগ্য সেই মানুষটার যিনি আপনাকে লুকিয়ে রেখেছিলেন।'

চকিতে আমি মেলিকভের দিকে তাকালাম। না, তার মুখের অভিব্যক্তিতে বিদ্বেষের কোথাও কোনো চিহ্ন নেই। আমাকে সে আঘাত করতে চায়নি, কেবল প্রসঙ্গ ক্রমেই কথাটা তার মনে এসেছিলো। তাই আমি ছোট্ট করে শুধু বললাম, 'হ্যাঁ, সত্যিই দুর্ভাগ্য।'

'কাজ ছাড়া তো বেশিদিন চলবে না?'

'না। আচ্ছা বাইরে খেতে গেলে কেমন খরচ পড়ে?'

'প্রায় দেড় ডলার। যুদ্ধ শুরু হবার পর থেকে সব জিনিসেরই দাম অসম্ভব বেড়ে গেছে।'

'কিন্তু এখানে তো যুদ্ধ নেই।'

'এখানেও যুদ্ধ চলছে। অবশ্য সেটা আপনার পক্ষে এক রকম সৌভাগ্যই বলতে পারেন। এখানে কাজের লোকের দরকার। কিছু একটা জোগাড় করা হয়তো খুব একটা কঠিন হবে না।'

'কিন্তু আমার শুধু তিন মাসের অনুমতিপত্র রয়েছে।'

মেলিকভ হাসলো। 'আমেরিকা একটা বিরাট দেশ এবং এখানে এখন যুদ্ধ চলছে। সেদিক থেকে আবার বলবো—আপনি ভাগ্যবান। কোথায় জন্মেছেন?'

'ছাড়পত্র অনুযায়ী হামবুর্গ। আসলে হ্যানোভারে।'

'ওদুটো জায়গার কোনোটাতেই ওরা আপনাকে ফেরত পাঠাবে না। ইচ্ছে করলে ওরা আপনাকে কোনো অন্তরণশিবিরে রেখে দিতে পারে।'

'ফ্রান্সে ওই রকম একটা শিবিরে আমি কিছুদিন ছিলাম।'

'পালিয়ে এসেছেন ?'

'না, ঠিক পালিয়ে নয়। পরাজয়ের খবর পাওয়ার এক বিশৃঙ্খল মুহূর্তে আমি সোজা বাইরে বেরিয়ে এসেছিলাম।'।

'আর তথাকথিত বিজয়ের এক বিশৃঙ্খল মুহূর্তে আমি ফ্রান্সে ছিলাম। সেটা ১৯১৮ সালে। রাশিয়া থেকে ফিনল্যাণ্ড, জার্মানী পেরিয়ে ফ্রান্সে পৌঁছেছিলাম। দেশত্যাগের সেটাই ছিলো প্রথম ঢেউ।'

আমরা দুজনে আবার হোটেলে ফিরে এলাম, কিন্তু ভেতরে ভেতরে আমি তখন চঞ্চল হয়ে উঠেছি। আমি কিছু পান করতে চাইনি, কেননা দীর্ঘ অনভ্যাসের ফলে শরীরে ঠিক সহ্য হবে কিনা জানি না। মেলিকভের ঘরটা খুব ছোট। এই রকম একটা ঘরেই আমাকে দীর্ঘদিন বন্দী হয়ে থাকতে হয়েছে। তাই জিগেস করলাম, 'আচ্ছা, কতক্ষণ পর্যন্ত আমি বাইরে কাটাতে পারবো ?'

'যতক্ষণ তোমার খুশি।'

'তুমি কখন শুতে যাও ?'

'ও নিয়ে তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না। সাধারণত ভোরের আগে নয়। এখন আমার ডিউটি রয়েছে। তোমার কি কোনো মেয়েমানুষ চাই ? পারির মতো নিউ ইয়র্কে মেয়েমানুষ পাওয়া খুব একটা সহজ নয়, এবং কিছুটা বিপজ্জনকও বটে।'

'না না, আমি শুধু এমনিই একটু ঘুরে বেড়াতে চাই।'

'রাস্তায় রাস্তায় না খুঁজে তুমি বরং এই হোটেলেই ওদের পেয়ে যাবে।'

'বিশ্বাস করো, সত্যিই আমার ওসব কিছু লাগবে না। আর যদি কখনও লাগে আমি তোমাকে নিশ্চয়ই জানাবো।'

'তাহলে যাও,' ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতো মেলিকভ আমার কাঁধে হাত রাখলো। 'রাস্তার নম্বর আর হোটেলের নামটা মনে রেখো—হোটেল রুবেন। নিউ ইয়র্কে রাস্তা খুঁজে পাওয়া খুব সহজ। দু একটা ছাড়া, অধিকাংশ রাস্তারই কোনো নাম নেই, শুধু নম্বর।'

মনে মনে ভাবলাম, ঠিক আমার মতো—যার নিজস্ব কোনো নাম নেই, কেবল একটা সংখ্যা। অবশ্য ছদ্মনামে আমি বেশ ভালোই মানিয়ে গেছি, নইলে অনেক ঝামেলায় পড়তে হতো।

অচেনা শহরটার মধ্যে দিয়ে আমি যেন ভেসে চলেছি। আমার চারপাশে চিৎকার-চেঁচামেচি, হাসি, শব্দ আর কথার অবিরাম বৃষ্টিপাত। ইউরোপে অন্ধকার কয়েকটা বছর কাটিয়ে আসার পর এখানে যাকেই দেখছি, সবাইকে মনে হচ্ছে যেন প্রমিথিয়ুস। বিজলীর উজ্জ্বল আলো ঝলমলে দোকানের সামনে দাঁড়ানো ঘর্মাক্ত মানুষগুলো আমাকে মোজা বা তোয়ালে কেনার জন্যে অনুরোধ করছে। যেহেতু দালাল, পরিবেশক বা ফেরিওয়ালা, ওদের কারুরই কথা আমি বুঝতে পারছি না, ওরা এমন ভাবে আমার দিকে তাকাচ্ছে, যেন আমি মঞ্চে অভিনয় করে চলা দুর্বোধ্য কোনো চরিত্র। আমি ওদেরই মধ্যে রয়েছি, অথচ ওদের কেউ নয়। ওদের আর আমার মধ্যে যেন গড়ে উঠেছে একটা অদৃশ্য প্রাচীর। ওরা যে আমার প্রতি কোনো বিদ্বেষ পোষণ করছে তা কিন্তু নয়, এই উপলব্ধিটা গড়ে উঠেছে কেবল আমার নিজের মনের মধ্যে।

আমি জানি দু একদিনের মধ্যেই এই অনুভূতিটুকু নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তার মানে এই নয় যে আমি এইসব মানুষগুলোর আরও কাছাকাছি এসে পৌঁছবো। না, আদৌ সে সম্ভাবনা নেই। আগামীকাল কিংবা পরশু থেকেই মিথ্যাচার আর প্রবঞ্চনায় নিজের দৈনন্দিন অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্যে আমাকে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। কিন্তু আজ রাতটার জন্যে এই অচেনা শহরটা তার নিরপেক্ষ মুখ তুলে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে আমার দিকে, এখনও তার জালে আমাকে ছেঁকে তোলেনি, বরং সমান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রয়েছে। নিশ্চল হয়ে রয়েছে সময়, যেন অন্ধকারে এই মুহূর্তটার জন্যে স্থবির আর চঞ্চলতার মাঝামাঝি একটা জায়গায় ন্যায়দণ্ডের পাল্লাদুটো একেবারে কাঁটায় কাঁটায় স্থির হয়ে রয়েছে।

এখানে আমি রয়েছি নিরাপত্তার একটা স্বর্গে—বিপদ মুক্ত। পরক্ষণেই মনে হলো, প্রকৃত বিপদটা বাইরে নয়, সেটা রয়েছে আমার সত্তার গহন গভীরে। সুদীর্ঘ কয়েকটা বছর কেবল নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্যেই সারাক্ষণ আমাকে উৎকন্ঠিত হয়ে থাকতে হয়েছে। কিন্তু কাল, কিংবা রহস্যময় এই মুহূর্তটা থেকেই হয়তো জীবন তার সমস্ত প্রাচুর্য নিয়ে নিজেকে মেলে ধরবে আমার সামনে। হয়তো আবার আমার কাছে অর্থময় হয়ে উঠবে ভবিষ্যৎ। কিন্তু এটাও সত্যি—যদি ভুলতে না পারি, তাহলে অতীতও খুব সহজে আমাকে মুক্তি দেবে না।

হঠাৎ বুঝতে পারলাম যে এটা একটা নতুন জীবনের শুরু। কিন্তু ক্ষত-বিক্ষত, ভাঙাচোরা এই জীবন নিয়ে কি আবার নতুন করে শুরু করতে পারবো? অজানা ভাষায় কেমন করে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া সম্ভব? সবচেয়ে যা ভয়ঙ্কর, বিগত কয়েকটা বছর নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্যে সংগ্রামের পর, এখন আবার শিখতে হবে কেমন করে বেঁচে থাকতে হয়। আর জীবনে যদি সত্যিই কখনও ফিরে আসতে সক্ষম হই, তাহলে কি সেটা আমার মৃত বন্ধু আর প্রিয়জনদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে না?

আমি ফিরে চললাম। কেমন যেন উন্মন আর চাপা একটা অস্বস্তি নিয়েই হোটেলের দিকে দ্রুত পা চালালাম। এবার আর আশেপাশে কোনো দিকে তাকালাম না। দূর থেকে হোটেলের প্রবেশ পথের ওপর অস্পষ্ট নিওন বাতিটা চোখে পড়তেই আমার শ্বাস যেন রুদ্ধ হয়ে এলো।

দরজার পাল্লায় ঝুটো মর্মর পাথরের টুকরো বসানো—কোনোটা উজ্জ্বল, কোনোটা নিষ্প্রভ, কোনোটা বা আবার উধাও হয়ে গেছে। ভেতরে গিয়ে দেখলাম ডেস্কের ওপারে দোলন-চেয়ারটায় বসে বসে মেলিকভ ঢুলছে। পায়ের শব্দ পেতেই সে চোখ মেলে তাকালো। মুহূর্তের জন্যে মনে হলো তার চোখের পাতা নেই, বুড়ো তোতার মতো নিষ্পলক। কিন্তু পরক্ষণে কেঁপে উঠতেই দেখলাম, চোখের মণিদুটো গাঢ় নীল। উঠে দাঁড়িয়ে সে জিগেস করলো:

'দাবা খেলতে জানো?'

'সব উদ্বাস্তুরাই দাবা খেলতে জানে।'

'বাঃ! দাঁড়াও, আগে ভদকার বোতলটা নিয়ে আসি।'

মেলিকভ ওপরের তলায় চলে গেলো। চারদিকে তাকিয়ে মনে হলো দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর আমি যেন আবার নিজের ঘরে ফিরে এসেছি।

## দুই

পরের কয়েকটা সপ্তাহ ইংরিজি শেখার ব্যাপারে গভীর মনোযোগ দিলাম। সকালবেলায় ব্যাকরণ মুখস্থ করি আর বন্ধ ঘরে একা একাই কথা বলি। সন্ধ্যেবেলায় মেলিকভের সঙ্গে দাবা খেলি। ভালো বলতে না পারলেও আজকাল ইংরিজিটা বুঝতে তেমন অসুবিধে হয় না।

মেলিকভ প্রায়ই ঠাট্টা করে, 'আমেরিকান কোনো বান্ধবী জোটাতে পারলে ইংরিজিটা তাড়াতাড়ি শিখতে পারতে।'

'ব্রুক্‌লিনের?'

'সবচেয়ে ভালো হতো বোস্টনের কোনো মেয়ে পেলে। ওখানকার ইংরিজিই সব চাইতে ভালো।'

'আমার পৃথিবীটা যে কি দ্রুত বদলে যাচ্ছে তুমি ভাবতেই পারছো না, ভ্লাদিমির।'

'তাই নাকি!' মেলিকভ হেসে ওঠে।

অদ্ভুত একটা শব্দে আমি দাবার ছকের ওপর দিয়ে বাইরে তাকাই। কে যেন খোঁড়াতে খোঁড়াতে ঘরে ঢোকে। যেহেতু আমরা আধো আলো ছায়ায় বসে রয়েছি, তাই লোকটাকে স্পষ্ট দেখতে পাইনি। কিন্তু তার অদ্ভুত ভাবে খুঁড়িয়ে চলার ভঙ্গিটা আমার ভীষণ চেনা মনে হলো। পরক্ষণেই স্তব্ধ বিস্ময়ে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'লাখ্‌মান, তুমি!'

'আমার নাম মার্টিন।'

লোকটা আমাদের দিকে এগিয়ে এলো।

আমি আলোটা জ্বালিয়ে দিলাম। অদ্ভুত একটা আভায় ভরে উঠলো ঘরখানা।

'আরে, রবার্ট। তুমি এখানে আবার কোত্থেকে এসে জুটলে?' এবার অস্ফুট বিস্ময়ে বলে উঠলো সেই খোঁড়া লোকটা। 'এখনও বেঁচে আছো তাহলে? আমি তো ভেবেছিলাম অনেককাল আগেই মরে গেছো।'

'তোমার ক্ষেত্রে আমিও ঠিক তাই ভেবেছিলাম কুর্ট। শুধু চিনতে পারলাম তোমার হাঁটা দেখে।'

'আমার খোঁড়ানোর দ্বিমাত্রিক ছন্দ শুনে?'

'না, তোমার ওয়ালস্ নাচের ছন্দে পা ফেলার ভঙ্গি দেখে। ভ্লাদিমির মেলিকভকে তুমি চেনো?'

'নিশ্চয়ই।'

'তুমি কি কাছাকাছিই কোথাও থাকো?'

'না। তবে প্রায়ই এখানে আসি।'

'তাহলে এখন তোমার নাম মার্টন?'

'হ্যাঁ। আর তোমার?'

'রস।'

লাখ্মান ম্লান ঠোঁটে হাসলো। 'তাহলে আবার আমাদের দেখা হয়ে গেলো?'

কিছুটা দ্বিধা নিয়েই আমরা দুই উদ্বাস্তু নিশ্চুপ হয়ে রইলাম। কেননা কে বেঁচে আছে আর কে মারা গেছে, সে সম্পর্কে প্রশ্ন করাটা কতটা নিরাপদ আমরা কেউই বুঝতে পারছি না।

'কোনের কোনো খবর আছে?' শেষ পর্যন্ত আমিই প্রশ্ন করলাম। এটা একটা প্রচলিত কায়দা—অন্তরঙ্গ কোনো বন্ধুর খবর জিগেস করার আগে উভয়ের স্বল্প পরিচিত বন্ধু-বান্ধবদের দিয়েই প্রথমটা শুরু করতে হয়।

'ও এখন নিউ ইয়র্কেই রয়েছে।'

'সেকি ! ও কেমন করে এখানে জুটলো ?'

'অনেকটা কপাল জোরে কিংবা হঠাৎই বলতে পারো।'

বড় আলোটা নিভিয়ে মেলিকভ ডেস্কের নিচে থেকে একটা ভদকার বোতল বের করলো। 'এটা আমেরিকান ভদকা। অবশ্য ইচ্ছে করলে ক্যালিফোর্নিয়ান বোর্দো আর বারগাণ্ডি থেকে শুরু করে চিলিয়ান রাইন—যা চাইবে সবই পাবে। দীর্ঘদিন পর উদ্বাস্তুর সঙ্গে কোনো উদ্বাস্তুর দেখা হয়ে গেলে, স্মৃতি রোমন্থনের জন্যে মদই সবচাইতে অন্তরঙ্গ সাথী।'

হোটেলের একজন অতিথি এসে পড়ায় মেলিকভ তার জন্যে চাবি আনতে গেলো। ওর অপসৃয়মান দীর্ঘ ছায়াটার দিকে তাকিয়ে লাখ্‌মান বললো, 'লোকটা অসম্ভব চাপা। তুমি কি ওর হয়ে কাজ করছো ?'

'হোটেলের সাধারণ একজন কেরানির হয়ে কি করে কাজ করা সম্ভব তুমিই বলো ?'

'নিউ ইয়র্ক শহরে ওর প্রচুর জানাশোনা আর বেশ ভালো হাত আছে। তাছাড়া খানদানী কয়েকটা মালও আছে।'

'মাল বলতে ?'

'মেয়েমানুষ।'

'তুমি কি সেই জন্যেই এসেছো ?'

'না, আমি এসেছি অন্য একজন মহিলার জন্যে, যার প্রেমে প্রায় পাগল বললেই চলে। মহিলাটি পোর্তো রিকান, পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়েস, ক্যাথলিক। ওরও একটা পা নেই, থাকে মেক্সিকান একটা কোট্‌নার সঙ্গে। পাঁচ ডলারের বিনিময়ে লোকটা আমাদের জন্যে বিছানাও করে দিতে পারে। কিন্তু ও সেটা পছন্দ করে না। ওর ধারণা ভগবান নাকি রাত্তিরেও দেখতে পায়। পয়সা নেবে, অথচ ওসব কিছু করতে দেবে না। এ প্রসঙ্গে কোনো অনুরোধ করলে হাসতে হাসতে পরের বারে করার প্রতিশ্রুতি দেবে। অথচ ওর মাই দেখলে তোমার মাথা খারাপ হয়ে যাবে, মনে হবে ঠিক যেন গরম পাথর দিয়ে তৈরি।'*

'না, কুর্ট; তুমি দেখছি একটুও পাল্টাওনি।'

আমি স্পষ্টই অনুভব করতে পারলাম, নিজে পঙ্গু বলে লাখ্‌মান খোঁড়া মহিলাটিকে পাবার জন্যে একেবারে ক্ষেপে উঠেছে। নইলে রাজনৈতিক কারণে এই লাখ্‌মানকেই একদিন বার্লিন সদর-দফতরে এস. এস.-দের হাতে নির্মম নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে, চিরদিনের জন্য খুইয়ে আসতে হয়েছে একটা পা। এমন কি ফ্রান্সে পালিয়ে আসার পর, নানান অসুবিধের মধ্যেও ও সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলো। আজ শুধু একটু ভালোবাসা পাবার মোহেই ও এমন পাগল হয়ে উঠেছে।

'আমরা কোনোদিনও পালটাই না, রবার্ট। নতুন পাতার স্বপ্নে কখনও কখনও দুর্ভাগ্যকে মেনে নিই বটে, কিন্তু বিপদ কেটে গেলে আবার দেখবে ঠিক জায়গায় পৌঁছে গেছি।' লাখ্‌মান হাসলো। 'তুমিও কিন্তু একটুও পালটাওনি। বিশেষ করে তোমার সেই ভাবুক-ভাবুক ভাবটা দেখছি একই রকম রয়েছে।'

'আমার নিজের বলতে শুধু ওটাই আছে, কুর্ট।'

'ওহো, ভুলে গেছি,' হঠাৎ মনে পড়ার ভঙ্গিতে লাখ্‌মান পকেট হাতড়ে একটা কাগজের মোড়ক বার করলো। 'এটা পোপের আশীর্বাদী একটা জপের মালা। খাঁটি রুপো দিয়ে বাঁধানো, আসল হাতির দাঁতের তৈরি। তোমার কি মনে হয় এতে ওর মন কিছুটা নরম হতে পারে?'

'কোন্ পোপ?'

'পোপ পিয়াস ছাড়া আবার কে হতে যাবেন বলো?'

'বেনিডিক্ট পঞ্চদশ হলে আরও ভালো হতো।'

'তার মানে?' ক্রুদ্ধ চোখে লাখ্‌মান তাকালো আমার দিকে। 'উনি তো মারা গেছেন!'

'মৃত পোপের আশীর্বাদ অনেক বেশি কার্যকর হতো।'

'ও, এবার বুঝতে পেরেছি। এটাও তোমার সেই পুরনো চালাকি। আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। গতবার আমরা যখন…'

'চুপ করো!'

'কেন?' লাখ্‌মান অবাক হলো।

'না, কুর্ট। ও সম্পর্কে আর একটা কথাও বলবে না।'

'বেশ, তুমি যখন চাও না…' লাখ্‌মান ইতস্তত করলো, মনে হলো অভিমানে ও বুঝি এখুনি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবে। কিন্তু তখনও সব কথা মন খুলে বলতে না পারায় ওর বুকের ভেতরটা ফুলে উঠছে। পকেট থেকে ও আর একটা সবুজ মোড়ক বার করলো। 'এটা গেৎসেমেন থেকে আনানো মাউণ্ট অফ্‌ অলিভস্‌-এর আসল জলপাইয়ের বীচি। তোমার কি মনে হয় এতেও ওর মন গলানো যাবে না?'

'নিশ্চয়ই যাবে, কুর্ট। তুমি একটুও হতাশ হয়ো না।'

'ঠিক বলছো?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে যাই, ওর সঙ্গে একবার দেখা করে আসি।'

'আমিও একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসবো, মাথাটা বড্ড ধরে আছে। পরে আবার দেখা হবে।'

ফিরে এসে দেখলাম মেলিবভ তখনও তার কাজের টেবিলের সামনে বসে রয়েছে। আমি ওকে জিগেস করলাম,'লাখ্‌মান পরে কি আবার ফিরে এসেছিলো?'

'না, ও এখনও ওর প্রেমিকার ঘরেই রয়েছে।'

'তোমার কি মনে হয় এবারে ও সফল হতে পারবে?'

'আদৌ না। এবারেও পোর্তো রিকান মহিলাটি ওকে মেক্সিকান লোকটার সঙ্গে নৈশভোজের আমন্ত্রণ জানাবে এবং যথারীতি টাকাটা ওকেই দিতে হবে।'

'জানো, আগে কিন্তু ও এ রকম ছিলো না। জার্মানীর শাস্তিশিবিরে একটা পা খোয়ানোর পর থেকেই মেয়েদের সম্পর্কে ওর অদ্ভুত একটা মনোভাব গড়ে উঠেছে। ওর ধারণা সুন্দর দেখতে মেয়েরা ওকে নিশ্চয়ই ঘৃণা করবে।'

'ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কোনো লাভ নেই।' বোড়েগুলো সাজাতে সাজাতে মেলিকভ বললো। 'তুমি যখন বুড়ো হয়ে পড়বে, দেখবে সুন্দর-অসুন্দরটা আদৌ কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়।'

'তুমি এখানে কত দিন রয়েছো, ভ্লাদিমির?'

'কুড়ি বছর।'

দরজায় কার যেন ছায়া পড়লো। রীতিমতো লম্বা, ছিপছিপে চেহারার একটি মেয়ে। ছোট্ট মুখখানা কেমন যেন ম্লান, গুচ্ছ গুচ্ছ সোনালী চুল, টানাটানা ধূসর দুটো চোখ।

মেলিকভ চেয়ার ছেড়ে দ্রুত উঠে দাঁড়ালো। 'নাতাশা পেএভ্না, তুমি! কবে ফিরেছো?'

'সপ্তা দুয়েক আগে।'

আমি দাঁড়িয়েই ছিলাম, দেখলাম মেয়েটি আমার মাথায় মাথায়। আঁট-সাট পোশাকে ওকে খুবই রোগা দেখাচ্ছে। কথা বলার ভঙ্গিটা দ্রুত হলেও, একটু চড়ার ওপর কণ্ঠস্বরটা আশ্চর্য ধ্বনিময়।

মেলিকভ জিগেস করলো, 'কি খাবে—ভদকা, হুইস্কি?'

'ভদকা। তবে ঠিক এক আঙুল পরিমাণ। আমাকে এখন আবার কাজে ফিরে যেতে হবে।'

'এখন আবার কাজ কি?'

'মডেলদের তো এখনই কাজের সময়। সন্ধ্যেবেলা ছাড়া আলোক-চিত্রীদের ছবি তোলার সময় কোথায়?'

তখনই মনে হলো নাতাশার চেহারাখানা মডেলদের উপযুক্তই বটে।

মেলিকভ বোতল আনতে গেলো। নাতাশা জিগেস করলো:

'আপনি কি আমেরিকান?'

'না, জার্মান।'

'জার্মানদের আমি ঘেন্না করি।'

'আমিও তাই।'

মেয়েটি অবাক চোখ মেলে আমার দিকে তাকালো। 'আমি অবশ্য

ব্যক্তিগত ভাবে কাউকে উল্লেখ করতে চাইনি।'

'আমিও না।'

'আমি ফরাসী। বুঝতেই পারছেন, যুদ্ধের সময় সেখানে যে ধরনের...'

নিশ্চয়ই।' শান্ত স্বরেই বাধা দিলাম। নাৎসিদের অপকর্মের জন্যে একটা জাত হিসেবে নিজেকে অপরাধী ভাবাটা এই আমার প্রথম নয়। যুদ্ধের সময় একটা ফরাসী অন্তরণশিবিরে আমাকে কিছুদিন কাটাতে হয়েছিলো, তা বলে আমি ফরাসীদের ঘৃণা করিনি। এসব কথা অবশ্য ওকে বলে লাভ নেই। বরং মেয়েটির আদিম সরলতাকে আমি মনে মনে প্রশংসা না করে পারলাম না।

ভদকার বোতল আর তিনটে ছোট গেলাস নিয়ে মেলিকভ ফিরে এলো। আমি বললাম, 'আমার লাগবে না।'

মেয়েটি জিগেস করলো, 'ওমা, সেকি। আপনি আমার কথায় রাগ করেছেন বুঝি?'

'না না, এমনিই...এ সময়ে ঠিক খেতে ইচ্ছে করছে না।'

নাতাশার গেলাসটা মেলিকভ এগিয়ে দিলো। অশ্বশাবকের মতো গ্রীবা বেঁকিয়ে নাতাশা সবটুকু ভদকা একবারেই গলায় ঢেলে দিলো।

প্রত্যাখ্যানের জন্যে আমার নিজেরই খারাপ লাগলো, কিন্তু তখন দেরি হয়ে গেছে। মেলিকভ বোতলটা তুলে নিলো। 'তোমাকে আর একটু দিই, নাতাশা?'

'না, ধন্যবাদ ভলাদিমির ইভানভিচ। কাজে ফিরতে দেরি হয়ে যাবে। চলি।'

নাতাশা আমার দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিলো। 'বিদায় মঁসিয়ে। আবার দেখা হবে।'

'বিদায়, মাদাম।' ওই রকম চেহারার কোনো মহিলার মুঠোয় যে এত জোর থাকতে পারে আমি কল্পনাও করতে পারিনি।

মেলিকভ দরজা পর্যন্ত ওকে এগিয়ে দিয়ে আবার ফিরে এলো।

'ও কি তোমাকে অপমান করেছে?'

'কই, না তো।'

'ও কিন্তু সবাইকেই বিদ্রূপ করে। তুমি যেন ওর কথায় কিছু মনে কোরো না।'

'ও কি রুশ না ফরাসী?'

'দুটোই। ওর বাবা-মা রুশ, কিন্তু জন্মেছে ফ্রান্সে।'

'ভ্লাদিমির, খেলাটা নতুন করে শুরু করার আগে মনে হচ্ছে আমার সত্যিই একটু ভদকা চাই।'

'বেশ তো।' গেলাসটা আধাআধি ভর্তি করে মেলিকভ আমার দিকে এগিয়ে দিলো।

বেশ কিছুটা নৈঃশব্দ্যের পর মেলিকভ কান খাড়া করে কি যেন শুনলো। 'ওই, ওরা আসছে মনে হচ্ছে।'

সিঁড়িতে কয়েকজনের মিলিত পায়ের শব্দ শোনা গেলো, তার সঙ্গে বেশ মিষ্টি রিনরিনে একটি মহিলা কণ্ঠস্বর। উনি নিশ্চয়ই লাখ্‌মানের সেই পোর্তো রিকান প্রেয়সী। কিন্তু উনি আদৌ খোঁড়চ্ছেন না, এমন কি চট করে দেখলে মনেও হবে না যে ওঁর একটা পা কৃত্রিম।

মেলিকভ ফিসফিসিয়ে বললো, 'এবার ওরা চললো লাখ্‌মানের ঘাড় মটকাতে।'

'সত্যিই বেচারি লাখ্‌মান।'

'কিন্তু মানুষের অবস্থা তখনই সব চাইতে কাহিল হয়, যখন কোনো কিছু আশা করা সে ছেড়ে দেয়।'

'তা অবশ্য সত্যি। তাহলে তুমি বলতে চাইছো ভদ্রমহিলার পেছনে লেগে থেকে ও বুদ্ধিমানেরই কাজ করেছে?'

'না, ঠিক ও ভাবে নয়···কিস্তি। আজ তোমার কি হয়েছে বলো তো? একটুও খেলায় মন নেই। তোমারও কি মেয়েমানুষ চাই?'

'না।'

'তাহলে?'

'বিপদ কেটে যাবার পরেও বিপদের আতঙ্কটাকে ঠিক এখনও কাটিয়ে

উঠতে পারছি না। আশা করি তুমি তোমার অতীত দিনগুলোর কথা নিশ্চয়ই স্মরণ করতে পারবে।'

'আমরা সাধারণত এক সঙ্গেই গাদাগাদি করে বাস করতাম। কিন্তু তুমিই দেখছি অন্য উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে খুব একটা আগ্রহী নও।'

'যেহেতু আমি অতীতকে স্মরণ করতে চাই না।'

'তাই কি?'

'নিশ্চয়ই। প্রতিটা উদ্বাস্তুই তাদের নিজেদের চারপাশে অদৃশ্য একটা বন্দী-দেওয়াল গড়ে তোলে। আমাকেও সে সম্পর্কে যথেষ্ট সতর্ক থাকতে হয়েছে।'

'তার মানে তুমি কি আমেরিকান নাগরিক হতে চাও?'

'নাগরিকত্বের প্রশ্ন এটা নয়, ভ্লাদিমির। যুদ্ধের এই বছরগুলো শেষ হবার পর আমি সাধারণ একজন মানুষের মতোই বাঁচতে চাই।'

'ব্যাপারটা কিন্তু খুবই কঠিন।'

'তবু মানুষ কেবল নিজেই নিজেকে উৎসাহিত করতে পারে, তা ছাড়া আর কেউ নয়।'

দ্বিতীয় খেলাটাতেও আমি হারলাম। তারপর থেকে একের পর এক অতিথিরা আসতে থাকায় তাদের চাবি দেওয়া, সিগারেট আনা, মদ পৌঁছনোর কাজে মিলিকভকে ব্যস্ত থাকতে হলো। আমি একাই চুপ-চাপ বসে রইলাম, মনে মনে ভাবলাম মেলিকভকে বলবো আমার একটা আলাদা ঘর চাই। আমরা দুজনে যে কেউ কারো কাজে বাধা দিই, তা কিন্তু নয়; কিংবা আমি তার ঘর অধিকার করে আছি কি নেই, সে নিয়েও সে আদৌ মাথা ঘামায় না। তবু আমার হঠাৎই মনে হলো নিজের আলাদা ঘর থাকাটা বিশেষ প্রয়োজন। এলিস দ্বীপে অন্যদের সঙ্গে বড় একটা ঘরে আমাকে গাদাগাদি করে ঘুমতে হতো, ফ্রান্সের অন্তরণশিবিরেও ঠিক তাই। আমি জানি যদি আলাদা কোনো ঘর পাই, তাহলে সেইসব দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যাবে, যাকে আমি সযত্নে এড়াতে চাই। অথচ একটা ঘরও আবার না হলে নয়, কেননা চিরকালের জন্যে অতীতকে আমি কোনোদিনই এড়াতে পারবো না।

## তিন

লাখ্‌মানই আমাকে হ্যারি কানের ঠিকানা দিয়েছিলো। কানের রোমাঞ্চকর অভিযান-কাহিনী আমাদের কারুরই অজানা নয়। অনধিকৃত অঞ্চলে জার্মানরা প্রবেশ করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে দক্ষিণ ফ্রান্সে ফিরে এসেছিলো। তখন তার নাম ছিলো জোসে তেগনার। সঙ্গে রয়েছে স্পেনের কূটনৈতিক দফতরের ছাড়পত্র। তাদেরই গাড়িতে চড়ে ঘুরে বেড়ায়। পোশাক-আশাকে সে একেবারে ফুলবাবু। নিজের সম্পর্কে এমন আত্মসচেতন আর বেপরোয়া যে যখন তখন উদ্বাস্তুদের নিজের গাড়িতে তুলে নিতেও সে দ্বিধা করতো না।

অনধিকার ক্ষমতার বলে সহ-উদ্বাস্তুদের সাহায্য করার জন্যেই সে শহর থেকে শহরতলী পর্যন্ত প্রায় সারাক্ষণই ঘুরে বেড়াতো। তাকে দেখতে ইহুদিদেরই মতো, অথচ অত্যন্ত সাবলীল ভঙ্গিতে সে ব্যাখ্যা করে বোঝাতো, অভিজাত স্প্যানিয়ার্ডদের দেখতে ওই রকমই। রাস্তার মাঝ-মধ্যিখানে গাড়ি থামিয়ে প্রচণ্ড ক্রোধে সে এমন উদ্ধত ভঙ্গিতে হম্বিতম্বি করতো যে জার্মান প্রহরীরাও তার ধারে কাছে ঘেঁষতো না, ভাবতো সে বোধ হয় সত্যিকারের স্পেনের সহকারী রাষ্ট্রদূত। জেনারেল ফ্রাঙ্কো যে হিটলারের দোস্ত একথা সবারই জানা আর সেনর তেগনার হিটলারের সেই দোস্তেরই প্রতিনিধি। সুতরাং তাকে ঘাঁটালে ভবিষ্যতে তাদের কপালে কি শাস্তি জুটবে ওরা নিজেরাই জানে না।

এ হেন হ্যারি কানের সঙ্গে গোপন প্রতিরোধ-বিপ্লবীদের ছিলো ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। তারাই তাকে অর্থ, গাড়ি আর তেল জোগাবার ব্যবস্থা করে দিতো। তাদের গোপনে ছাপা সংবাদপত্র আর দু পৃষ্ঠার প্রচার-পুস্তিকা সে গাড়িতে করে নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে দিতো। একবার কানের গাড়ি যখন নিষিদ্ধ পত্র-পত্রিকায় প্রায় ঠাসা, হঠাৎ ভ্রাম্যমান একদল জার্মান রক্ষী তার গাড়ি অনুসন্ধান করতে চাইলো। কান চেঁচিয়ে এমন ভয়ঙ্কর ভাবে ওদের শাসালো যে ওরা পালাবার পথ পেলো

না। কান তাতেও স্বস্তি পেলো না, অভিযুক্ত মালপত্র যথাস্থানে পৌঁছে দিয়ে সে সোজা গিয়ে হাজির হলো জার্মানদের স্থানীয় সদর দফতরে এবং এমন প্রচণ্ড তর্জন গর্জন শুরু করলো যে রক্ষীদের নির্বুদ্ধিতার জন্যে কম্যাণ্ডিং অফিসারকেই ক্ষমা চাইতে হলো। স্পেনীয় ফ্যাসিস্ট কায়দায় অভিবাদন জানিয়ে বেরিয়ে আসার সময় কান তৎপর অফিসারটিকে বলতে শুনলো, 'হেইল হিটলার!' পরের দিন সে আবিষ্কার করলো যে গাড়ির একটা খাঁজে তখনও দুটো প্রচারপত্র আটকে রয়েছে।

কি ভাবে যেন কান কয়েকটা স্প্যানিশ ছাড়পত্র জোগাড় করেছিলো, যা দিয়ে সে কয়েকজন উদ্বাস্তুর জীবন রক্ষা করতে পেরেছিলো, বিশেষ করে যাদেরকে গেস্টাপো হন্যে হয়ে খুঁজছিলো। প্রথমে সে ওদের ফ্রান্সের বিভিন্ন মঠে লুকিয়ে রেখেছিলো, পরে পিরেনিজ পেরিয়ে ওদের নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে দিয়েছিলো। এমন কি জার্মানীতে ফেরত পাঠাবার আগে দুজন বন্দী উদ্বাস্তুর জীবনও সে রক্ষা করতে পেরেছিলো। প্রথমবার বন্দীশিবিরের সার্জেন্টকে সে বোঝাতে পেরেছিলো যে ইংল্যাণ্ডে গোয়েন্দাদের ওপর গোয়েন্দাগিরির জন্যে ভাষাজ্ঞান উপযুক্ত হওয়ায় ওই নির্দিষ্ট বন্দীটির প্রতি স্পেন বিশেষ ভাবে আগ্রহী, আর দ্বিতীয় বারে শিবিরের রক্ষীকে রাম এবং কনিয়াকের নেশায় একেবারে চুর করে দিয়ে তাকে শাসিয়ে ছিলো যে সে যদি নির্দিষ্ট একটা বন্দীকে ছেড়ে না দেয় তাহলে ওপর-মহলে অভিযোগ করবে যে পাহারা দেবার সময় সে মাতাল অবস্থায় ছিলো।

তারপর একদিন দৃশ্যপট থেকে হ্যারি কান হঠাৎ উধাও হয়ে গেলো, ছড়িয়ে পড়লো নানান ধরনের গুজব। আমরা জানতাম তার মতো একক কোনো মানুষের সাংগঠনিক তৎপরতা নিঃশেষ হতে পারে কেবল তার মৃত্যুতেই। তাছাড়া গোঁয়াড়ের মতো কান দিনের পর দিন নিজেকে যে ভাবে জাহির করছিলো, আমি তো ভেবেছিলাম সে নিশ্চয়ই এস. এস.-দের হাতে ধরা পড়েছে। কিন্তু এখানে এসে লাখ্‌মানের কাছে শুনলাম সে

এখন নিউ ইয়র্কে বাস করছে।

তার দোকানেই কানকে খুঁজে পেলাম। দেখলাম দোকানের ভেতরে এক সঙ্গে ছটা রেডিও চলছে, প্রেসিডেন্ট রুসভেল্টের একটা বক্তৃতা প্রচার করা হচ্ছে। অবিশ্বাস্য গমগমে আওয়াজে কান পাতা দায়। দোকানের দরজাটা খোলা আর তার সামনে, পাশ-পথের ওপরেই রীতিমতো একটা ভিড় জমে উঠেছে।

না চেঁচিয়ে পরস্পরে কুশল বিনিময় করাটা ছিলো প্রায় অসম্ভব, তাই সাঙ্কেতিক ভাষার সাহায্যেই প্রাথমিক পর্বটা কোনো রকমে সেরে নিলাম। কান অসহায়ের মতো কাঁধ ঝাঁকিয়ে প্রথমে রেডিও, পরে বাইরে জনতার দিকে নির্দেশ করলো। ইঙ্গিতটা বুঝতে আমাদের অসুবিধে হলো না। তার ধারণা জনতাকে প্রেসিডেন্ট রুসভেল্টের বক্তৃতা শোনানোটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ। আমি জানলার ধারে বসে সিগারেট ধরিয়ে চুপচাপ শুনতে লাগলাম সেই মানুষটার কণ্ঠস্বর, যিনি আমাদের আমেরিকায় আসাকে সম্ভবপর করে তুলে-ছিলেন।

হ্যারি কান ছোটখাটো শীর্ণ চেহারার মানুষ, কালো চুল, দীপ্তি-বিচ্ছুরিত বড় বড় দুটো চোখ। বয়েস ত্রিশের নিচেই। তার সংবেদন-শীল, মগ্ন মুখখানা বেপরোয়া জঙ্গী মানুষের চাইতে কোনো কবির কথাই বেশি করে স্মরণ করিয়ে দেয়। অবশ্য র‍্যাঁবো এবং ভিলন কবি হয়েও ওঁরা কানের চেয়ে কোনো অংশে কম বিপ্লবী ছিলেন না।

হঠাৎই এক সময়ে সবকটা লাউড-স্পীকার এক সঙ্গে নিশ্চুপ হয়ে গেলো। কান বললো, 'সত্যিই আমি দুঃখিত, রবার্ট। বাইরে যারা বক্তৃতাটা শুনছিলো আমি তাদের হতাশ করতে চাইনি। তুমি হয়তো জানো না—ওদের মধ্যে এমন বহু লোক রয়েছে যারা নির্দ্বিধায় প্রেসিডেন্টকে খুন করতে পারে। ওঁনার শত্রু সংখ্যা খুব একটা কম নয়। অনেকে বলে উনিই নাকি আমেরিকাকে যুদ্ধে জড়িয়েছেন এবং আমেরিকার এই বিপুল পরিমাণ ক্ষয়-ক্ষতির জন্যে উনিই দায়ী। সে যাই

হোক···তারপর, তোমার খবর কি বলো ?'

ফ্রান্স থেকে এখানে এসে পৌঁছনো এবং আমার মূল সমস্যার কথা সংক্ষেপে তাকে বললাম।

'কবে তোমাকে যেতে হবে ?' কান জানতে চাইলো।

'দু সপ্তার মধ্যে।'

'কোথায় যাবে কিছু ঠিক করেছো ?'

'এখনও ভেবে উঠতে পারিনি।'

'মেক্সিকো কিংবা কানাডায় যেতে পারো। এদিক থেকে মেক্সিকোর সরকার অনেক বেশি আন্তরিক। বহু স্প্যানিশ উদ্বাস্তুকে ওরা সে দেশে স্থান দিয়েছে। এ সম্পর্কে আমরা মেক্সিকান দূতাবাসে খোঁজ-খবর নিতে পারি। তোমার কাছে কাগজপত্র কি আছে ?

আমি তাকে ছাড়পত্রটা দিলাম। উলটে-পালটে দেখে সে মুচকি-মুচকি হাসলো। 'তুমি এখনও কি ছাড়পত্রের এই নামটাই রাখতে চাও ?'

'তা ছাড়া আর উপায় কি বলো ? আমার কাছে তো অন্য কাগজ-পত্র কিছু নেই। এখন যদি বলি এটা আমার নয়, ওরা আমাকে বন্দী করে রাখবে।'

'না, তার কোনো মানে নেই। যাই হোক, আজ রাত্তিরে কি তোমার বিশেষ কোনো কাজ আছে ?'

'না।'

'তাহলে নটার সময় আমাকে এখান থেকে তুলে নিও। দেখি, তোমার ব্যাপারে কতটা সাহায্য করতে পারি।

'বেটি তুমি!' বিস্ময়ে আমি প্রায় চেঁচিয়েই উঠলাম।

এলোমেলো চুলে ঘেরা বেটি স্টেইনের লালচে চিবুকছুটো পূর্ণিমার চাঁদের মতো দীপ্ত হয়ে উঠলো। 'আরে, রবার্ট! হা ভগবান, এতদিন কোথায় ছিলে ? এখনই বা আসছো কোথা থেকে ? এতদিন আমার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ রাখোনি কেন ? তোমার অবশ্য অনেক দরকারী

কাজ ছিলো...'

বার্লিনে প্রতিটা অখ্যাত লেখক, শিল্পী, অভিনেতাদের কাছে বেটি স্টেইন যেমন ছিলো, এখানেও তেমনি প্রতিটা উদ্বাস্তুর কাছে ও ঠিক মায়ের মতো। অসহায় সন্তানদের প্রতি ওর মনোভাব নিঃসন্দেহে স্নেহপ্রবণ, আন্তরিক, কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছুটা বা শাসনমূলক।

'বাঃ, চমৎকার! দরজা থেকেই যখন বকাঝকা শুরু করে দিয়েছো, তখন নিশ্চয়ই তোমাদের অনেক দিনের পুরনো বন্ধুত্ব।' বেটির দিকে ফিরে কান হাসতে হাসতে বললো। অথচ আমি রসকে ধরে নিয়ে এলাম তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো বলে।'

'রস?'

'হ্যাঁ, বেটি; রস।'

'কেন, রস কি মারা গেছে?'

'হ্যাঁ। আজ আমি রসেরই উত্তরাধিকারী।'

'এবার বুঝতে পেরেছি।'

আমার বর্তমান পরিস্থিতির কথা ওকে বুঝিয়ে বললাম। এতটুকু দ্বিধা না করে ও তখনই কানের সঙ্গে আলোচনা শুরু করে দিলো কি ভাবে কতটুকু সাহায্য করা সম্ভব। ওদের কথাবার্তা শুনে এটুকু বুঝতে অসুবিধে হলো না যে হ্যারি কান এখনও নায়কের উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত। চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম—বেটির ঘরখানা বড় না হলেও, ওর চরিত্র অনুযায়ী নির্দিষ্ট একটা রূপ নিয়েছে। ভালোবাসার নিদর্শন স্বরূপ পাওয়া অজস্র মানুষের ছবি দেওয়ালে আঁটা রয়েছে। আমি একে একে নামগুলো পড়ে চললাম। সাতটা ছবির চারপাশে ক্রেপ কাপড়ের সরু পাড় বসানো—যাদের মধ্যে ছজন জার্মানী থেকে পালিয়ে আসতে পারেনি আর একজন আবার জার্মানীতেই ফিরে গেছে।

ফর্স্টারের ছবির চারপাশে অমন পাড় বসিয়েছো কেন, বেটি? ও তো এখনও মারা যায়নি?' আমি জিগেস করলাম।

'না, যেহেতু ও ফিরে গেছে।' বেটি বললো।

'কিন্তু ও কেন ফিরে গেছে তুমি জানো?'

'যেহেতু ও ইহুদি নয়, যেহেতু দেশের জন্যে মন কেমন করছিলো,' কান বললো। 'কিংবা ইংরেজিটা হয়তো ভালো শিখতে পারেনি বলে।'

'না, ওর সব চাইতে যা প্রিয় সেই স্যালাড চাষ আমেরিকায় করতে পারেনি বলে ভীষণ বিষণ্ণ হয়ে পড়েছিলো।'

কয়েকদিন পরে আমি আবার কানের দোকানে গেলাম, দেখলাম সে বেশ খোশ মেজাজেই রয়েছে এবং সেই প্রথম সে আমাকে নিজের জীবনের কিছু কিছু অভিজ্ঞতার কথা বললো। একবার সে অন্তরণশিবিরের নিয়ন্ত্রককে অনুরোধ করেছিলো পাঁচজন উদ্বাস্তুকে ছেড়ে দেবার জন্যে। সেই শিবিরে কয়েকজন নাৎসিও বন্দী ছিলো। প্রথমে কান জেদ ধরলো নাৎসিদের ছেড়ে দেবার জন্যে, নিয়ন্ত্রককে বোঝালো আর কয়েকদিনের মধ্যেই জার্মানরা ফ্রান্সে পৌঁছবে,তখন যদি ওরা দেখে যে শিবিরে কয়েক-জন নাৎসিও রয়েছে,গেস্টাপো ওকে নিশ্চয়ই গ্রেফতার করবে। নিয়ন্ত্রকও ব্যাপারটা যুক্তিগ্রাহ্য ভেবে নাৎসিদের ছেড়ে দিলো আর কান তারপরেই নিয়ন্ত্রককে ব্লাকমেল করতে শুরু করলো, ওকে ভয় দেখালো নির্দিষ্ট উদ্বাস্তুদের ছেড়ে না দিলে সে ওপর-মহলে সব ফাঁস করে দেবে।

'ফ্রান্স থেকে তুমি কেমন করে বেরিয়ে এলে, কান?' আমি জানতে চাইলাম।

'গেস্টাপো শেষ পর্যন্ত সন্দেহ করতে শুরু করেছিলো। একবার গ্রেফতারও করলো। আমি যথারীতি তর্জন-গর্জন করলাম, কিন্তু তাতে কোনো ফল হলো না। সুন্নৎ করা হয়েছে কিনা দেখার জন্যে ওরা আমাকে প্যান্ট খুলতে বললো। আমি ওদের বললাম অমন হাজার হাজার অ-ইহুদি আছে যাদের সুন্নৎ করা হয়েছে। ব্যাপারটাকে যত ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করছি, ওরা ততই হাসাহাসি করছে। ওদের কাছে নিজের প্রাণের জন্যে কাউকে সংগ্রাম করতে দেখার চাইতে মজার জিনিস আর কিছু নেই। ওরা ছাড়বে না, আমিও কিছুতেই প্যান্ট খুলবো না···এমন

সময় ওদের দলের যে নেতা, চোখে চশমা, দেখতে স্কুলের হেডমাস্টারের মতো, খেঁকিয়ে উঠে আমাকে বললো: 'এই মুহূর্তে না দেখালে ওটা কেটে তোমাকেই খাওয়াবো।' চারদিকে আবার হাসির ধুম পড়ে গেলো, কেননা ওর অধঃস্তন কর্মচারীরা সবাই অল্পবয়সী আর বেশ সুন্দর দেখতে। আমি প্যান্ট খুলতেই ওদের প্রায় মূর্ছা যাবার যোগাড়, কেননা আমার সুন্নৎ করা নেই। ইহুদি হিসেবে আমার বাবা ছিলেন উদার-পন্থী, উনি বিশ্বাস করতেন নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ায় সুন্নৎ-এর কোনো প্রয়োজনই হয় না।'

একটু থেমে কান হাসলো। 'তুমি আমার চালাকিটা ধরতে পেরেছো? ধরার সঙ্গে সঙ্গে আমি যদি ওদের বলতাম যে আমি ইহুদি নই বা আমার সুন্নৎ করা নেই, তাহলে ওদের মনে কোনো ছাপ ফেলতে পারতাম না। পরে যখন শাসালাম যে ব্যাপারটা আমি সদর দফতরে জানাবো, ওরা তখন আমার কাছে ক্ষমা চাইলো এবং প্রতিশ্রুতি দিলো যে আমার কোনো কাজে আর বাধা দেবে না। লিসবনে না পৌঁছনো পর্যন্ত আমি অবশ্য আমার কাজ চালিয়ে গিয়েছিলাম।'

দোকানের অন্ধকার যে জায়গাটায় আমরা বসে রয়েছি সেখান থেকে বাইরের রাস্তাটা স্পষ্ট দেখা যায়। পাশ-পথ ধরে হেঁটে চলা ছায়ামূর্তি-গুলো মাঝে মাঝে গাড়ির তীব্র আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে। মনে হচ্ছে আমরা যেন একটা গুহার মধ্যে থেকে পৃথিবীটাকে দেখছি।

আমি সিগারেট ধরালাম।

'একটা জিনিস ভাবতে আমার সত্যিই খুব অবাক লাগে', শান্ত স্বরেই কান বললো। '১৯৩৩-এর আগে পর্যন্ত নিজেদেরকে ভাবতাম আমরা বোধহয় এ পৃথিবীর সব চাইতে সুসভ্য একটা জাত, কিন্তু আজ দেখছি অ্যাটিলা আর চেঙ্গিস খাঁকেও অতিক্রম করে গেছি।'

'সত্যিই, মাঝে মাঝে নিজেদেরকে জার্মান হিসেবে ভাবতেও লজ্জা করে। এখানে আসার পর তুমি কি আমেরিকান নাগরিক হতে চেয়েছিলে?'

'না, প্রথমে চেয়েছিলাম অস্ট্রিয়ান নাগরিক হতে, তারপর চেকোশ্লো-ভাকিয়ান। কিন্তু দুটোই জার্মানরা অধিকার করে বসলো। তখন আমি আবার ফ্রান্সে ফিরে যাবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু ফ্রান্সেরও ওই একই অবস্থা। এখন আমার ভয় হচ্ছে জার্মানরা আবার আমেরিকা না অধিকার করে বসে।

'আর আমার ভয় হচ্ছে, দিন দশেক পরে ওরা আমাকে আবার না নতুন কোনো সীমান্তে ঠেলে দেয়।'

কান মাথা নাড়লো। 'ও নিয়ে তোমাকে অত ভাবতে হবে না। বেটি ইতিমধ্যেই তোমার জন্যে সাক্ষ্য-প্রমাণ সব জোগাড় করতে শুরু করে দিয়েছে। এমন কি টমাস মান আর হেনরিস মানের সঙ্গেও যোগাযোগ করছে। অবশ্য সাক্ষীর জন্যে আমাদের কয়েকজন আমেরিকানকেও জোগাড় করতে হবে। এখন তোমার সব চাইতে যেটা প্রয়োজন—ঘুরে ঘুরে না বেড়িয়ে একটা কিছু কাজ জোগাড় করা। এখানেই একজন প্রকাশক আছেন, যিনি চেয়েছিলেন নিজের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আমি একটা বই লিখি। লেখা আমার কোনোদিনই হয়ে উঠবে না, তবু আমি এখনও তাঁকে না করিনি। ভদ্রলোক উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে অসম্ভব আগ্রহী। কালই আমি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি। তাছাড়া তোমার কাজের জন্যে আমি অন্য দু একটা জায়গার কথাও ভেবে রেখেছি। কিন্তু সবচেয়ে আগে যে কাজটা করা দরকার—বসবাসের অনুমতি-পত্রের মেয়াদটাকে আরও কয়েক মাসের জন্যে বাড়িয়ে নিতে হবে। তার জন্যে প্রয়োজন একজন ভালো উকিলের। তোমার কাছে টাকা-পয়সা কিছু আছে?

'যা আছে দিন দশেক চলে যাবে।'

'ও তো তোমার নিজেরই লাগবে। উকিলের টাকাটা অবশ্য চাঁদা হিসাবে তুলে নেওয়া যাবে। ঠিক আছে ও নিয়ে তুমি কিছু ভেবো না। এসো, বরং এখন কিছু পান করা যাক।'

পান করার ইচ্ছে আমার আদৌ ছিলো না, আবার প্রত্যাখ্যানও

করতে পারলাম না। কেননা এ সম্পর্কে আমার তিক্ত অভিজ্ঞতা খুব একটা কম নয়। সেবার পারিতে অসম্ভব ক্লান্তি সত্ত্বেও অনেক রাত পর্যন্ত জেগে জোসেফ বারের সঙ্গে পান করেছিলাম, অথচ পরের দিনই ভোরে হোটেলের কামরায় ভদ্রলোককে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে থাকা অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিলো। ছিন্নমূল উদ্বাস্তুরা অসম্ভব অনুভূতিপ্রবণ আর অস্থিরচিত্ত, ছোটখাটো অতি তুচ্ছ ব্যাপারেও নিজেদের মানসিক ভারসাম্যতা হারিয়ে ফেলেন। সেদিন রাত্তিরে ব্রাজিলে কেউ একজনও যদি স্তেফান জোয়াইগ আর তাঁর স্ত্রীকে এতটুকু সঙ্গ দিতেন কিংবা একটা টেলিফোনও করতেন, তাহলে ওরা হয়তো ওভাবে আত্মহত্যা করতেন না। তাছাড়া, ও রকম একটা অচেনা দেশে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ অবস্থায় বাস করার চাইতেও উনি মারাত্মক একটা ভুল করেছিলেন—স্মৃতিকথার ওপর ভিত্তি করে এমন একটা রচনা প্রকাশ করলেন, যেটা হয়ে উঠলো ওঁর কাল, যেটাকে ওঁর মড়কের মতোই এড়িয়ে যাওয়া উচিত ছিলো। একটা কথা আমি চিরকালই স্মরণ রেখেছিলাম—যা করতে হবে, যা আমি করতে চাই—যুদ্ধ শেষ হবার পর দেশে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত কোনোদিনই তা করা সম্ভব নয়।

শেষ পর্যন্ত যখন হোটেলে ফিরে এলাম, নিজেকে কেন জানি আরও বেশি বিষণ্ণ মনে হলো। মেলিকভের জন্যে অপেক্ষা করবো বলে পাশের ঝুল-বারান্দাটায় গিয়ে বসলাম। প্রথমে ভেবেছিলাম বারান্দায় আমি বুঝি একা, কিন্তু অস্পষ্ট একটা শব্দে দূরের দিকের এক কোণে বাহারী গাছের আড়ালে দেখলাম একটি নারীমূর্তি। আবছা আলোয় নাতাশাকে চিনতে আমার খুব একটা অসুবিধে হলো না।

পায়ে পায়ে আমি ওর দিকে এগিয়ে গেলাম।

'আপনি কি মেলিকভের জন্যে অপেক্ষা করছেন?'

'হ্যাঁ। কিন্তু ওকে তো এখানে দেখছি না। কোথায় গেছে বলতে পারেন?'

'আমিও ঠিক জানি না। এই সবে এলাম। আপনি কি কিছু পান করবেন?'

'মেলিকভ না থাকলে আপনি কোথায় পাবেন?'

'মনে হচ্ছে এখনও আমাদের ঘরে সামান্য কিছু ভদকা আছে। দাঁড়ান দেখছি।'

অর্ধেক খালি বোতলটা নিয়ে আমি ফিরে এলাম। এগিয়ে দেওয়া গেলাসটা হাত থেকে নিয়ে হাসতে হাসতে ও জিগেস করলো, 'আপনি কোথায় ভদকা খাওয়া শিখলেন? আপনাদের দেশে তো কেউ ভদকা খায় না?'

'না। জার্মনরা সাধারণত বীয়ার আর স্ন্যাপস্ই বেশি পছন্দ করে। কিন্তু দেশের কথা আমি অনেকদিন আগেই ভুলে গেছি, বীয়ার বা স্ন্যাপস্ আমি কোনোটাই খাই না। অবশ্য ভদকা যে খুব একটা পছন্দ করি তাও কিন্তু নয়।'

'সাধারণত আপনি কি বেশি পছন্দ করেন?'

'সত্যি বলতে কি, আমি কোনোটাই পছন্দ করি না। হাতের কাছে যা পাই তাই খাই। ফ্রান্সে সাধারণত ওয়াইনই বেশি পান করতাম।'

'ফ্রান্সে!' নাতাশা পেত্রভনা অবাক চোখে তাকাল আমার দিকে। তারপর যেন কিছুটা ভৎর্সনার ভঙ্গিতেই প্রশ্ন করলো, 'ফ্রান্সে আবার জার্মানদের কি কাজ থাকতে পারে?'

'জার্মানী থেকে আমি ফ্রান্সে পালিয়ে এসেছিলাম। কিছুদিনের জন্যে আমাকে ফরাসী অন্তরণশিবিরেও কাটাতে হয়েছে।'

'নিশ্চয়ই ওরা আপনাকে ভেবেছিলো দেশের শত্রু, তাই।'

'হ্যাঁ, জার্মানীতেও দেশের শত্রু হিসেবে ওরা আমাকে বন্দীশিবিরে আটকে রেখেছিলো।'

'কেন?'

'কেন আমি নিজেই জানি না।' আসলে এ সম্পর্কে আলোচনা করার কোনো ইচ্ছে আমার ছিলো না, তাই প্রসঙ্গ পালটাবার জন্যে

তাড়াতাড়ি জিগেস করলাম, 'আপনি কি আর একটু ভদকা নেবেন?'

'না, ধন্যবাদ।'

সেই মুহূর্তে পরস্পরে আর কি বলার থাকতে পারে আমি নিজেই বুঝতে পারলাম না, তাই চুপ করে রইলাম।

'আপনি কি এখানেই থাকেন?' নাতাশা প্রশ্ন করলো।

'হ্যাঁ, আপাতত অস্থায়ীভাবে এখানে রয়েছি।'

'সবাই অস্থায়ীভাবে এখানে থাকে। অবশ্য কেউ কেউ বরাবরের জন্যে থেকে যায়।'

'আপনিও কি এখানে থাকেন?'

'হ্যাঁ। প্রথমে যেমন নিউ ইয়র্কে আসার কোনো ইচ্ছে আমার ছিলো না, এখন আবার ফিরে যাবারও তেমন ইচ্ছে নেই।'

কেন, কি ভাবে ও নিউ ইয়র্কে এলো, কেনই বা দেশে ফিরে যেতে চায় না, এ সম্পর্কে কিছু জানার কোনো কৌতূহলই আমার ছিলো না, কেননা সুদূর ছায়ার রাজ্যে যারা বাসা করে তাদের জীবনের করুণ কাহিনী আমার অজানা নয়।

একটু নীরবতার পর নাতাশা উঠে দাঁড়ালো। 'এবার আমাকে যেতে হবে।'

'মেলিকভের জন্যে আর একটু অপেক্ষা করবেন না? বলা যায় না, ও হয়তো এখুনি এসে পড়তে পারে।'

'আমার কিন্তু তা মনে হচ্ছে না। কেননা ওর জায়গায় ফেলিক্সকে কাজ করতে দেখছি।'

নাতাশা ঠিকই বলেছে, ঘুরে তাকাতেই ডেস্কের সামনে ফেলিক্সের টাক মাথাটা দেখতে পেলাম। সিগারেটের ধোঁয়ায় ছোট ঘরখানা প্রায় ভরে গেছে।

টানা টানা, স্বচ্ছ চোখ মেলে নাতাশা তাকালো আমার দিকে।

'চলি। ভদকার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

ওর অপসৃয়মান দীর্ঘ, শীর্ণ চেহারাখানা দেখে মনে হচ্ছে কত না

ভঙ্গুর আর বেদনাবিধুর, অথচ কাঠের সিঁড়িতে জুতোর শব্দ শুনে মনে হলো গোড়ালি দিয়ে কি যেন একটাকে ও পিষে ফেলতে চাইছে।

ছিপি এঁটে বোতলটা নিয়ে আমি বারান্দা থেকে চলে এলাম।

'কি খবর ফেলিক্স, ভালো?'

'চলে যাচ্ছে।'

ওর সুস্থির ধরনের নিবিড় প্রশান্তিই আমাকে কেমন যেন একটা তিক্ত বিষণ্ণতায় ভরিয়ে তুললো। সেই মুহূর্তে ওর সিগারেটের গনগনে লাল আলোর বিন্দুটাকে মনে হলো এ পৃথিবীতে শান্তির প্রতীক।

'শুভরাত্রি, ফেলিক্স।'

'শুভরাত্রি, মিস্টার রস। আপনার কি সিগারেট কিংবা বীয়ার চাই?'

'না, ফেলিক্স। ধন্যবাদ।'

দরজা ঠেলে আমার অন্ধকার ঘরটায় ঢুকতেই সমস্ত অতীত একসঙ্গে ভিড় করে এসে দাঁড়ালো আমার সামনে, যেন এতক্ষণ ওরা আমারই জন্যে অপেক্ষা করছিলো। বিছানায় শুয়ে আমি আবছা ধূসর জানলাটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। যদিও জানি অর্থহীন, তবু প্রতিহিংসায় আমি তখন নীরবে আর্তনাদ করে উঠছিলাম। একের পর এক অজস্র মুখ ভিড় করে আসছিলো আমার স্মৃতিপটে, আমি কিন্তু কাউকেই স্পষ্ট করে চিনতে পারছিলাম না। ইচ্ছে করছিলো গলা টিপে কাউকে খুন করতে, কিন্তু কাকে সেটাই বুঝতে পারছিলাম না। হঠাৎই একসময়ে দেখলাম আমার হাতদুটো ভিজে গেছে, বুঝতে পারলাম এতক্ষণ আমি নিঃশব্দে কাঁদছিলাম।

## চার

ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করার পর আইনজীবী ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পেলাম। বেশ চওড়া কাঁধ, গোলগাল মুখ, সোনালী-পাড় চশমার ওপারে নিস্প্রভ একজোড়া চোখ। মুখোমুখি কুর্সিটায়

সময় দেখলাম বেটি স্টেইনের লেখা চিঠিটা উনি খুব মন দিয়ে পড়ছেন। তারপর মুখ তুলে যখন প্রশ্ন করলেন, আমি কল্পনাই করতে পারিনি অমন বিশাল চেহারার কোনো পুরুষের কণ্ঠস্বর এত কোমল হতে পারে।

'আপনি তো উদ্বাস্তু, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'আশা করি ইহুদি?'

'না।'

'কি বললেন! ইহুদি নন?'

'না।' কিছুটা অবাক হয়েই প্রশ্ন করলাম, 'কেন?'

'অ-ইহুদি জার্মানদের হয়ে আমি কোনো কাজ করি না।'

'কেন?'

'দেখুন, আমি আপনাকে কৈফিয়ৎ দিতে পারবো না। আপনি যে ইহুদি নন মিসেস স্টেইনের সেটা আমাকে জানানো উচিত ছিলো।'

মনে মনে চাপা একটা বিরক্তি নিয়েই প্রশ্ন করলাম, 'কিন্তু আপনিও তো ইহুদি নন?'

'না, আমি আমেরিকান। এবং একজন আমেরিকান হিসেবে নাৎসিদের সাহায্য করার কোনো ইচ্ছে আমার নেই।'

'আপনার কি ধারণা সব জার্মানরাই নাৎসি?'

'অন্তত সম্ভাব্য নাৎসি তো বটেই।'

ওঁর বলার ভঙ্গিতে আমি হেসে ফেললাম।

'আপনি কিন্তু একটা জিনিস ভুল করছেন—ইহুদিরা জার্মানি ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে যেহেতু ওদের জীবন বিপন্ন হয়ে উঠেছিলো, আর অ-ইহুদিরা জার্মানি ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে যেহেতু ওরা শাসনতন্ত্রকে ঘৃণা করে।'

'কিন্তু গুপ্তচর বৃত্তির জন্যেও তো ওরা দেশ ছেড়ে চলে আসতে পারে?'

'গুপ্তচর হলে ওরা আপনার কাছে সাহায্যের জন্যে আসতো না। ওদের খুব ভালো ছাড়পত্র আর প্রবাসাজ্ঞা দিয়েই পাঠানো হয়।'

ভদ্রলোক খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে কি যেন ভাবলেন। মিছি-মিছি আর তর্ক করে কোনো লাভ হবে না দেখে আমি উঠে পড়লাম।

'আপনার কাছে কি এক হাজার ডলার আছে?' ভদ্রলোক সরা-সরিই প্রশ্ন করলেন।

'না। এমন কি একশোও হবে না।'

আমি সবে যখন দরজার কাছাকাছি পৌঁছেছি, ভদ্রলোক হঠাৎ জিগেস করলেন, 'কিভাবে আপনি আমার টাকাটা শোধ দিতে পারবেন বলে মনে করেন?'

'বন্ধুরা আমাকে সাহায্য করবে। কিন্তু অত টাকা তোলার আগেই আমাকে হয়তো অন্য কোনো অন্তরণশিবিরের মোকাবিলা করতে হবে।'

'কেন, আপনি কি এর আগে কোনো অন্তরণশিবিরে ছিলেন?'

'হ্যাঁ। প্রথমে জার্মানিতে···ওখানকার নাম অবশ্য বন্দীশিবির··· তারপর ফ্রান্সে।'

আমি মনে মনে আশা করছিলাম এবার হয়তো উনি বলে বসবেন জার্মানীর বন্দীশিবিরে কেবল অপরাধীদেরই রাখা হয়। কিন্তু আমার ভাবনার স্রোত হঠাৎ ছিন্ন হয়ে গেলো বিচিত্র একটা ধাতব শব্দে: "কোঁকোর-কোঁ! কোঁকোর-কোঁ! কোঁকোর-কোঁ!" মনে পড়লো মোরগ-ডাকা এমন অদ্ভুত ঘড়ির শব্দ আমি শুনেছিলাম সুদূর কোনো অতীত শৈশবে।

'বাঃ, শব্দটা ভারি মিষ্টি তো!'

'এটা আমার স্ত্রীর উপহার!' কথাগুলো বলার ভঙ্গিতে সলজ্জ একটা ভাব প্রকাশ পেলেও, আমার মনে হলো অপ্রত্যাশিতভাবেই মোরগের ধাতব শব্দটাই যেন আমাদের দুজনকে অদৃশ্য একটা বন্ধনে বেঁধে দিয়েছে, কেননা পরক্ষণে প্রায় অন্তরঙ্গের মতোই ওঁকে বলতে শুনলাম, 'দেখি আপনার জন্যে কতটা কি করতে পারি। আপনি বরং কাল বাদে পরশু একবার খোঁজ নেবেন।'

'কিন্তু আপনার পারিশ্রমিকের টাকাটা?'

'আমি না হয় এ সম্পর্কে মিসেস স্টেইনের সঙ্গে আলোচনা করে নেবো।'

'তার চাইতে আপনি বরং আমাকেই বলুন।'

'পাঁচশো ডলার'। ইচ্ছে করলে টাকাটা আপনি কয়েকটা খেপেও দিতে পারেন।

'সত্যিই কি কিছু করতে পারবেন বলে আপনার মনে হয়।'

'নিশ্চয়ই। আর কিছু না হোক, প্রবাসাজ্ঞার মেয়াদ আর কয়েক মাস অবশ্যই বাড়িয়ে দিতে পারবো।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ।'

হোটেলে ফেরার ভয়ে উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে আমি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। গত রাত্রে বিশ্রী একটা দুঃস্বপ্ন দেখে আঁতকে উঠেছিলাম। আজে-বাজে স্বপ্ন দেখাটা আমার জীবনে নতুন নয়। কাল রাত্রে দেখলাম পুলিশ আমাকে তাড়া করছে আর আমি ছুটতে ছুটতে পথ হারিয়ে জার্মান সীমান্ত অতিক্রম করে ভেতরে ঢুকে পড়েছি। কয়েকজন এস. এস. আমাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তেই আমি চিৎকার করে উঠলাম, আর ঠিক তখনই ঘুমটা ভেঙে গেলো। জানলা দিয়ে আকাশের দিকে তাকাতেই বুঝতে পারলাম এটা নিউ ইয়র্ক। মনে মনে কিছুটা স্বস্তি পেলেও, তারপরে আর কিছুতেই ঘুমতে পারিনি।

নিউ ইয়র্কে সবচেয়ে বনেদী আর জমকালো গয়নার দোকানগুলো যে অঞ্চলে, আমি সেই পঞ্চম সরণীর সুসজ্জিত জানলার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছি, অথচ কিছুই দেখছি না। আমার ঠিক পাশে কখন দুজন তরুণী এসে দাঁড়িয়েছে আমি খেয়ালই করিনি, কালো মখমলের ওপর রাখা সম্রাজ্ঞী ইউজিনের টায়রাটা সম্পর্কে ওদেরকে আলোচনা করতে দেখতে আমি সরে এলাম। সিগারেট, জুতো, শৌখিন জিনিসপত্রের দোকান অতিক্রম করে আমি পার্কটার দিকে এগিয়ে চললাম। নিউ ইয়র্কে বিকেলের পড়ন্ত আলোয় জীবনের মুখর উতোরলের মধ্যে দিয়েই আমি

হেঁটে চলেছি, অথচ আমি তাদের কেউ না—আত্মগোপন করে থাকা আমি এক দীর্ঘ পলাতক।

সাধারণত দিনের বেলায় রাতের স্বপ্নের কোনো অস্তিত্বই থাকে না, কেবল কখনও কখনও থেকে যায় তাদের ছিন্নভিন্ন দেহাবশেষ, তাও এক সময়ে একটু একটু হয়ে আবার বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যায়। গত রাতের দুঃস্বপ্নটা বুকের মধ্যে এমন ভাবে গেঁথে রয়েছে যে আমি তাকে কিছুতেই মুছে ফেলতে পারছি না। ইউরোপে নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্যে এত ব্যস্ত থাকতে হয়েছে যে আমি স্বপ্ন দেখারও কোনো অবকাশ পাইনি। আমেরিকায় এসে পৌঁছনোর পর ভেবেছিলাম এবার বোধহয় মুক্তি পাবো, কিন্তু এখন দেখছি সমুদ্রের ওপার থেকেও দুঃস্বপ্নের ছায়াগুলো আমাকে নিঃশব্দে অনুসরণ করে চলেছে আর আমি যেন স্পষ্ট অনুভব করতে পারছি গ্যাসচেম্বারের ধোঁয়ার কটু গন্ধ।

চকিতে আমি চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম। না, কেউ আমাকে লক্ষ্য করছে না। এই দেশটাকে নিবিড় আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরার জন্যে তীব্র কামনা অনুভব করলাম, যে দেশটা তার মৃত মানুষের মুখগুলোকেও রাঙিয়ে রাখে, যৌবনকে শ্রদ্ধা জানায় আর তার সৈন্যদের মরতে পাঠায় সেইসব অজানা দেশে, যেখানে ওরা কিসের জন্যে মরতে যাচ্ছে নিজেরাই জানে না। কিন্তু আমিও তো ওদের কেউ একজন হতে পারি? আমিই বা কেন এই দেশটার কেউ একজন হতে পারবো না? কেন আমি গৃহহীন আত্মার সেনাবাহিনীর একজন সাধারণ সৈনিক হয়ে থাকবো, যে কেবল অগণন নক্ষত্রের সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠছে তো উঠছেই, একটু ভালোবাসার মোহে যে ঘুরে চলেছে এক কক্ষ থেকে আর এক কক্ষপথে।

ডানহিলের আলোকোজ্জ্বল কাঁচের জানলায় সাজানো সারি সারি গাঢ় বাদামী রঙের তামাকের নলগুলোর দিকে তাকাতেই আমার শান্তির দিনে মনোরম সেই সায়াহ্নের কথা মনে পড়ে গেলো, যখন আগুনের পাশটিতে বসে আমি ধূমপান করতাম। নিঃশব্দ একটা আর্তিতে গৃহহীন পলাতকের

বুকের ভেতরটা কেমন যেন গুমরে উঠলো। মনে মনে ভাবলাম, আমেরিকায় আসার পর থেকে আমি যেন দিন দিন আরও বেশি সংবেদনশীল হয়ে উঠছি।

বিয়াল্লিশতম সরণী থেকে আমি পশ্চিমে বাঁক নিলাম। বেলাশেষের রাঙা আলোয় দেখলাম পৃথিবীর সব দেশের রঙিন প্রজাপতিরই মতো ছোট ছোট বাচ্ছারা পাশপথগুলোতে খেলা করছে। কেন জানি হঠাৎই মনে হলো, ঠিক এই মুহূর্তে কোনো মহিলা পাশে থাকলে বেশ ভালো হতো, যে আমার আর আমার পকেটের অবস্থা সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন করবে না। আমরা তুজনে একসঙ্গে বেশ ক্যালিফোর্নিয়ান বারগাণ্ডি পান করতে পারতাম, হোটেলে না ফিরে রাতটা তুজনে অন্য কোথাও কাটিয়ে দিতাম। কিন্তু কোথায় সেই নারী, সেই মেয়ে, সেই দেহ-পসারিনী? এটা তো আর পারি নয়, আমি শুনেছি এসব ব্যাপারে নিউ ইয়র্কের পুলিশ অত্যন্ত কড়া। অবশ্য ফোনে ওদের ডাকা যায়, কিন্তু এই অচেনা শহরে ওদের ফোন নম্বরই বা এখন কোথায় পাবো?

'সুসন্ধ্যা, ফেলিক্স। মেলিকভ কোথায়?'

'আজ শনিবার, ওর ছুটি।'

তাই তো, আজ যে শনিবার আমি একদম ভুলেই গিয়েছিলাম। সামনের সুদীর্ঘ নিস্ফল রোববারটার জন্যে এখন থেকেই শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। তবু সান্ত্বনা এখনও কিছুটা ভদকা আছে, হয়তো খুঁজলে কয়েকটা ঘুমের বড়িও পাওয়া যাবে।

'কুমারী নাতাশাও মেলিকভের জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

'কই, কোথায়?'

বাইরের বারান্দায়।'

সেদিনের মতো একই জায়গায় আধো আলোছায়ায় নাতাশা বসে রয়েছে। আমাকে দেখে ও উঠে দাঁড়ালো। আজও আমি স্তব্ধ বিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম সত্যিই ও কত লম্বা!

'আপনি কি সোজা আলোকচিত্রীর ওখান থেকে আসছেন?' আমি জিগেস করলাম।

'হ্যাঁ। ভাবলাম একটু ভদকা খেয়ে যাবো, কিন্তু আজ যে ভ্লাদিমির ইভানভিচ এখানে থাকবে না আমার খেয়ালই ছিলো না।'

'আমার কাছে কিন্তু এখনও কিছুটা ভদকা আছে,' অগ্রাহের সঙ্গেই আমি বললাম। 'দাঁড়ান, নিয়ে আসছি।'

দৌড়ে সিঁড়ি ভেঙে আমি ওপরের তলায় গেলাম, ডাইনে বাঁয়ে কোনো দিকে না তাকিয়ে ভদকার বোতল আর দুটো খালি গেলাস নিয়ে আবার ফিরে এলাম। আজকে নাতাশাকে কেমন যেন অন্য রকম দেখাচ্ছে—ওকে যতটা না ফরাসী বা রুশ মনে হচ্ছে, তার চাইতে অনেক বেশি মনে হচ্ছে আমেরিকানদের মতো। অন্যদিনের আঁটসাঁট পোশাকের পরিবর্তে আজ ও পরেছে ঢিলে বহির্বাস, মাথায় আলতো করে জড়ানো রয়েছে ল্যাভেণ্ডার রেশমের পাগড়ি।

পাগড়িটার দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে আমাকে তাকাতে দেখে নাতাশা হাসতে হাসতে বললো, 'সান্ধ্য পোশাকের জন্যে মডেলিং-এর কাজ করতে করতেই এখানে চলে এসেছি। যাতে চুল নষ্ট না হয়ে যায় তার জন্যে

'এখানে কি বিশেষ কোনো প্রয়োজনে এসেছেন?'

'না, তেমন কিছু নয়। রাস্তার ওপর অন্ধকার এই ঝুল-বারান্দাটা আমার খুব ভালো লাগে। লোকজন সবাই যাচ্ছে আসছে, কখনও বা পরিচিত কারুর সঙ্গে দেখাও হয়ে যাচ্ছে। এখানে নিজেকে আমার অনেক কম একঘেয়ে মনে হয়। তাছাড়া, ভ্লাদিমির ইভানভিচকে আমার ভালো লাগে!

গেলাসটা নামিয়ে রেখে নাতাশা উঠে দাঁড়ালো। 'এবার আমাকে যেতে হবে।' মুহূর্তের জন্যে ও ইতস্তত করলো। 'আপনিও বরং চলুন না আমার সঙ্গে। এখন কি ব্যস্ত রয়েছে?'

'ব্যস্ত আদৌ না। কিন্তু আপনার আলোকচিত্রশিল্পী আবার আমাকে

ঢুকতে দেবে তো?'

'কে, নিকি? কি যে বলেন! গেলেই বুঝতে পারবেন অল্পবিস্তর ভিড় ওখানে সব সময় লেগেই থাকে।'

কেন ও আমাকে ওখানে নিয়ে যেতে চাইছে কিছু অনুমান না করতে পারলেও, আমার যাবার তেমন কোনো ইচ্ছে ছিলো না। ও রকম একটা জায়গায় গিয়ে আমি কি করবো? অন্যদিকে আবার, এ রকম একটা হোটেলে একা একা সারাটা সন্ধ্যে কাটানোও কষ্টকর। তাই জিগেস করলাম, 'আমরা কি একটা ট্যাক্সি নেবো?'

নাতাশা খিলখিলিয়ে হাসলো। 'রুবেন থেকে ওখানে যাবার জন্যে ট্যাক্সির দরকার হয় না। ওটা খুব কাছেই। তাছাড়া নিউ ইয়র্কের এমন চমৎকার সন্ধ্যেগুলো হাতছাড়া করতে আমি কিছুতেই রাজি নই। আপনারও কি তাই মনে হয় না যে নিউ ইয়র্কের এই রাস্তাগুলোর সত্যিই কোনো তুলনা হয় না?'

'আমি ঠিক জানি না।'

'কখনও ভেবে দ্যাখেননি?

'না।' মনে মনে ভাবলাম বিলাসিতা করার অবকাশ পেলাম কোথায় যে এ সম্পর্কে কিছু ভাববো।

নাতাশা হাসতে হাসতেই জবাব দিলো, 'তাহলে বলবো আপনি মনে মনে এখনও অন্য কিছু খুঁজছেন।'

বড় বড় পা ফেলে নাতাশা বেশ দ্রুতই হেঁটে চলেছে। হঠাৎ মনে হলো আমেরিকায় এই প্রথম আমি কোনো তরুণীর পাশাপাশি হেঁটে চলেছি।

দীর্ঘদিন হারিয়ে-যাওয়া কোনো শিশুর মতোই নাতাশাকে সবাই মিলে হৈ হৈ করে সম্বর্ধনা জানালো। প্রথমে আলোকচিত্রশিল্পী, পরে আরও দুজন নাতাশাকে জড়িয়ে ধরে চুমু দিলো। পাদ প্রদীপের আলোয় উজ্জ্বল বিশাল ঘরটাতে আরও জনাছয়েক লোক রয়েছে। সবার সঙ্গে আমার

পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো, হাতে হাতে ঘুরে চললো ভদকা, হুইস্কি আর সিগারেট। খানিকক্ষণ পরে যখন আবিষ্কার করলাম আমি বসে রয়েছি একপাশের নরম একটা আরাম কুর্সিতে, আমার কথা তখন আর কারুর মনে রইলো না।

অবশ্য এসব নিয়ে মাথা ঘামার কোনো অবকাশ ছিলো না, কেননা সমস্ত পরিবেশটাই তখন আমার কাছে কেমন যেন অবিশ্বাস্য আর নতুন মনে হচ্ছিলো। বাক্স থেকে কোট, টুপি, নানা ধরনের পোশাক বার করে পরদার ওপারে নিয়ে যাওয়া হলো। মডেলিংএর জন্যে নাতাশা পেত্রভনা ছাড়া আর দুটি মেয়ে রয়েছে—একজন স্বর্ণকেশরী, অন্যজনের চুল ঘন কালো। দ্বিতীয় মেয়েটির গায়ের রঙ চাপা হলেও আশ্চর্য রূপসী, পায়ে গোড়ালি-উঁচু রূপোলী জুতো।

কোন পোশাকের ছবি আগে নেওয়া হবে, তাই নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়ে গেলো। হোমরা চোমরা দেখতে এক মহিলা জানালেন, 'কোটের ছবি আগে নেওয়া হোক।'

'উঁহু, আগে সান্ধ্যপোশাকের ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতে হবে,' কব্জিতে সোনার শিকলি বাঁধা, ধূসর চুল, বেশ সুন্দর দেখতে আলোক-চিত্রশিল্পী প্রতিবাদ করলো, 'নইলে ওর ওপর কোট পরলে ভাঁজ পড়ে পোশাক নষ্ট হয়ে যাবে।'

'কোটের নিচে ওদের ওসব পরার কোনো দরকার নেই। তাছাড়া দোকান বন্ধ হয়ে যাবার আগেই কোটগুলো ফিরিয়ে দিতে হবে।'

'বেশ, তাহলে হাতাবিহীন ফার কোটগুলোর ছবিই আগে নেওয়া হোক।'

পোশাকের চাইতে আরও বেশি বিতর্কের সৃষ্টি হলো কোণ আর আলো সম্পর্কে। কিছু না বুঝেই আমি শুনে চলেছি। সবাই এমন আবেগদীপ্ত স্বরে কথা বলছে, মনে হচ্ছে যেন অভিনয় করছে। আমার কেনই যেন হঠাৎ 'মিডসামার নাইটস্ ড্রিম'-এর কথা মনে পড়ে গেলো। প্রতি মুহূর্তেই আশা করতে লাগলাম এই বুঝি তূর্যনিনাদে ওবেরনের

আগমন ঘোষণা করা হবে, নিদেন পক্ষে কাসানোভা কিংবা কাউন্ট সেন্ট-জারমেইনের।

হঠাৎ সমকেন্দ্রাভিমুখী সবকটা স্পটলাইটের আলো এসে পড়লো একটা সাদা পরদার ওপর। পরদাটার ঠিক পাশেই রয়েছে একগুচ্ছ কৃত্রিম ডেলফিনিয়াম দিয়ে সাজানো একটা ফুলদানী। হাতাবিহীন লোমের ধূসর কোট গায়ে রুপোলী জুতো পরা মেয়েটাকে ধীরে ধীরে পরদার দিকে এগিয়ে যেতে দেখলাম। তত্ত্বাবধায়ক দৌড়ে এসে কোটের দু একটা জায়গা হাত দিয়ে টেনেটুনে ঠিক করে দিলেন। অন্য দুটো স্পট লাইট আলোর বন্যা বইয়ে দিতেই মেয়েটি স্থবিরের মতো দাঁড়িয়ে পড়লো।

'বাঃ!' অস্ফুট উল্লাসে নিকি বলে উঠলো। 'আর এক বার, লক্ষ্মীটি!'

আমি সামনের দিকে আর একটু ঝুঁকে এলাম। এখানে এসে এখন বেশ ভালোই লাগছে। কেননা আমার জীবনে এর চাইতে ভালো কিছু ঘটা সম্ভব ছিলো না।

কে যেন চেঁচিয়ে উঠলো, 'এবার নাতাশা।'

পরক্ষণেই দেখলাম নাতাশার আশ্চর্য কোমল, দীর্ঘ তনুরেখা ঘিরে রয়েছে আঁটসাঁট উজ্জ্বল গরমের কোট, হাঁটু ছাপিয়েও নিচে নেমে এসেছে, তার সঙ্গে মানানসই কিনারবিহীন চ্যাপটা টুপি।

নিকি চেঁচিয়ে উঠলো, 'চমৎকার! ঠিক ওই ভাবে দাঁড়িয়ে থাকো।'

তত্ত্বাবধায়ক কি যেন একটা পালটাতে চাইলেন, নিকি তাঁকে প্রায় ধমকেই সরিয়ে দিলো। 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, ওসব পরে হবে। এই পোশাকের আমরা আরও কয়েকটা ছবি নেবো, তখন করবেন। আগে এই স্বাভাবিক ভঙ্গিতে আমাকে একটা ছবি তুলতে দিন।'

সত্যি, অন্যান্য মডেলদের মতো নাতাশাকে কিন্তু আদৌ স্থবির মনে হচ্ছে না, যেন দীপ্ত প্রাণের আবেগে ও ভেতর থেকে ফেটে পড়তে চাইছে। পাদপ্রদীপের আলোদুটো জ্বলে উঠতেই ওর দীর্ঘায়ত টানাটানা চোখ দুটো নীলাভ নক্ষত্রের মতো ঝিকমিক করে উঠলো

'অপূর্ব! এবার কোটটা খুলে ফেলার ভঙ্গিতে।'

কোটের বোতামগুলো খুলে নাতাশা প্রজাপতির ডানার মতো হাত-দুটো দুপাশে মেলে দিলো। আগের মতো পোশাকটাকে এখন আর আদৌ আঁটসাঁট মনে হচ্ছে না, পাশ থেকে ভেতরের ধূসর আর সাদায় ডোরা-কাট: রেশমী কাপড়টা চোখে পড়ছে।

'আর না, থাক···হ্যাঁ, ঠিক এই ভাবে!' ক্যামেরা থেকে চোখ না সরিয়েই নিকি বললো। 'হ্যাঁ, এবার ঠিক মথদের রাণীর মতো দেখাচ্ছে! একটুও নোড়ো না!'

'কি, এখানে কেমন লাগছে?' পাশ থেকে কে যেন জিগেস করলো। তাকিয়ে দেখলাম কোঁকড়ানো কালো চুল, আশ্চর্য উজ্জ্বল কালো চোখ একটি তরুণ। তার কথার জবাবে ছোট্ট করে শুধু জানালাম:

'দরুণ!'

'আসলে কি জানেন, যুদ্ধের জন্যে ভালো পোশাক-আশাক এখন আর পাওয়াই যায় না। নইলে ব্যালেনসিয়াগার পোশাক সংগ্রহ করাও আমাদের পক্ষে কঠিন ছিলো না। অবশ্য এ পোশাকগুলোও খুব একটা খারাপ নয়।'

'নিশ্চয়ই না।' প্রায়কিছু না বুঝেই আমি বোদ্ধার ভঙ্গিতে জবাব দিলাম।

'আশা করা যায় যুদ্ধ শিগগিরই শেষ হয়ে যাবে। তখন আমরা আরও ভালো মডেলিং-এর কাজ করতে পারবো।

কে যেন ডাকায় ছেলেটি উঠে গেলো। সান্ধ্য পোশাকে ছবি তোলার আগে নাতাশা আমার সঙ্গে দেখা করলো। 'কি, খুব একঘেয়ে লাগছে তো?'

'একটুও না। বরং নিজেকে সত্যিই খুব সুখী মনে হচ্ছে।' অত্যন্ত সাধারণ সাদা একটা সান্ধ্য পোশাকে নাতাশাকে আমার কেন জানি আরও বেশি আকর্ষনীয়া মনে হলো। 'জানো, তুমি যে টায়রাটা পরে রয়েছো, বিশ্বাস করো, আমি জোর করে বলতে পারি ওটাকে আমি

আজই সন্ধ্যেবেলায় 'ভ্যান ক্লিক্ অ্যাণ্ড অ্যারপেলস্'-এর শোকেসে দেখে ছিলাম।'

নাতাশা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলো। 'সত্যিই তোমার চোখের প্রশংসা করতে হয়।'

'ওটা কি সত্যিই সেই টায়রাটা?'

'হ্যাঁ। যে পত্রিকার হয়ে আমরা কাজ করছি, ওরাই এটা ধার করে এনেছে। নইলে কি তোমার ধারণা আমি কিনেছি?'

'বলা যায় না, হতেও তো পারে!' হাসতে হাসতেই আমি জবাব দিলাম।

ভেতর থেকে কে যেন নাতাশাকে ডাকলো।

'ছবি তোলার কাজ শেষ হলে আমরা সবাই এল মরক্কোতে যাবো। এটাই সাধারণ নিয়ম। তুমি কি আমাদের সঙ্গে যাবে?'

আমার জবাবের জন্যে অপেক্ষা না করেই ও চলে গেলো।

ওদের সঙ্গে আমার যাওয়ার কোনো প্রশ্নই উঠে না, কেননা আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়। খারাপ লাগলেও নাতাশাকে কথাটা জানাতে হবে। অবশ্য তাড়াহুড়োর কিছু নেই, ছবি তোলার কাজ মিটতে বেশ খানিকটা সময় লাগবে।

গাঢ় সবুজ রঙের লম্বা কোট পরা অবস্থায় ছবি নেওয়ার পর কালো চুল মেয়েটি যখন সবার সামনেই অনায়স ভঙ্গিতে কোটটা খুলে পাশের লোকটির দিকে ছুঁড়ে দিলো, দেখলাম ওর পরনে দু টুকরো অন্তর্বাস ছাড়া আর কোথাও কিছু নেই। মেয়েটির রূপে আমার চোখ প্রায় ধাঁধিয়ে যাবার জোগাড়, অথচ আমি ছাড়া আরও দুজন পুরুষ রয়েছে যাদের কোনো ভ্রূক্ষেপই নেই। মনে মনে ভাবলাম এদের কাজে হয়তো এসব নিত্যকার ব্যাপার। পোশাক পালটানোর ফাঁকে নাতাশাকেও খুব কাছ থেকে দেখার অবকাশ পেলাম—রীতিমতো লম্বা, ছিপছিপে নিটোল তনুরেখা, চাঁদের আলোয় মুক্তোর মতো মসৃণ ত্বক। ক্ষণিকের জন্যে হলেও, এতগুলি রূপসী মেয়ের উষ্ণ সান্নিধ্য আমাকে বিপুল আনন্দে

ভরিয়ে তুললো, এতদিন পর ভেতরের সুপ্ত কামনাটাকে আমি যেন স্পষ্ট অনুভব করতে পারলাম।

সব কিছু বাঁধাছাঁদা হয়ে যাবার পর আমি নাতাশাকে জানালাম যে ওদের সঙ্গে এল মরক্কোতে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

'কেন?' নাতাশা অবাক হয়েই প্রশ্ন করলো।

'আমার অত টাকা নেই।'

'আহা, কি বুদ্ধি তোমার।' ঢেউ খেলিয়ে হেসে উঠলো নাতাশা। 'আমাদের সবাইকেই আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। নইলে তোমার কি ধারণা, জেনে শুনে আমি সব টাকা তোমাকে খরচ করতে বলবো?'

আমাকে সঙ্গে নেওয়ার ব্যাপারে নাতাশার আন্তরিকার কোথাও কোনো অভাব না থাকলেও, মনে মনে কিছুটা সংকোচ বোধ না করে পারলাম না। কিন্তু সবাই মিলে আমাকে এমন ভাবে টানাটানি শুরু করলো যে আপত্তি জানাবার কোনো অবকাশই পেলাম না।

এল মরক্কোতে একজন ভিয়েনিস একের পর এক জার্মান গান গেয়ে চলেছে। ঘরটায় কয়েকজন উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারীও রয়েছে, অথচ কেউ কিছু মনে করছে না। আমি জানি জার্মানী হলে এটা কখনই সম্ভব হতো না। মনে মনে গুনে দেখলাম আমার পকেটে এখনও পঞ্চাশ ডলার রয়েছে এবং প্রস্তুত হয়ে রইলাম কেউ যদি চায় আমার ভবিষ্যতের যাকিছু সঞ্চয় নির্দ্বিধায় তার হাতে তুলে দিতে পারি। কিন্তু কেউ চাইলো না। এই যে স্বস্তি, দুর্ভাবনাবিহীন জীবন, অপরিচিত কয়েকটা মানুষের গাঢ় অন্তরঙ্গতা আর রূপসী নারীদের উষ্ণ সান্নিধ্য যে এখনও পাওয়া সম্ভব, কথাটা ভাবতেই আমার সারা শরীর কেমন যেন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো। স্যাম্পেনের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে মনে হলো মোমবাতির আলোয় ঝিকমিকিয়ে ওঠা ওই ধার করা টায়রাটারই মতো আমি যেন একটা রাতের জন্যে অন্য কারুর জীবন ধার করে নিয়েছি যা আমাকে আগামী কালই আবার ফিরিয়ে দিতে হবে।

## পাঁচ

অস্থায়ী একটা কাজের ব্যাপারে মেলিকভের নির্দেশ মতো আমি মিস্টার সিলভারসের সঙ্গে দেখা করলাম। তখন বিকেল সাড়ে পাঁচটা। ঠিকানা মিলিয়ে বাড়িটা খুঁজে পেতে কোনো অসুবিধে হলো না। বাড়িটা ওঁনার নিজের, অথচ দরজার গায়ে কোনো নাম নেই। প্রথমে ভেবেছিলাম ছবি কেনা বেচার নামকরা ব্যবসায়ী যখন, নিশ্চয়ই গোলগাল ভারিক্কি চেহারার কেউ হবেন, কিন্তু এখন দেখলাম রীতিমতো কেতাদুরস্ত পোশাক পরা, ছিপছিপে চেহারার এক ভদ্রলোক। বয়েসও তেমন কিছু বেশি নয়। দেখে মনে হলো বেশ নম্র, হয়তো বা কিছুটা ভীরু ধরনেরই। উনি নিজেই আমার জন্যে কফি ঢেলে দিলেন, সংক্ষেপে কয়েকটা প্রশ্ন করলেন, তারপর অন্য ঘর থেকে দুটো ছবি এনে ইজলে বসিয়ে দিলেন।

'এই দুটো ছবির মধ্যে কোনটে আপনার বেশি পছন্দ?'

আমি ডান দিকের ছবিটা নির্দেশ করলাম।

'কেন?'

'কারণ বলতে পারবো না। তবে ওইটেই আমার বেশি পছন্দ।'

'ছবিটা কার আঁকা বলতে পারেন?'

'দেগার। এটা অবশ্য যে কেউ দেখলেই বলে দিতে পারবে।'

'না, যে কেউ নয়,' কষ্ট করে ফুটিয়ে তোলা অদ্ভুত চাপা ঠোঁট সিলভারস হাসলেন। 'অন্তত আমার খদ্দেরদের অনেকেই পারবে না।'

'তাহলে তাঁরা কেনেন কেন?

'যেহেতু অভিজাত শ্রেণীর মানুষরা চান তাঁদের বসার ঘরে দেগার কোনো ছবি থাকুক, তাই।'

সিলভারস আবার নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। ছবির ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে এতদিন মনে মনে যে ধারণা গড়ে তুলেছিলাম—ভ্যানগগের মতো শিল্পীকেও যখন না খেতে পেয়ে মরতে হয়, তখন তাঁর

ছবির ব্যবসায়ীরা একের পর এক তুর্গ কিনে চলে, এই ধারণাটা সিলভার সের সঙ্গে ঠিক যেন খাপ খায় না, অন্তত ওঁর সঙ্গে আমার কয়েক মুহূর্তের আলাপে তাই-ই মনে হলো।

জল-রঙের তুটো ছবি নিয়ে সিলভারস ফিরে এলেন।

'এই ছবিতুটো কি আপনি চিনতে পারেন ?'

'তুটো ছবিই সেজাঁর আঁকা।'

সিলভারস স্পষ্টতই অবাক হলেন। 'তুটোর মধ্যে কোনটে ভালো বলতে পারেন ?'

'সেজাঁর সব জল-রঙের ছবিই ভালো। তবে আমার ধারণা বাঁ হাতের ছবিটা সম্ভবত বেশি দামী।'

'কেন ? ছবিটা বড় বলে ?'

'না, ছবিটা তাঁর শেষের দিকের আঁকা বলে। তাঁর জীবনের যে সময় থেকে কিউবিস্ট প্রভাব পড়তে শুরু করেছিলো, এটা প্রায় সেই সময়েরই আঁকা। মঁং সাঁ-ভিক্তোর প্রদেশের এটা সুন্দর একটা প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী। এরকম একটা ছবি ব্রুসেলস্ মিউজিয়ামেও আছে।'

সিলভারসের মুখের চেহারাটাই কেমন যেন বদলে গেলো। চকিতে উনি সতর্ক হয়ে উঠলেন। 'এর আগে কোথায় কাজ করেছেন ?'

'কোথাও কাজ করিনি।' শান্ত স্বরেই আমি জবাব দিলাম। কিছুদিন ব্রুসেলস মিউজিয়ামে ছিলাম।'

'কবে ?'

জার্মান অবরোধের সময়। ওখানে আমি লুকিয়ে ছিলাম। ছবি সম্পর্কে আমার সামান্য যতটুকু জ্ঞান আমি ওখান থেকেই শেখার সুযোগ পেয়েছিলাম

সিলভারস আবার তাঁর কুর্সিটায় গিয়ে বসলেন। 'আমাদের এই ব্যবসায় খুব বেশি একটা জানার প্রয়োজন হয় না।'

'কেন ?'

মুহূর্তের জন্যে সিলভারস ইতস্তত করলেন। 'আসলে কি জানেন,—

ছবি হলো মেয়েদের মতো। অনেক চোখের সামনে উন্মোচিত করা হলে ওদের আকর্ষণ করার জাদু এবং মূল্য দুটোই কমে যায়।'

'কিন্তু ছবি তো সবার দেখার জন্যেই ?'

'হতে পারে। তবে ছবি-বিক্রেতাদের কাছে নয়। যে ছবিকে যত কুমারী অবস্থায় রাখা যাবে, সংগ্রহকারীর কাছে তার দাম তত বেশি মনে হবে, যাতে তিনি অনুভব করতে পারেন—ছবিটাকে সংগ্রহ করে এই মাত্র তিনি বিরাট একটা কিছু আবিষ্কার করেছেন।'

এতক্ষণ ওঁর কথা আমি মন দিয়ে শুনছিলাম, উনি চুপ করতেই হালকা ছাই রঙের মখমলের পরদা দিয়ে ঘেরা সারা ঘর জুড়ে নেমে এলো এক-টুকরো নিতল নিস্তব্ধতা।

'এই ছবিটা আপনি চেনেন ?' এক সময়ে নীরবতা ভেঙে সিলভারই প্রথম প্রশ্ন করলেন।

'মানের আঁকা। তাঁর বিখ্যাত 'পপি' সিরিজের এটা অন্যতম।

'এই ছবিটা আপনার ভালো লাগে ?'

ছবিটা সত্যিই দুর্লভ। ফ্রান্সের যেমন উজ্জ্বল সূর্য, তেমনি সারাটা তল্লাট জুড়ে এর নিবিড় প্রশান্তি।'

সিলভারস চকিতে আমার মুখের দিকে তাকালেন। 'সকালের দিকে আমি সাধারণত ছবিগুলোর সামনে একা চুপচাপ বসে থাকি। ছবিগুলো কিন্তু একা নয়। যে কেউ ওদের সঙ্গে কথা কইতে পারে, কিংবা ওদের কথা শুনতে পারে।'

আমার কেনই যেন মনে হলো এসব আমাকে শোনানোর কোনো অর্থ হয় না, কেননা আমি এখানে এসেছি সাময়িক একটা কাজের জন্যে, জীবনে একটু স্বস্তি আর শান্তি ছাড়া অন্য কিছুই চাই না। তাছাড়া আমি ওঁর খদ্দের নই যে উনি আমাকে বোঝাবেন ছবির কোনো দেশ নেই, ওরা সব ভাষাতেই কথা বলতে পারে। তার চাইতে সকালগুলো ছবির পেছনে নষ্ট না করে, কোন্ ছবিটা কত বেশি দামে বিক্রি করা যায় উনি যদি তার হিসেব করতেন অনেক বেশি লাভ হতো।

'এখানে অবশ্য বেশি কিছু শেখার নেই। বিশ্বস্ততা এবং বিচক্ষণতাই সব চাইতে প্রয়োজনীয় জিনিস। আচ্ছা, আমি যদি আপনাকে দৈনিক আট ডলার হিসেবে দিই, আপনার কি মনে হবে ?'

'শেষের শব্দকটায় আমি যেন শান্তির স্বপ্ন থেকে জেগে উঠলাম। 'যদি কিছু মনে না করেন, তার আগে জানা দরকার ক ঘণ্টা করে আমায় কাজ করতে হবে, এবং সেটা সকালে না সন্ধ্যাবেলায় ?'

'সকাল এবং সন্ধ্যে দু বেলাতেই। তবে আমার ধারণা, এই দুটো সময়ের মাঝেও আপনি অন্য কাজ করার যথেষ্ট সময় পাবেন।'

'কিন্তু বারোর কমে আমার পক্ষে কাজ করা সত্যিই সম্ভব নয়। কেননা আমার বেশ কিছু দেনা আছে যা শোধ করতে হবে।'

'এরই মধ্যে এত দেনা করে বসে আছেন ?'

'এখানে বসবাসের সময়সীমা বাড়ানোর জন্যে যিনি আমার হয়ে কাজ করেছেন, সেই আইনজীবী ভদ্রলোককেই টাকাটা ফিরোত দিতে হবে।'

আমি জানি মেলিকফ সিলভারসকে সবই বলেছে, তবু উনি এমন একটা ভান করলেন যেন কথাটা এই প্রথম শুনছেন। ফলে সমস্ত ব্যাপার-টাই ওঁকে আবার নতুন করে বিবেচনা করতে হলো। আভাসে-ইঙ্গিতে উনি যেমন আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে আইনত আমি এখানে কোনো কাজ করতে পারি না এবং করলেও তার জন্যে কোনো কর দিতে হবে না, আমিও ঠিক তেমনি ভাবে ওঁকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে ছবি সম্পর্কে আমার জানাটা অন্য কারুর চাইতে খুব একটা অসম্পূর্ণ নয়, এবং জার্মান, ফরাসী, ইংরেজী—তিনটে ভাষাই এই ব্যবসার পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করবে। শেষ পর্যন্ত দশ ডলারেই রফা হলো। উনি কথা দিলেন আমার কাজ মনোমতো হলে ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই আরও কিছু বাড়িয়ে দেবেন। আমি জানি ওটা নিতান্তই কথার কথা, কিন্তু ওই দশ ডলারে রাজি না হওয়া ছাড়া আমার তখন আর অন্য কোনো উপায় ছিলো না।

সেদিন সন্ধ্যের পর কান আর আমি বেটি স্টেইনের সঙ্গে দেখা করতে

গেলাম। বার্লিনের মতো এই নিউ ইয়র্কেও ওর বাড়িটা প্রতি বৃহস্পতি-বার সবার জন্যে একেবারে অবারিত দ্বার। যদি সম্ভব হয় কেউ কখনও এক বোতল মদ, কয়েক প্যাকেট সিগারেট কিংবা পাউণ্ডখানেক ঝলসানো শূয়োরের মাংসও নিয়ে আসে। সারাক্ষণই পুরনো রেকর্ডে বেজে চলে ধ্রুপদী সংগীত। কখনও কোনো অখ্যাত লেখক তাঁর নিজের রচনা পাঠ করে শোনান, কিন্তু অধিকাংশ সময়েই সবাই গল্প-গুজব করে কাটিয়ে দেয়।

'বেটির উদ্দেশ্য মহৎ,' বাড়িতে ঢোকার মুখে কান আমাকে বললো, 'কিন্তু জায়গাটাকে আমার কেমন মড়া রাখা ঘরের মতো মনে হয়, মনে হয় ওখানকার সবাই যেন জীবিত-মৃত!'

বেটির পরণে হিটলারের সময়ের আগেকার ধাঁচের ল্যাভেণ্ডার সিল্কের পোশাক, এখনও ন্যাপথলিনের অস্পষ্ট গন্ধ জড়িয়ে রয়েছে, চলতে ফিরতে মৃদু খসখসানির শব্দ শোনা যায়। বরফের মতো ধবধবে সাদা চুল, আরক্ত চিবুক, দীপ্ত উদ্ভাসিত হয়ে ওঠা কুচকুচে কালো চোখে বেটি দুহাত বাড়িয়ে আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানালো। ছলনাবিহীন ওর নিবিড় আন্তরিকতায় অসহায়ের মতো হাসা বা নিঃশব্দে ওকে ভালোবাসা ছাড়া আর কারুরই কিছু করার থাকে না। ওর ভঙ্গিটা এমন যেন ১৯৩৩ সালের পর বলে কোনোদিনই কিছু ছিলো না—অন্তত অন্য আর যে কোনো দিনে থাকুক না কেন, বৃহস্পতিবারগুলোতে তো নয়ই। বৃহস্পতি-বারগুলোতে ও যেন ভিমার প্রজাতন্ত্রের সেই বার্লিনেই রয়েছে।

মৃতের ছবি দিয়ে সাজানো বড় ঘরখানায় অটো ভিলের নামে একজন তরুণ অভিনেতাকে ঘিরে অতিথিরা সবাই ভিড় জমিয়েছে।

ওকে দেখিয়ে বেটি গর্বের সঙ্গে বললো, 'এরই মধ্যে ও হলিউডের মন জয় করে ফেলেছে। সত্যি, আমার ভাবতেও ভালো লাগছে।'

'কিসের চরিত্রে ও অভিনয় করছে?' আমি জিগেস করলাম। 'ওথেলো, না ব্রাদার্স কারামাজভ?'

'আমি ঠিক জানি না, তবে বেশ বড় পার্ট।' কফির পেয়ালাগুলো

এগিয়ে দিতে দিতে বেটি বললো, 'সুযোগ পেলে ভবিষ্যতে ও একদিন ক্লার্ক গেবল কিংবা চার্লস লটনের চাইতেও বড় অভিনেতা হয়ে উঠবে।'

অটো ভিলেরের নাম আমি কখনও শুনিনি। অবশ্য তাতে কিছু এসে যায় না, কেননা গত কয়েক বছরে ইউরোপে কোনো নাটক বা সিনেমা দেখার ঠিক অবকাশ হয়ে ওঠেনি। আমি যেসব অভিনেতা-দের চিনি তাঁরা সবাই অবরোধের আগের সময়কার।

বেটির অনুপস্থিতিতে কান বললো, 'ভিলের আদৌ কোনো চরিত্র অভিনেতা নয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর একটা ছবিতে অসংখ্য নাৎসি এস. এস.-দের একজন হিসেবে ও অভিনয় করছে।'

'কিন্তু ও তো ইহুদি?'

তাতে কি হয়েছে? একজন এস. এস. সৈনিককে ইহুদিদের মতো দেখতে কিনা তা নিয়ে হলিউডের আদৌ কোনো মাথা ব্যথা নেই, বরং একজন এস. এস.কে ইহুদির মতো দেখতে হলে ওদের ধারণা ব্যাপারটা অনেক বেশি কাব্যিক হবে।'

এবার যিনি এসে পৌঁছলেন, ছোটখাটো দেখতে, মুখচোরা ধরনের মানুষ, সামান্য একটু লম্বা, কালো দাড়ি আছে। কান চাপা স্বরে বললো, 'উনি ডাক্তার গ্রাফেনহেইম।' নামটা অত্যন্ত পরিচিত। বার্লিনে উনি ছিলেন সেরা স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ, উন্নত ধরনের গর্ভনিরোধের জন্যে ওঁনার নাম দেশের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিলো।

ওঁকে সঙ্গে নিয়ে বেটি আমাদের দিকে এগিয়ে এলো।

'আপনি কি এখন নিউ ইয়র্কেই রয়েছেন?', কান জিগেস করলো।

'না, ফিলাডেলফিয়ায়।'

'ওখানে আপনার পসার কেমন?'

'পসারের কোনো সুযোগ নেই। এখনও আমার পরীক্ষাই দেওয়া হয়ে ওঠেনি। এই বুড়ো বয়েসে যদি আবার নতুন করে পরীক্ষা দিতে হয়, তার ওপর আবার ইংরিজিতে, তাহলে ব্যাপারটা আমার পক্ষে কি রকম মর্মান্তিক হয়ে দাঁড়াবে ভেবে দেখুন একবার।'

'কিন্তু আপনি তো একজন বিখ্যাত ব্যক্তি! ওরা নিশ্চয়ই আপনার নাম শুনেছে।'

ডাক্তার গ্রাফেনহেইম অসহায়ের মত কাঁধ ঝাঁকালেন। 'তার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। এখানকার ডাক্তারী সংস্থার ধারণা আমাদের মতো উদ্বাস্তুরাই নাকি ওদের পেশার ওপর অন্যায় ভাবে আঘাত হানছে। আমরা যাতে কোথাও কোনো রকম নাক গলাতে না পারি তার জন্যেই এই পরীক্ষার ব্যবস্থা। ষাট বছর বয়েসে বিদেশী একটা ভাষায় আবার নতুন করে পরীক্ষা দিতে বসাটা খুব একটা সহজ ব্যাপার নয়।' ডাক্তার গ্রাফেনহেইম ম্লান ঠোঁটে হাসলেন। 'ভাষাটা অবশ্যই আমার শেখা উচিত। কিন্তু মুশকিল কি হয়েছে জানেন, পরীক্ষায় বসার আগে কোনো হাসপাতালে আমাকে এক বছর ডাক্তারের সহকারী হিসেবে কাজ করতে হবে।'

'তোমার কি হয়েছে এদের বলো গ্রাফেনহেইম।' নীরবতার সুযোগ পেয়ে বেটি বললো।

'আমি এখানে নিজের অসুবিধের কথা বলতে আসিনি, বেটি।'

'তা হোক, তবু তুমি বলো। আর তুমি যদি না বলো, আমি নিজেই বলবো। অপদার্থ একজন উদ্বাস্তুই ওকে একেবারে সর্বস্বান্ত করে ছেড়ে দিয়েছে।'

'তাই নাকি!'

জানা গেলো ডাক্তার গ্রাফেনহেইম তাঁর ডাকটিকিটের দুর্মূল্য সংগ্রহটা এক বন্ধুকে দিয়েছিলেন, যিনি ডাক্তারের আগেই জার্মানী ছেড়ে চলে এসেছিলেন। তারপর ডাক্তার যখন নিউ ইয়র্কে এসে পৌঁছলেন, বন্ধু তখন আর তাঁকে চিনতেই পারলো না, স্পষ্টই জানিয়ে দিলেন যে ডাক্তার নাকি ওঁকে কোনোদিনই কিছু দেননি।

'রসিদ বা ওই জাতীয় লিখিত কিছু ছিলো না?' কান জিগেস করলো।

'না, আর সেটা সম্ভবও নয়। গেস্টাপো যদি আমার কাছে কোনো

রসিদ খুঁজে পেতো, মূল্যবান জিনিস বিদেশে পাচার করার অভিযোগে ওরা আমাকে নিশ্চয়ই বন্দী করে রাখতো।'

'আচ্ছা, ওই সংগ্রহটার এখন কত দাম হবে?' বেটি জানতে চাইলো।

'বলা মুশকিল,' গ্রাফেনহেইম বিব্রত বোধ করলেন। 'তবে খুব কম করেও ছ সাত হাজার ডলার।'

'ছ সাত হাজার ডলার!' বেটি অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলো। 'ভেবে ছাখো একবার, আর শয়তানটা...'

'একটা জিনিস কিন্তু তুমি ভুল করছো বেটি,' ডাক্তার ওকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন। 'নাৎসিদের হাতে গিয়ে পড়ার চাইতে এটা বরং অনেক ভালো হয়েছে।'

'আহা, কি কথা বলার ছিরি!' রাগে বেটি স্টেইনের গলার স্বর কেঁপে উঠলো। 'ইহুদি উদ্বাস্তুদের এটাই সবচেয়ে বড় ত্রুটি—সহ্য করবে, তবু কখনও অন্যায়ের প্রতিবাদ করবে না। এদিক থেকে নাৎসিদের সাহস অনেক বেশি। ওদের জীবনে এমন কোনো ঘটনা ঘটলে বেইমান লোকটার মাথার খুলি একেবারে গুঁড়িয়ে ছেড়ে দিতো।'

ওর বলার ভঙ্গিতে আমরা না হেসে পারলাম না। ধবধবে সাদা, শীর্ণ গলায় ওকে এখন মনে হচ্ছে গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের কোনো ক্রুদ্ধ মা-পাখির মতন।

'হেসো না!' দীপ্ত চোখে বেটি আমাদের দিকে তাকালো। 'তোমাদের এই হাল ছেড়ে দেওয়ার ভঙ্গিটা আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারি না।'

নতুন একদল অতিথি এসে পড়ায় বেটিকে উঠে পড়তে হলো।

বেটি স্টেইনের বাড়ি থেকে হোটেলে ফেরার পথে ডাক্তার গ্রাফেনহেইমের কথা মনে পড়তেই বুকের ভেতরটা কেমন যেন একটা বিষণ্ণতায় ভরে উঠলো। জার্মানীতে উনি ওঁনার স্ত্রীকে ফেলে রেখে এসেছেন। ওঁনার স্ত্রী ইহুদি নন। গত পাঁচ বছর ওঁরা গেস্টাপোর অত্যাচার সহ্য করেও

নিজেদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিলেন এবং ওঁনার স্ত্রীকে কিছুতেই বিবাহ-বিচ্ছেদে রাজি করানো যায়নি। গত পাঁচ বছরে ফ্রাউ গ্রাফেনহেইমের স্নায়ুর ওপর যত রকম চাপ সৃষ্টি করা সম্ভব ছিলো, গেস্টাপো তার কোনোটাই সদব্যবহার করতে ছাড়েনি। প্রতি সপ্তাহেই ওরা জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে ডাক্তারকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতো। ওরা সাধারণত আসতো ভোর চারটে থেকে আটটার মধ্যে। প্রতিবারই ওদের কড়া নাড়ার শব্দে স্বামী-স্ত্রী তুজনেই আঁতকে উঠতেন।

ডাক্তারকে এনে প্রথমেই ঢুকিয়ে দেওয়া হতো একটা ছোট কুঠরিতে, যেখানে অন্যান্য ইহুদিদের গাদাগাদি করে ঠেসে রাখা হয়েছে। ইহুদি-দের কেউ কেউ হয়তো বা বেশ কয়েকদিন ধরেই ওখানে আটকে রয়েছে, হিমেল আতঙ্কে যাদের কপালে ফুটে উঠেছে গুঁড়ি গুঁড়ি ঘামের বিন্দু। ওরা পরস্পরের মধ্যে ফিসফিস করে কথা বলছে, কিন্তু কি বলছে কেউ বুঝতে পারছে না। বাইরের বারান্দায় ভারি পায়ের শব্দ শোনার প্রতীক্ষাতেই ওরা উৎকণ্ঠিত হয়ে রয়েছে। পায়ের শব্দ মানেই জিজ্ঞাসা-বাদের জন্যে কাউকে না কাউকে এবার নিয়ে যাওয়া হবে। কয়েক মিনিট কিংবা কয়েক ঘণ্টা পরে রক্তাক্ত একটা দেহকে ঠেসে দেওয়া হবে সেই কুঠরিটার মধ্যে। কেউ কোনো কথা না বলে যার পক্ষে যতটা সম্ভব সবাই সেই আহত বা অবচেতন লোকটার সেবা শুশ্রূষা করবে। কয়েকবারের অভিজ্ঞতার পর ডাক্তার গ্রাফেনহেইম সন্তর্পণে তু তিনটে রুমাল নিজের কাছে লুকিয়ে রাখতেন। কেননা আহত লোকটার ক্ষত-স্থানে ব্যাণ্ডেজ পাওয়া গেলে,কোনো না কোনো মিথ্যে অজুহাতে শুশ্রূষা-কারীকে শাস্তিশিবিরে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। অবশ্য রুমাল নিয়ে ক্ষত-স্থান বাঁধার জন্যেও কম সাহসের প্রয়োজন হতো না। ধরা পড়লে 'প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির' জন্যে শাস্তিস্বরূপ কোনো কোনো ক্ষেত্রে মৃত্যু-দণ্ডও হতে পারে। এসব উপেক্ষা করেও ডাক্তার গ্রাফেনহেইম জার্মানীতে নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্যে আপ্রাণ সংগ্রাম করেছিলেন। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ার কয়েকদিন আগে গোপনে দেশ ছেড়ে

পালিয়ে আসা ছাড়া তাঁর অন্য কোনো উপায় ছিলো না। সবচেয়ে দুঃখ জনক ব্যাপার যে তিনি স্ত্রীকে বিদায় জানিয়ে আসতে পারেনি, এমন কি আজ পর্যন্ত তিনি স্ত্রীর কোনো খবরও পাননি।

হোটেল রুবেনের বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা রোলস-রয়েস, সঙ্গে তার চালকও রয়েছে। ঝুল-বারান্দায় মেলিকভের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, 'আমি দুঃখিত, নাতাশা। বিশ্বাস করো, সত্যিই সময় নেই। তবে··· ওই যে, তোমার উদ্ধারকারী এসে গেছে।'

আধো আলো-ছায়ায় আমি নাতাশাকে দেখতে পেলাম। জিগেস করলাম, 'বাইরে যে গাড়িটা দাঁড়িয়ে রয়েছে ওটা কি তোমার ?'

'হ্যাঁ, তবে ধার করা।' নাতাশা হাসলো। 'সান্ধ্য-পোশাক, গয়না থেকে শুরু করে আমার সব কিছুই ধার করা। আমার নিজের বলতে কেবল আমি ছাড়া আর কিছুই নেই।'

'হতে পারে। তবে তোমার কণ্ঠস্বর, তোমার হাসির মতোই রোলস-রয়েসটা কিন্তু বাস্তব।'

'শুধু আজ রাতটুকুর জন্যে নাতাশা গাড়িটা ধার পেয়েছে,' মেলিকভ বুঝিয়ে বললো। 'ভোরের আগেই আবার ফেরোত দিতে হবে। আমার সময় হবে না, তুমি বরং ওর সঙ্গে যাও।'

মনে মনে হিসেব করে দেখলাম পকেটে যা টাকা আছে তাতে দুজনের রাতের খাবারের কোনো অসুবিধে হবে না, এমন কি যদি এক বোতলের বেশি স্যাম্পেন না নিই তাহলে আমাদের পক্ষে প্যাভিলনের মতো দ্বিতীয় শ্রেণীর কোনো রেস্তোরাঁতেও যাওয়া সম্ভব।

'তোমার কি মনে হয় পোশাকটা পালটানো দরকার ?' নাতাশার দিকে আমি তাকালাম।

'কোনো দরকার নেই। যা আছে বেশ ভালোই।'

অবশ্য পালটাবার মতো আমার কিছুই ছিলো না। কেননা আমার আর একটা মাত্র পোশাক আছে, যেটা এর চাইতেও খারাপ।

'তাহলে চলো যাওয়া যাক।' সিঁড়ি ভেঙে নামতে নামতে আমি নাতাশাকে বললাম। 'আজকের দিনটা আমার বেশ ভালোই যাচ্ছে। সবে কাজে যোগ দিয়ে কিছু টাকা আগাম পেয়েছি, তার ওপর তিনদিন একটানা ছুটি...'

'ওমা, তাই নাকি! কোথায় কাজ পেয়েছো?'

'একজন ছবি-ব্যবসায়ীর কাছে। ছবির ফ্রেম বাঁধানো, দারোয়ানি থেকে শুরু করে টুকিটাকি ফাই-ফরমাস খাটা, সবই আমাকে করতে হয়।'

'ছবিও বিক্রি করো?'

'না, ওটা মিস্টার সিলভারস করেন।'

নাতাশা অবাক চোখে তাকালো। 'তুমি করো না কেন?'

'আসলে ছবির ব্যাপারটা আমি খুব ভালো বুঝি না।'

'বিক্রির সঙ্গে ছবি বোঝ-বুঝির কোনো সম্পর্ক নেই। আর এসব ব্যবসায় যত কম বোঝা যায় ততই ভালো।'

আমি হাসলাম। 'তুমি এসব জানলে কেমন করে?'

'আমি তো প্রায়ই টুপি, পোশাক, টুকিটাকি নানান কিছু বিক্রি করি। তার জন্যে কমিশন পাই। তুমিও ইচ্ছে করলে পেতে পারো।'

চালক ধীরে ধীরে গাড়িটাকে চালিয়ে নিয়ে চলেছে। নাতাশা একটা বোতামে চাপ দিলো আর আপনা থেকেই আমাদের ঠিক সামনে ছোট্ট একটা মেহগিনি কাঠের টেবিল বেরিয়ে এলো। টেবিলের নিচের একটা পাল্লা খুলে নাতাশা দুটো গেলাস আর একটা বোতল বার করলো। বোতলের গায়ে হাত রেখে গর্বিত স্বরে বললো, 'বরফের মতো ঠাণ্ডা! কিন্তু ভদকা, না হুইস্কি, না শুধু জল কে জানে! আমার মনে হয় নিশ্চয় ভদকাই হবে।'

'তুমি ঠিকই বলেছো।' বোতলটা দেখার পর আমি বললাম। 'এ যে দেখছি খাঁটি রাশিয়ান ভদকা!' কিন্তু এখানে এলো কেমন করে?'

'এই গাড়িটা যে ভদ্রলোকের, রাশিয়ান কূটনৈতিক দফতরের সঙ্গে

ওঁর কি যেন একটা যোগাযোগ আছে। উনি প্রায়ই ওয়াশিংটনে যান।'

ভদকাটা সত্যিই প্রথম শ্রেণীর। এর স্বাদের সঙ্গে অন্য কোনো ভদকার তুলনাই হয় না। নাতাশা জিগেস করলো, 'আর একটু নেবে?'

'নিশ্চয়ই, কেন নয়? যুদ্ধের মুনাফাভোগী একজন মানুষ হিসেবেই আমার ভাগ্য যেন আমাকে চালিয়ে নিয়ে চলেছে। যুদ্ধ চলছে বলেই ওরা আমাকে আমেরিকায় ঢুকতে দিয়েছে। যুদ্ধের জন্যেই আমি এখানে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি, নইলে এখানে কোনোদিনই কাজের লোকের অভাব হতো না। যুদ্ধের জন্যেই আমি এখন এই প্রথম শ্রেণীর রাশিয়ান ভদকা খাবার সুযোগ পাচ্ছি। অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি একজন পরজীবী মানুষ।'

আমার কথা শুনে নাতাশা খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো। 'এবার ইচ্ছাকৃত ভাবেই এটার সদব্যবহার করো।'

পঞ্চম সরণী অতিক্রম করে আমরা তখন সেন্ট্রাল পার্কের দিকে এগিয়ে চলেছি। চিড়িয়াখানা থেকে অস্পষ্ট ভেসে আসছে সিংহের গর্জন। গ্রীষ্মের জন্যেই সম্ভবত ওরা তখনও ঘরে ঢোকেনি।

বেশ খানিকটা নীরবতার পর নাতাশা আমার দিকে তাকালো, তারপর কি যেন ভাবতে ভাবতে বললো, 'তোমার মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যা মাঝে মাঝে আমাকে রীতিমতো উত্তেজিত করে তোলে। মনে হয় কেমন যেন এক ধরনের রহস্যময়তা, একটা আত্মতৃপ্তির ভাব, একটা গভীর সত্যকে তুমি এমন ভাবে আড়াল করে রাখতে চাইছো যাতে কেউ তাকে স্পর্শ করতে না পারে। ইচ্ছে করলে আমি তাকে ছুঁতে পারি না, অথচ বুঝতে পারি। কি বলতে চাইছি তুমি বুঝতে পারছো?'

'নিশ্চয়ই। কিন্তু আজ হঠাৎ এসব কথা কেন বলছো, নাতাশা?'

'তোমাকে বিব্রত করার জন্যে। যাক্‌গে ওসব কথা। আচ্ছা, সত্যি করে বলতো আমি তোমার মনে কোনো ছাপ ফেলতে পারিনি?'

আমি হাসলাম। 'সত্যিই কোনো ছাপ ফেলতে পারোনি।'

স্তব্ধ বিস্ময়ে নাতাশা আমার মুখের দিকে তাকালো। সঙ্গে সঙ্গে

বুঝতে পারলাম এভাবে বলাটা ঠিক হয়নি, কিন্তু তখন দেরি হয়ে গেছে। ম্লান হয়ে গেছে ওর মুখখানা। দাঁতে দাঁত চেপে অস্ফুট স্বরে ও বললো, 'তোমার মতো অসভ্য জার্মান আমি আর একটাও দেখিনি।'

'শুনলে তুমি হয়তো খুশি হবে যে জার্মানরাও আমাকে ওদের একজন বলে মনে করে না। ওরা আমার নাগরিকত্ব কেড়ে নিয়েছে।'

'আমার মনে হয় ওরা ঠিকই করেছে।' কাঁচের দেওয়ালে টোকা দিয়ে নাতাশা চালককে ডাকলো। 'হোটেল রুবেনে চলো।'

'আচ্ছা, ম্যাডাম।'

'না না, হোটেলে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কোনো দরকার নেই।' আমি আপত্তি জানালাম। 'আমি বরং এখান থেকেই ফিরে যেতে পারবো।'

'সে তোমার যা খুশি।'

চালককে বললাম, 'একটু কষ্ট করে এখানেই বেঁধে দাও।' গাড়ি থেকে নেমে নাতাশাকে বিদায় জানালাম। ও কোনো জবাব দিলো না। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আমি কাফে হিণ্ডেনবুর্গের দিকে তাকিয়ে রইলাম আর ভেতর থেকে উৎসারিত হয়ে আসা জার্মান সঙ্গীতের উচ্ছল সুর-মূর্ছনা শুনতে লাগলাম। রাস্তার দু ধারে কাঁচের শোকেসে সাজানো জার্মান কফির সাজ-সরঞ্জাম, চারপাশেই জার্মান কণ্ঠস্বর—আমাকে চকিতে যেন কোন্ বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে দিলো। বিগত বছর-গুলোতে আমি বহুবারই জার্মানীতে ফিরে যাওয়ার কথা ভেবেছি, ফিরে গেলে কেমন লাগবে তার কথা ভেবেছি—কিন্তু এই আমেরিকাতেই যে এমনটা মনে হবে তার কথা কখনও স্বপ্নেও ভাবিনি।

## ছয়

ফ্রিয়েসল্যাণ্ডারদের বাড়িতে উৎসবে আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্যে কান ডাকতে এসেছিলো। সম্প্রতি আমেরিকান নাগরিকত্ব পাওয়া উপলক্ষ্যেই ওঁরা এই ঘরোয়া উৎসবের আয়োজন করেছেন।

'কিন্তু এত তাড়াতাড়ি এটা কি করে সম্ভব হলো?' কানকে আমি জিগেস না করে পারলাম না। 'আমার তো ধারণা ছিলো আমেরিকান নাগরিকত্ব পেতে গেলে পাঁচ বছর সময় লাগে।'

'তোমার আমার ক্ষেত্রে তাই, কিন্তু ফ্রিয়েসল্যাণ্ডারদের ব্যাপারই আলাদা। আমি যতটুকু জানি, যুদ্ধ শুরু হবার অনেক আগে যে বার উনি প্রথম আমেরিকায় এসেছিলেন, সেইসব কাগজপত্র জমা দিয়েই ভেতর থেকে ব্যবস্থা করেছেন।'

আমি চাপা ঠোঁটে হাসলাম। 'ভদ্রলোক সত্যিই করিৎকর্মা।'

অবশ্য ফ্রিয়েসল্যাণ্ডারের কপাল খুব ভালো। নাৎসিরা ক্ষমতায় আসার অনেক আগেই তিনি বহু টাকা আমেরিকান সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করেছিলেন, যা ফুলে-ফেঁপে গত কয়েক বছরে প্রায় দ্বিগুণ মূলধনে দাঁড়িয়েছে। তা সত্ত্বেও তিনি একটা মারাত্মক ভুল করেছিলেন। তাঁর মূলধনের অধিকাংশই নিয়োজিত ছিলো রেশম আর পশম শিল্পের ব্যবসায়ে। ভেবেছিলেন পরিস্থিতি তেমন জটিল হয়ে উঠলে ব্যবসা গুটিয়ে নেবার যথেষ্ট সুযোগ পাবেন। কিন্তু নাৎসিরা ক্ষমতায় আসার দু বছর আগেই অপ্রত্যাশিতভাবে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। হঠাৎ জানা যায় যে জার্মানীর প্রতিনিধিস্থানীয় একটা ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হয়ে গেছে। জনসাধারণের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ার ভয়ে—কেননা দশ বছর আগে মার্কের মূল্যমান কমে যাওয়ায় যে অসম্ভব মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়েছিলো, তার কথা জনসাধারণ আজও ভুলতে পারেনি এবং সেই পরিস্থিতির কথা স্মরণ রেখেই গণতান্ত্রিক সরকারকে মুদ্রার মূল্যমান নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয় এবং সমস্ত বৈদেশিক মুদ্রার লেন-দেন সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেন, যার অর্থ অগনন ইহুদিদের কাছে মৃত্যুপরোয়ানায় সই করারই সামিল। পরবর্তী কালে এই অবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটেনি, বরং নাৎসিরা ক্ষমতায় আসার পর থেকে আরও কড়াকড়ি করা হয়। ফলে কোনো ইহুদিই দেশের বাইরে তাদের টাকাকড়ি নিয়ে যেতে পারেননি।

তখনও পর্যন্ত যথেষ্ট দ্বিধা থাকা সত্ত্বেও, তাঁর সমগোত্রীয় অন্যান্য

ইহুদিদের মতো ফ্রিয়েসল্যাণ্ডারও সবকিছু ফেলে রেখে দেশ ছেড়ে চলে যেতে চাননি। তাঁর ধারণা ছিলো অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই ঝড় থেমে যাবে, নাৎসিরা যেমন রাতারাতি ক্ষমতায় এসেছে, তেমনি আবার রাতা-রাতিই তাদের পতন ঘটবে, তার পরিবর্তে আইন-সম্মত, দায়িত্বশীল কোনো সরকার দেশের শাসনভার গ্রহণ করবে। ফ্রিয়েসল্যাণ্ডার অত্যন্ত গোঁড়া ধরনের দেশপ্রেমিক। নাৎসিদের তিনি বিশ্বাস করতেন না, অথচ বয়স্ক রাষ্ট্রনায়ক, ফিল্ডমার্শাল ফন হিণ্ডেনবুর্গের প্রতি ছিলো তাঁর অসীম শ্রদ্ধা। হিণ্ডেনবুর্গকে তিনি মনে করতেন সাবেকী প্রুশিয়ান সততার জ্বলন্ত প্রতীক এবং সেই হিণ্ডেনবুর্গই যখন হিটলারকে চ্যান্সেলর পদে নিযুক্ত করেছেন, তখন সবকিছু নিশ্চয়ই ঠিক হয়ে যাবে।

ব্যবসায় নানা ধরনের জালিয়াতির অভিযোগে নাৎসিরা যখন তাঁকে সমানে শাসিয়ে যাচ্ছিলো, ফ্রিয়েসল্যাণ্ডার তখনও পর্যন্ত 'সবকিছু ঠিক হয়ে যাবার' স্বপ্ন দেখছিলেন, কিন্তু তাঁর চমক ভাঙলো সেইদিন যখন নাৎসিরা তাঁর বিরুদ্ধে অল্প বয়েসী একটি মেয়েকে ধর্ষণ করার অভিযোগ আনলো। অথচ কিশোরীটিকে তিনি কখনও চোখেও দেখেননি। জার্মান বিচারালয়ের হাস্যকর ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর কোথাও কোনো শ্রদ্ধা ছিলো না বলেই তিনি গোপনে কিছু টাকা মেয়েটির মার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। মারাত্মক ভুলটা করলেন ঠিক সেইখানেই। মেয়েটির মা তখন পঞ্চাশ হাজার মার্ক ক্ষতিপূরণের দাবী জানালেন, না পেলে মা-মেয়ে উভয়েই আদালতের শরণাপন্ন হবেন। অন্য কোনো উপায় ছিলো না দেখে ফ্রিয়েসল্যাণ্ডার ওদের দাবী মেনে নিলেন। কিন্তু তারপরেই দলের বিশেষ কয়েকজন নেতাকে সঙ্গে নিয়ে একজন পদস্থ পুলিশ কর্মচারী এগিয়ে এলো ফ্রিয়েসল্যাণ্ডারকে ব্ল্যাকমেল করার জন্যে। ওরা দাবী জানালো ফ্রিয়েসল্যাণ্ডারের যাকিছু স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ছেড়ে দিতে হবে, তার পরিবর্তে ওরা ফ্রিয়েসল্যাণ্ডারদের দেশের বাইরে চলে যাবার সুযোগ করে দেবে। নাৎসিদের তিনি বিশ্বাস করতেন না, তবু চুক্তিপত্রে সই করলেন। কিন্তু সব চাইতে যা বিস্ময়কর, নাৎসিরা তাদের কথা রেখেছিলো।

প্রতিশ্রুতি মতো প্রথমে ওরা ফ্রিয়েসল্যাণ্ডারের স্ত্রী আর মেয়েকে ডাচ সীমান্তের নির্দিষ্ট একটা জায়গা দিয়ে গোপনে পার করে দিয়েছিলো। উৎরেচ থেকে চিঠি পাবার পরেই তিনি দলিলটা নাৎসিদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন এবং তার তিনদিন পরে নির্বিঘ্নে হল্যাণ্ডে পৌঁছেছিলেন। যদিও তখন তিনি কপর্দকশূন্য অগনন ইহুদি উদ্বাস্তুদেরই একজন, তবু আত্মীয়-স্বজন পরিচিতের সহযোগিতায় ফ্রান্স হয়ে আমেরিকায় পৌঁছতে তাঁর খুব একটা অসুবিধে হয়নি এবং বিনিয়োগের দৌলতে আমেরিকান কোটিপতিদের মধ্যে তিনিও অন্যতম।

আমেরিকান নাগরিকত্ব পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফ্রিয়েসল্যাণ্ডার তার নামটাও পালটে নিয়েছিলেন। অর্থাৎ আমরা যখন তাঁর বাড়িতে পৌঁছলাম, তখন তিনি দানিয়েল ভারউইক। অবশ্য তাঁর পুরনো বন্ধু-বান্ধবরা সবাই তাঁকে ফ্রিয়েসল্যাণ্ডার বলেই সম্বোধন করছিলো।

উজ্জ্বল আলোকিত বসার ঘরখানা বেশ বড় আর খোলামেলা। গত কয়েক বছর এই আমেরিকায় তিনি যে কি বিপুল পরিমাণ অর্থ উপার্জন করেছেন, চারদিকের প্রাচুর্য দেখলে তা সহজেই অনুমান করা যায়। হল-ঘরের ঠিক মাঝখানে লম্বা একটা টেবিলের ওপর বিরাট বিরাট দুটো কেক—একটা কালো চকলেটের প্রান্ত-ঘেরা, যার ওপরে বরফ দিয়ে উৎকীর্ণ করা হয়েছে "ফ্রিয়েসল্যাণ্ডার", অন্যটা হালকা গোলাপী রঙের ফুল আঁকা, তার ওপর বরফ দিয়ে উৎকীর্ণ করা হয়েছে "ভারউইক"।

'এই পরিকল্পনাটা আমার রাঁধুনীর।' ফ্রিয়েসল্যাণ্ডারের ফর্সা, ভরাট মুখখানা খুশিতে আরও দীপ্ত হয়ে উঠলো। গর্বিত স্বরে তিনি বললেন, 'তোমরা যেটা খুশি ব্যবহার করতে পারো।'

'আমার কিন্তু প্রথমই বেশি পছন্দ।' কান নির্দ্বিধায় জবাব দিলো।

'বুঝতে পেরেছি।' ফ্রিয়েসল্যাণ্ডার মুচকি মুচকি হাসলেন। 'কি পান করবে বলো?'

'যে কোনো জার্মান মদ পেলে সবচেয়ে খুশি হতাম। নিদেন পক্ষে

এক পেয়ালা ব্যরদো।'

'তোমার চালাকিটা বুঝতে আমার একটুও অসুবিধে হচ্ছে না, কান। আমাদের কিন্তু সত্যিই খুব ভালো আমেরিকান ব্যরদো আছে।'

'আপনার সাম্প্রতিক আমেরিকা-প্রীতিটাও আমার ধরতে খুব একটা অসুবিধে হচ্ছে না, মিস্টার ফ্রিয়েসল্যাণ্ডার।'

কানের বলার ভঙ্গিতে ফ্রিয়েসল্যাণ্ডার হো হো করে হেসে উঠলেন।

শুধু কেক বা মদ নয়, প্রতিটা খাবারও অত্যন্ত সুস্বাদু। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করায় কান বললো, 'হবে না কেন, প্রতিটা খাবারই যে ওঁর নিজের ঘরে তৈরি। ওঁর বহু বছরের পুরনো একজন হাঙ্গেরীয়ান রাঁধুনী আছে। মহিলাটি সব কাজেই যেমন নিপুন, তেমনি বিশ্বস্ত। ফ্রিয়েসল্যাণ্ডাররা জার্মানী ছেড়ে আসার কয়েকদিন পরেই মহিলাটিও লুকিয়ে সুইজারল্যাণ্ড হয়ে ফ্রান্সে এসে ওঁদের সঙ্গে মিলিত হয়। শুধু তাই নয়, শ্রীমতী ফ্রিয়েসল্যাণ্ডারের যা কিছু গয়নাগাঁটিও সঙ্গে নিয়ে এসেছিলো। সীমান্ত অতিক্রম করার আগে কয়েক তাল ময়দার মধ্যে গয়নাগুলোকে পুরে গিলে ফেলেছিলো।'

হলঘরের চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম ছোট ছোট কয়েকটা দলে তখন বেশ ভিড় জমে উঠেছে।

'সবাই কি উদ্বাস্তু?' আমি জিগেস করলাম।

'না না, ওঁনার বহু আমেরিকান বন্ধু-বান্ধবও রয়েছে। আজকের উৎসবটা প্রধানত ওদেরই জন্যে। তুমি শুনলে অবাক হয়ে যাবে—বাড়িতেও ওঁরা নিজেদের মধ্যে ইংরিজিতে কথা বলেন।'

'অথচ আমি শুনেছি এই আমেরিকাতেই কোনো বয়স্কা ইহুদি হাজার চেষ্টা করেও ইংরিজি শিখতে না পারার জন্যে রান্নাঘরের গ্যাস খুলে দিয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন।'

'আত্মহত্যার ব্যাপারটা আলাদা। ওটা আসে চরম হতাশা থেকে। আমার ধারণা কোনো কিছুর প্রতি মানুষের অসম্ভব দুর্বলতা থাকলে সে কোনোদিনই আত্মহত্যা করতে পারে না।'

লাল বাঁধাকপি দেওয়া ঝলসানো শূয়োরের মাংসের ওপর কাঁটা-চামচ নিয়ে ব্যস্ত থাকা কানের প্লেটটার দিকে নির্দেশ করে আমি হাসতে হাসতে বললাম, 'ঠিক যেমন তোমার দুর্বলতা রয়েছে ওটার ওপর।'

'এটার ওপর আমার দুর্বলতা ছোটবেলা থেকেই। তবে আমি ঠিক এই ধরণের দুর্বলতার কথা বলতে চাইনি···আমার সত্যিকারের দুর্বলতা ওইখানে।'

আঙুল দিয়ে কান রূপসী একটা মেয়েকে দেখিয়ে দিলো। দূরের দিকের একটা টেবিলের সামনে বসে আনমনে আইসক্রিম খেয়ে চলেছে।

মেয়েটির ওপর থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে সবিস্ময়ে কানের মুখের দিকে তাকাতেই ও প্রশ্ন করলো, 'কি, ওকে দেখতে ভালো নয়?'

'ভালো বললে হয়তো ভুলই হবে। বলা যেতে পারে মর্মান্তিক রকমের রূপসী।' আমি আড়চোখে মেয়েটিকে আর একবার দেখে নিলাম। 'ভদ্র-মহিলা যদি ও রকমভাবে একমনে আইসক্রিম না খেয়ে চলতো, আমার নিশ্চয়ই ইচ্ছে করতো কোলে বসিয়ে আদর করতে। কিন্তু হয় ওর পিঠে কুঁজ আছে, নয়তো পায়ে গোদ—নিশ্চয় কোনো না কোনো ত্রুটি আছে। নইলে অমন দেবীর মতো রূপ নিয়ে ফ্রিয়েসল্যাণ্ডারদের বাড়িতে বসে বসে করছেটা কি?'

'না না, শারীরিক দিক থেকে ওর কোথাও কোনো ত্রুটি নেই···উঠে দাঁড়ালেই তুমি সেটা বুঝতে পারবে।' আগ্রহ ভারে কান আমাকে বোঝা-নোর চেষ্টা করলো। 'ওর দেহাবয়ব ঠিক ডায়নার মতো। মসৃণ ত্বক, পরি-পূর্ণ নিটোল স্তন···'

আমি সন্ধিগ্ধ চোখে তাকালাম।

'কি, আমার কথা তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? অনেকদিন ধরে, মানে সেই ফ্রান্সে থাকার সময় থেকেই আমি ওকে চিনি। ওর সবকিছুই আমার জানা।'

'তাহলে ওর ত্রুটিটাও তোমার অজানা নয়?'

'ওর সবচেয়ে বড় ত্রুটি—যেমন নির্বোধ, তেমনি কুঁড়ে। ওর কোনো

উচ্চাশা নেই, প্রত্যাশা নেই, আগ্রহ নেই, উৎসাহ নেই, জটিলতাও নেই। ও কিছু ভাবতে চায় না, কেবল ঘুমতে পারলেই যেন বেঁচে যায়। অমন অদ্ভুত মেয়ে আমি আর একটা দেখিনি।'

'তুমি ওকে সত্যিই ভালোবাসো, কান?'

'হ্যাঁ, পাগলের মতো ভালোবাসি।'

'আর ও?'

কান গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললো। 'এখনও বুঝতে পারিনি।'

'কি নাম ওর?'

'কারমেন।'

কিছুক্ষণের জন্যে আমরা দুজনেই চুপ করে রইলাম। শ্রীমতী ফ্রিয়েস-ল্যাণ্ডার এসে জানালেন, 'পাশের ঘরে এখুনি নাচ শুরু হবে। যদিও যুদ্ধের সময়ে এ ধরণের উৎসব শোভা পায় না, তবু আজকের মতো দিন জীবনে কেবল একবারই আসে। তাছাড়া তরুণ সৈনিকদের একটু আনন্দ দেবার জন্যে এটুকু না করে আমাদের কোনো উপায় ছিলো না।'

ভেসে আসা ওয়ালটসের সুরে দরজার দিকে তাকিয়ে দেখলাম, পাশের ঘরের মেঝে থেকে গালচেটাকে গুটিয়ে একপাশে সরিয়ে রাখা হয়েছে। আগুনের শিখার মতো টকটকে লাল পোশাক পরে কুমারী ফ্রিয়েসল্যাণ্ডার লেপ্টে রয়েছে একজন তরুণ লেফটেন্যান্টের সঙ্গে। পাশেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আইসক্রিম খাচ্ছে আরও দুজন আমেরিকান সৈনিক। খাওয়া শেষ হতে না হতেই একই রকম দেখতে রূপসী দুটি তরুণী এসে ওদেরকে ছিনিয়ে নিয়ে গেলো নাচের আসরে।

কান বললো, 'মেয়ে দুটি কোলার যমজ নামে পরিচিত। জাতীতে হাঙ্গেরীয়ান। সিনেমায় অভিনয় করে। শুনেছি বছর দুয়েক আগে এখানে পালিয়ে আসার আগে বুদাপেস্টেও অভিনয় করতো। চলো, এবার ওঠা যাক।'

'তুমি তো ইচ্ছে করলে কারমেনের সঙ্গে একপাক নেচে আসতে পারো।' আমি খোঁচা দিলাম।

'না, এখানে নাচার কোনো মানসিকতাই আমার কাজ করছে না। তাছাড়া ওকে এখন চেয়ার থেকে নড়ানোর সাধ্যি অন্তত আমার নেই।'

আমাদের উঠতে দেখে ফ্রিয়েসল্যাণ্ডার ত্রস্ত পায়ে এগিয়ে এলেন।

'একি, এখনই উঠে পড়লে কেন? নাচের শেষই গুল্যাশ* পরিবেশন করা হবে।'

'আমার সত্যিই একটু তাড়া আছে।'

'তাহলে এক মিনিট দাঁড়াও। আমি রোসিকে বলছি দু জায়গায় খানিকটা কোরে গুল্যাশ দিতে, যাতে তোমরা সঙ্গে নিয়ে যেতে পারো।'

প্রথমে ভেবেছিলাম কান আপত্তি করবে, কিন্তু সানন্দে ওকে ফ্রিয়েস-ল্যাণ্ডারের প্রস্তাব গ্রহণ করতে দেখে মনে মনে আমি সত্যিই লজ্জা পেলাম।

ফিরে আসার সময় দেখলাম কালো চকোলেটের প্রান্ত ঘেরা কেকটার অর্ধেকটাই উধাও হয়ে গেছে, তখন শুধু 'ল্যাণ্ডার'-টা পড়া যাচ্ছে। মনে মনে ভাবলাম ভারউইকের পরিবর্তে উনি শুধু ল্যাণ্ডার নামটা রাখলেই পারতেন।

## সাত

পরের দিন কাজ থেকে হোটেলে ফিরে দেখলাম আমার নামে একটা চিঠি পড়ে রয়েছে। লিখেছেন আইনজীবী ভদ্রলোক। আমেরিকায় আমার বসবাসের মেয়াদ আরও ছমাস বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সব শেষে জানিয়েছেন চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি যেন ওঁর সঙ্গে ফোনে একবার যোগাযোগ করি। কেন উনি ফোনে যোগাযোগ করতে বলেছেন বুঝতে আমার কোনো অসুবিধে হলো না।

মনে মনে ঠিক করলাম তার আগে কানের সঙ্গে একবার দেখা করবো। ও থাকে দোকানেরই ওপর একটা ঘরে। ঘরটা খুবই ছোট।

* গরুর মাংস এবং নানা ধরণের তরি-তরকারি দিয়ে তৈরি এক ধরণের সুরুয়া

সারাক্ষণই রাস্তা থেকে ভেসে আসা গাড়ি-ঘোড়ার প্রতিটা শব্দ স্পষ্ট শোনা যায়, অনেক রাত পর্যন্ত রাস্তার ওপারের নিয়ন আলোয় ভরে থাকে ওর ছোট ঘরখানা। অবশ্য ওসব নিয়ে ও আদৌ মাথা ঘামায় না, অন্ধকার এবং নৈঃশব্দ—দুটোকেই ও সমান ভাবে ঘৃণা করে। তাছাড়া অত সস্তায় নিউ ইয়র্কের মতো শহরে আলাদা কোনো ঘর পাওয়াও সম্ভব নয়।

পোশাক না পালটেই আমি বেরিয়ে পড়লাম। বাইরের ঝুল-বারান্দায় দেখলাম নাতাশা বসে রয়েছে। হঠাৎ চোখাচুখি হয়ে যাওয়ায় অপ্রস্তুতে পড়লাম, তবু মনে হলো কথা না বলে চলে যাওয়াটা অশোভন। তাই জিগেস করলাম।

'মেলিকভের জন্যে অপেক্ষা করছো?'

'না, তোমার জন্যে।' নাতাশা হাসলো। 'খব অবাক হচ্ছো তো?'

'উঁহু, একটুও না।'

'রাগও না?'

'রাগও না।'

'তোমার খাওয়া হয়ে গ্যাছে?'

মনে মনে আমি পয়সার দ্রুত একটা হিসেব করে নিলাম। 'না, ইচ্ছে করলে আমরা প্যাভিলনে যেতে পারি।'

হঠাৎ খেয়াল হলো নাতাশা আমার সর্বাঙ্গ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। নতুন একপ্রস্থ পোশাক কেনার জন্যে মিস্টার সিলভারস আমাকে কিছু টাকা আগাম দিয়েছিলেন, বলেছিলেন আমি যেন নতুন পোশাক পরে কাজে আসি। কাজ থেকে ফেরার পরে আমি আর ওটাকে পালটাইনি।

'নতুন?'

'হ্যাঁ।'

'জুতোটাও নতুন মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ, জুতোটাও নতুন। তোমার কি মনে হয় না এ পোশাকে প্যাভিলনে যাওয়া যেতে পারে?'

'আজ আর প্যাভিলনে যাবো না। গতকাল ওখানে গিয়েছিলাম। অসম্ভব ভিড়। গ্রীষ্মকালে খোলামেলা কোনো জায়গায় খাবার ব্যবস্থা থাকলে ভালো হোতো। কিন্তু আমেরিকায় এটা এখনও পর্যন্ত কেউ আবিষ্কারই করেনি।'

'আমার ঘরে খুব ভালো হাঙ্গেরিয়ান গুল্যাশ আছে এবং পরিমাণও খুব একটা কম নয়···ছুজন মানুষের বেশ ভালো ভাবে চলে যেতে পারে। আমি বাজি রেখে বলতে পারি এমন চমৎকার জিনিস তুমি কখনও খাওনি।'

'কোথায় পেলে?'

'গতকাল একটা পার্টিতে গিয়েছিলাম।'

'ওরা তোমাকে গুল্যাশ বাড়িতে আনতে দিলো? পার্টিটা কোথায় হয়েছিলো? ওটা কোনো জার্মান···'

নাতাশার সন্দিগ্ধ চোখের দিকে তাকিয়ে আমি সতর্ক হয়ে উঠলাম। 'না না, ওটা কোনো জার্মান পার্টি নয়, জার্মান গুল্যাশও নয়। সম্পূর্ণ হাঙ্গেরীয়ান। এক ভদ্রলোক আমেরিকান নাগরিকত্ব পাওয়া উপলক্ষ্যে ঘরোয়া একটা উৎসবের আয়োজন করেছিলেন।' নাতাশার ভাবনাকে খোঁচা দেওয়ার জন্যে ইচ্ছে করেই বললাম, 'ভুরি-ভোজ ছাড়া নাচেরও ব্যবস্থা ছিলো।'

'তাই নাকি! তাহলে এখানেও দেখছি তোমার পরিচিতের সংখ্যা খুব একটা কম নয়?'

'গুল্যাশ ছাড়াও ওঁরা সঙ্গে কিছু পিকল আর স্ট্রুডেল দিয়েছিলেন। ওগুলো এখনও বেশ ভালোই আছে, শুধু গুল্যাশটাই যা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।'

'একটু গরম করে নেওয়া যায় না?'

'কফির ছোট্ট একটা পাত্র ছাড়া আমার ঘরে গরম করার মতো আর কিছু নেই।'

নাতাশা ঢেউ খেলিয়ে হাসলো। 'মেয়েদের উত্ত্যক্ত করা মতো তোমার

অন্তত কিছু রাখা উচিত ছিলো।'

'এবার থেকে তাই রাখবো ভাবছি। তার আগে চলো, প্যাভিলন ছাড়া অন্য কোথাও যাওয়া যাক।'

'না, তোমার গুল্যাশের লোভ আমি কিছুতেই ছাড়তে পারছি না। মেলিকভ এখুনি এসে পড়বে। ও নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করতে পারবে। চলো, বরং বাইরে থেকে একটু ঘুরে আসি। আজ সারা দিন একটুও বেরুবার সময় পাইনি। তাছাড়া তোমার গুল্যাশের জন্যে খিদেটাও একটু বাড়িয়ে নেওয়া দরকার।'

জুতোর প্রতি নাতাশার আসক্তি দেখে আমি মনে মনে শঙ্কিত না হয়ে পারলাম না। এমন একটাও জুতোর দোকান নেই যার সামনে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে ও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে না। যদি ঘণ্টাখানেক পরে ঘুরে এসে ওই দোকানটার সামনে দাঁড়ায়, তখনও আবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবে।

'তুমি ভাবছো আমার মাথায় ছিট আছে, তাই না?'

'কেন?'

'যেহেতু একটু আগেই আমি এগুলো দেখে গেছি। নিশ্চয়ই এর মধ্যে ওরা কোনো রদ-বদল করেনি।'

'কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে তুমি সব জুতো ভালো করে লক্ষ্যই করোনি।'

'তাহলে তুমি সত্যিই কিছু মনে কোরছো না তো?'

'একটুও না। আমারও নতুন জুতো দেখতে খুব ভালো লাগে।'

উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে আমরা খানিকক্ষণ ঘুরে বেড়ালাম। কানের দোকানের সামনে দিয়ে যাবার সময় দেখলাম ভেতরে আলো জ্বলছে। তখনই পরিকল্পনাটা হঠাৎ আমার মাথায় এলো। নাতাশাকে বললাম, 'তুমি এক মিনিট এখানে দাঁড়াও। আমার মনে হয় গুল্যাশ গরম করার সমস্যাটা বোধহয় সমাধা করতে পারবো।'

কপাট ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করতেই কান আমাকে এবং আমার ঠিক পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা নাতাশাকে দেখতে পেলো।

'বাইরে দাঁড় করিয়ে না রেখে তুমি তো ভদ্রমহিলাকে ভেতরে আসার কথা বলতে পারো।'

'আসলে আমি এখানে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করবো না। আমি শুধু তোমার কাছ থেকে গরম করার ইলেকট্রিক পাত্রটা ধার চাইতে এসেছি।'

'এখন?'

'হ্যাঁ।'

'সত্যিই আমি দুঃখিত, রবার্ট। গুল্যাশ গরম করার জন্যে ওটা আমার নিজেরই লাগবে। কারমেনের এখানে খাওয়ার কথা আছে। ও যেকোনো সময়েই এসে পড়তে পারে। ইতিমধ্যেই ও ঘণ্টাখানেক দেরি করে ফেলেছে।'

'করমেন আসবে। তুমি ঠিক বলছো?'

কাঁচের শার্সির ওপারে নাতাশার দিকে তাকিয়ে দেখলাম ওকে কেমন যেন নিঃসঙ্গ অথচ কামনাবিধুর মনে হচ্ছে।

'হ্যাঁ। তোমরাও ইচ্ছে করলে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারো। তারপর আমরা সবাই মিলে মুষ্টিযুদ্ধের ধারাবিবরণী শুনতে পারবো।'

'দারুণ হবে। কিন্তু কোথায় খাবো? তোমার ঘরটা তো খুব ছোট।'

'কেন, এখানে, এই দোকানে বসেই খাবো। দেখো কোনো অসুবিধে হবে না।'

আমি দ্রুত পায়ে নাতাশার কাছে ফিরে গেলাম। কেন জানি না সেই মুহূর্তে ওকে আমার অনেক বেশি আন্তরিক মনে হলো।

'আজ রাতে আমাদের এখানে খাবার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।'

'কিন্তু আমাদের গুল্যাশের ব্যাপারটা কি হবে?'

'এখানের আমন্ত্রণটাও গুল্যাশের।'

অবিশ্বাসী চোখে আমার দিকে তাকালেন নাতাশা। 'তার মানে?'

আমি মুচকি মুচকি হাসলাম। 'সেটা তুমি নিজে চোখেই দেখতে পাবে।'

'সারা শহরে তোমরা গুল্যাশের পাত্র লুকিয়ে রেখেছো নাকি?'

'না, কেবল সুনির্দিষ্ট কয়েকটা কেন্দ্রে।'

দূর থেকে আমি কারমেনকে আসতে দেখলাম। গায়ে হালকা ধূসর রঙের বর্ষাতি, মাথায় টুপি নেই। ওকে আহ্বান জানানোর জন্যে কান চকিতে উঠে দাঁড়ালো। নাতাশা একবার দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিলো। আমাদের উপস্থিতিতে কারমেন আদৌ বিস্মিত হয়নি। ফিকে মেহেদি রঙের চুলগুলোকে হাত দিয়ে ঠিক করে নিয়ে মৃদুভাষে ও বললো, 'আমি একটু দেরি করে ফেলেছি। অবশ্য গুল্যাশের ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই সেটা খুব একটা অসুবিধে হবে না। আচ্ছা, ওরা তোমাকে স্ট্রুডেল দেয়নি?'

'নিশ্চয়ই, চেরি স্ট্রুডেল, চিজ স্ট্রুডেল, অ্যাপেল স্ট্রুডেল, কোনো-টারই অভাব নেই।' ব্যস্ততার মধ্যেই কান জবাব দিলো।

আগের দিনের চাইতে গুল্যাশটাকে অনেক বেশি সুস্বাদু মনে হচ্ছে। মিষ্টি একটা সুরমূর্ছনা ছড়িয়ে পড়েছে সারা ঘরে। মুষ্টি-যুদ্ধের ধারা-বিবরণীটা পাছে শুনতে না পায়, সেই ভয়ে কান ছটা বেতারযন্ত্রই চালিয়ে রেখেছে। চার আঙুলের সাহায্যে পিকল আর চামচের সাহায্যে হাঙ্গেরীয়ান গুল্যাশ যখন প্রায় শেষ করে এনেছি, হঠাৎ দরজায় প্রচণ্ড কড়া নাড়ার শব্দ শুনতে পেলাম। কান আর আমি প্রথমে ভেবেছিলাম বোধহয় পুলিশ, কিন্তু দরজা খুলতেই দেখা গেলো রাস্তার ঠিক উলটো দিকের পানশালার একজন পরিচারক বড় চারটে গেলাসে পানীয় নিয়ে এসেছে।

'পানীয়ের ফরমাস আবার কে দিলো?' অবাক হয়েই কান প্রশ্ন করলো।

'একজন ভদ্রলোক। সম্ভবত উনি কাঁচের জানলা দিয়ে দেখতে পেয়েছিলেন আপনাদের ভদকার বোতল আর গেলাসগুলো সব খালি।'

'ভদ্রলোককে তুমি চেনো?'

'না।'

'কোথায় উনি?'

'দাম মিটিয়ে দিয়ে চলে গ্যাছেন। আমি একটু পরে এসে গেলাস-গুলো নিয়ে যাবো।'

'তখন আমাদের জন্যে আরও চারটে পানীয় নিয়ে এসো।'

'আচ্ছা, স্যার।'

আমাদের কফি পরিবেশন না করতে পারার জন্যে কান ক্ষমা চাইলো। কেননা কফি তৈরির জন্যে ওকে ওপরে যেতে হলে মুষ্টি-যুদ্ধের শুরুটাই ও শুনতে পাবে না।

মুষ্টি-যুদ্ধ শেষ হবার পর কানকে এমন বিধ্বস্ত মনে হলো যেন এতক্ষণ ও নিজেই মল্লভূমিতে ছিলো। গদি-আঁটা একটা কুর্সিতে গা এলিয়ে দিয়ে কারমেন নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েছে।

ওকে দেখিয়ে কান ফিসফিসিয়ে বললো, 'কি, তোমাকে বলিনি—এ পৃথিবীতে ঘুমতে পারলে ও আর কিছু চায় না।'

'ওঁকে বরং ঘুমতে দিন,' চাপা স্বরে নাতাশা বললো। 'আমরা এবার চলি। সবকিছুর জন্যেই অসংখ্য ধন্যবাদ। শুভরাত্রি।'

কুয়াশা ভরা পথে হাঁটতে হাঁটতে নাতাশা এক সময়ে বললো, 'ভদ্র-মহিলা সত্যিই রূপসী। এমন আশ্চর্য রূপসী যে আমার নিজেরই নিজেকে কেমন যেন ছোট মনে হচ্ছিলো।'

'সেই জন্যেই কি তুমি তাড়াতাড়ি ওখান থেকে চলে এলে?'

'না, সেই জন্যেই আমি এতক্ষণ ওখানে ছিলাম। সুন্দর দেখতে মানুষদের আমার খুব ভালো লাগে। অবশ্য কখনও কখনও আবার ওদের দেখলে আমার মন খারাপও হয়ে যায়।'

'কেন?'

'যেহেতু ওরা চিরকাল নিজেদের রূপকে ধরে রাখতে পারবে না, এক-দিন না একদিন বুড়ো হবেই।'

দু-একটা খোলা থাকলেও অধিকাংশ দোকানই তখন বন্ধ হয়ে গেছে। আধো আলো-ছায়ায় আমরা সেই ঘুমন্ত দোকানগুলোর পাশ দিয়ে হেঁটে চলেছি। নাতাশা মন্তব্যে আমি চকিতে মুখ তুলে তাকালাম।

'আশ্চর্য, এমন কথা তো আমার কখনও মনে হয়নি। অবশ্য নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্যে এত ব্যস্ত থাকতে হয়েছে যে বুড়ো হবার কথা কখনও ভাববারই অবকাশ পাইনি।'

নাতাশা হাসলো। 'আমি কিন্তু সব সময়েই ভাবি।'

'মেলিকভের ধারণা যারা তরুণ, বুড়ো হওয়ার প্রকৃত অর্থ তারা কোনোদিনই বুঝতে পারে না।'

'আর মেলিকভের মতো যারা চিরকালের বুড়ো, তারা তরুণদের প্রকৃত ভাবনাটাও কোনোদিন ধরতে পারে না। কোনো পুরুষ তখনই সত্যিকারের বুড়ো হয়, যখন সে আর মেয়েদের সম্পর্কে আগ্রহ অনুভব করে না।'

এই ধরণের দার্শনিকতা আমি নাতাশার কাছ থেকে আশা করিনি, তাই মনে মনে কিছুটা অবাক না হয়ে পারলাম না। তবু মুখে বললাম, 'হয়তো তোমার কথাই ঠিক। তবু বর্তমান পরিস্থিতির কথা ভেবেই তোমার কাউকে যাচাই করা উচিত।'

'তার মানে। কি বলতে চাইছো তুমি?'

ঝড়ের আশঙ্কা সত্ত্বেও আমি না বলে পারলাম না, 'মেলিকভের মতো পালিয়ে বেড়ানো কোনো মানুষ যদি মেয়েদের সম্পর্কে তেমন আগ্রহী হতে না পারে, তাহলে তাকে খুব একটা দোষ দেওয়া যায় না, নাতাশা।'

নাতাশা অবাক চোখে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবলো, তারপর ম্লান ঠোঁটে হাসলো। কোনো কথা না বলে নিঃশব্দে আমার হাতটা জড়িয়ে নিলো নিজের হাতের সঙ্গে।

রাস্তার উলটো দিকে আলোকিত একটা জানলা দেখিয়ে আমি বললাম, 'ওই একটা জুতোর দোকান। দেখবে নাকি?'

'না দেখতে পারলে আমার নিজেরই খুব খারাপ লাগবে।'

রাস্তা পেরিয়ে আমরা আলোকিত কাঁচের জানলাটার সামনে এসে দাঁড়ালাম। বাচ্ছাদের মতো অসীম আগ্রহ ভরে নাতাশা প্রতিটা জুতোই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো।

'শহরটা কি বিশাল বলো তো। একবার হাঁটতে শুরু করলে মনে হবে বুঝি আর কোনোদিনই শেষ হবে না। শহরটা তোমার ভালো লাগে না, বিশেষ করে রাত্তিরে?'

'হ্যাঁ, সত্যিই খুব ভালো লাগে। কিন্তু এখন আমরা কোথায় যাবো?

'এ শহরে সেটাই সবচেয়ে বড় সমস্যা। পার্কগুলোয় এমন ভিড় যে শু একবার গেলে তোমার আর সেখানে যেতে ইচ্ছে করবে না।'

'ইচ্ছে করলে আমরা এল মরোক্কোতে যেতে পারি।'

'সেই ভালো।'

এল মরোক্কোয় আমরা পাশের ছোট একটা খুপরি খালি পেলাম।

'কি নেবো?' আমি জিগেস করলাম।

'মস্কো মিউল।'

'সেটা আবার কি জিনিস?'

'ভদকা আর বিয়ারের সঙ্গে কমলার রস মেশানো। দারুণ খেতে।'

'তাহলে তো অবশ্যই নিয়ে দেখতে হয়।'

মেঝেতে জুতোজোড়া খুলে রেখে নাতাশা পা গুটিয়ে বসলো।

'আমেরিকান মেয়েদের মতো আমি খেলাধূলো ভালোবাসি না। আমি ঘোড়ায় চড়তে পারি না, সাঁতার কাটতে পারি না, এমন কি টেনিসও খেলতে পারি না। টিকটিকির মতো ঘরের এককোণে চুপটি করে পড়ে থেকে বকবক করতেই আমার বেশি ভালো লাগে।'

'আর কি ভালো লাগে?'

'অদ্ভুত অদ্ভুত সব রোমাঞ্চকর ঘটনা।'

'আর?'

'ব্যাস, আর কিছু না।' একটু নীরবতার পর নাতাশা নিজে থেকেই

প্রশ্ন করলো, 'মস্কো মিউল তোমার কেমন লাগছে ?'

'সত্যিই চমৎকার।'

'আর ভিয়েনিজ গান ?'

'খুব ভালো।'

'ভিয়েনিজ গান আমার কিন্তু অসম্ভব ভালো লাগে। এমন করুণ আর সংবেদনশীল যে মনে হয় আমি যেন কোন্ বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাচ্ছি।' আমি নাতাশার দিকে তাকিয়ে দেখলাম—ওর মুখখানা কেমন যেন বিষণ্ণ, অথচ কি এক অদৃশ্য খুশিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে ওর দীর্ঘায়ত চোখদুটো। আমাকে আগ্রহী হয়ে উঠতে দেখে ও বললো, 'আসলে কি জানো, প্রেমের ব্যাপারে আমি যেমন ব্যর্থ, তেমনি অসুখী। এমন নিঃসঙ্গ যে স্বপ্ন বলতে আমার আর কোথাও কিছু নেই। মাঝে মাঝে মনে হয় কেন আমি বেঁচে আছি নিজেই জানি না।'

'তুমি কেন বেঁচে আছো জানতে গেলে, তার আগে জানতে হবে জীবনের প্রকৃত অর্থ কি, কি তার উদ্দেশ্য।'

'তুমি নিজেও তাই বিশ্বাস করো ?'

'হ্যাঁ, নাতাশা।'

'আমি সন্ধ্যে থেকে খুব আজেবাজে বকে চলেছি, তাই না ?

'আদৌ না। বরং এসব কথা তুমি যে ভাবতে পারো সে সম্পর্কে আমার কোনো ধারণাই ছিলো না।'

'সত্যি বলছো ?'

'সত্যি।'

পিয়ানো বাদক আমাদের টেবিলের সামনে এসে নাতাশাকে অভিবাদন জানালো।

'কার্ল, আমাকে তুমি 'লুক্সেমবার্গের কাউন্ট' গানটা গেয়ে শোনাতে পারো ?'

'নিশ্চয়, কেন নয়, মাদাম।'

বিপুল আনন্দে একেবারে মগ্ন হয়ে নাতাশা গানটা শুনতে লাগলো।

শব্দগুলো এলোমেলো হলেও সুরটা সত্যিই ভারি মিষ্টি। নাৎসিরা অষ্ট্রিয়া অবরোধ করার আগে পর্যন্ত ওটাই ছিলো সব চাইতে জনপ্রিয় গান। তারপর থেকে কুচকাওয়াজ ছাড়া আর অন্য কোনো সংগীতই শোনা যায়নি।

'লোকটি সত্যিই খুব ভালো গায়।'

'আমি যখনই আসি আমার প্রিয় গানগুলো ও একের পর পর গেয়ে শোনায়।'

'কিন্তু গতবারে আমরা যখন এখানে এসেছিলাম, ওকে তো দেখিনি?'

'সেদিন নিশ্চয়ই ওর ছুটি ছিলো।'

'তুমি হয়তো জানো না—গানটা আমারও প্রিয়।'

'এই একটাই মাত্র গান যা কখনও আমার বিষণ্ণ স্মৃতিকে ফিরিয়ে আনে না।'

'সব স্মৃতিই বিষণ্ণ, নাতাশা। কেননা অতীতকে আর কোনোদিনই ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়।'

মুহূর্তের জন্যে নাতাশা মগ্ন হয়ে কি যেন ভাবলো। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হলো—কারমেনের মতো আশ্চর্য রূপসী না হলেও, কারমেনের চাইতে নাতাশা অনেক বেশি বাস্তব, অনেক বেশি বুদ্ধিদীপ্ত, উচ্ছল আর প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরা। ওর মননের ভঙ্গিটাও কারমেনের চাইতে অনেক বেশি স্বচ্ছ।

'কি ব্যাপার, আমার মুখের দিকে অমন হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছো কেন?' চকিতে সন্ধিহান হয়ে উঠার ভঙ্গিতে নাতাশা বললো। 'তোমার কি মনে হচ্ছে আমার নাকটা জ্বলজ্বল করছে?'

'না, তা নয়। তবে একটা কথা ভাবতে আমার বেশ অবাক লাগছে—পরিচারক কিংবা পিয়ানো বাদকদের সঙ্গে তোমার ব্যবহার অত্যন্ত আন্তরিক, অথচ বন্ধুদের সঙ্গে তোমার আচরণ ঠিক অন্য রকম, শুদ্ধ ভাষায় যাকে বলা যায় পূর্বপাক্ষিক।'

'তার কারণ কি জানো—ওরা অত্যন্ত সরল আর অসহায়। কিন্তু

সত্যি করে বলো তো—আমি যতটা পূর্বপাক্ষিক, তুমি কি তার চাইতেও বেশি সংবেদনশীল নও?'

'আমার ধারণা আমি সত্যিই সংবেদনশীল, হয়তো বা কিছুটা অহংকারীও।'

নাতাশা হাসলো। 'প্রচ্ছন্ন ভাবে অহংকারী আমরা সবাই, কিন্তু মুখে অনেকেই সেকথা স্বীকার করতে চায় না।'

'যেটা সত্যি, তা স্বীকার করতে আমার কোনো সংকোচ নেই।'

দল বেঁধে কয়েকজন নারী-পুরুষ ভেতরে প্রবেশ করলো এবং নাতাশাকে দেখতে পেয়ে ওর দিকে হাত নাড়লো। মনে হলো এখানকার সবাই বুঝি ওর চেনা। দুজন আমাদের টেবিলের দিকে এগিয়ে এসে নাতাশার সঙ্গে কথা বলতে লাগলো। হঠাৎ সব কিছুই আমার কেমন যেন অচেনা মনে হলো, মনে হলো অনেকগুলো লোককে ছোট্ট একটা বিমানের মধ্যে ঠেসে দেওয়া হয়েছে আর ভারসাম্যতা হারিয়ে বিমানটা বাতাসে দুলছে, কাঁপছে তার নীল আর সবুজ ডোরা-কাটা দেওয়ালগুলো। আশ্চর্য, মুখগুলোর একটাকেও আমি চিনতে পারছি না! দীর্ঘদিন অনভ্যাসের ফলে অধিক মাত্রায় পানের জন্যেই কি এমনটা হচ্ছে? না কি ভিয়েনার স্মৃতিই আমাকে টেনে নিয়ে গেছে সুদূর অতীতে, যেখানে আমার মৃত বাবা একদিন লাঠি হাতে বাগানে ঘুরে বেড়াতেন, যিনি সে সময়ে দেশ ছেড়ে চলে যেতে চাননি, কেননা আমার মা ঘর-দোর সবকিছু ফেলে রেখে অন্য কোথাও চলে যাওয়ার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারতেন না! আমি কার্লের দিকে তাকালাম, দেখলাম ওর দুটো হাতই রয়েছে পিয়ানোর ওপর, কিন্তু কোনো শব্দ শুনতে পাচ্ছি না। হঠাৎ এক সময়ে দেখলাম নীল আর সবুজ ডোরা-কাটা দেওয়ালগুলো কাঁপতে কাঁপতে স্থির হয়ে গেলো আর ঠিক তখনই শুনতে পেলাম পিয়ানোর শব্দ। মনে হলো দীর্ঘ বিমানযাত্রার পর আমি যেন আবার শক্ত মাটিতে ফিরে এসেছি।

নাতাশা বললো, 'থিয়েটার ভেঙেছে, এর পর আরও ভিড় বাড়বে চলো, এবার ওঠা যাক।'

থিয়েটার যে ভেঙেছে সেটা স্পষ্টই বোঝা গেলো। সাধারণ নারী-পুরুষ আর বড়লোক ছাড়াও, নাচের পেশাদারী পুরুষ-সঙ্গী আর উর্দিপরা সৈনিকদের ভিড়ে নৈশক্লাবগুলো প্রায় উপচে উঠেছে। ওদের মধ্যে দেখলাম পটিবাঁধা আহত সৈনিকের সংখ্যাও খুব একটা কম নয়। সারা পৃথিবী জুড়ে এখন যে যুদ্ধ চলছে—এই তিক্ত অনুভূতিটুকু আমাকে চকিতে বিষণ্ন করে তুললো। যে দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, আমি সেই দেশেরই সুস্থ স্বাভাবিক একজন মানুষ—আর যারা হিংস্র জিঘাংসাকে প্রতিরোধ করতে চাইছে, আমি তাদেরই দেশের নৈশ একটা ক্লাবে বসে মদ গিলছি। অসহায় নিঃশব্দ একটা ক্রোধে আমার বুকের ভেতরটা কেমন যেন ভারি হয়ে উঠলো।

বাইরের উষ্ণ খোলা হাওয়ায় বেরিয়ে আসার পর কিছুটা স্বস্তি বোধ করলাম। আমাদের দেখে একটা ট্যাক্সি নিঃশব্দে এগিয়ে এলো।

নাতাশা বললো, 'ধন্যবাদ, আমাদের ট্যাক্সি লাগবে না। আমরা খুব কাছেই থাকি।'

পরের বাঁকটাতে নিয়ন আলোগুলো আমাদের পেছনে অদৃশ্য হয়ে গেলো, সামনের চওড়া পথটা স্বল্পালোকিত। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা নাতাশার বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালাম। রাস্তার বাতির পরিপূর্ণ আলোর নিচে ওর মুখখানা আমার হঠাৎই কেমন যেন আশ্চর্য সুন্দর আর অচেনা মনে হলো। চকিতে আমি দুহাতে ওকে বুকের মধ্যে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে চুমো দিলাম। প্রথমে ভেবেছিলাম প্রচণ্ড ক্রোধে ও বোধহয় এখুনি ছিটকে বেরিয়ে যাবে। কিন্তু না, সেসব ও কিছুই করলো না; কেবল দীর্ঘায়ত অপলক চোখদুটো আমার দিকে মেলে দিয়ে কি যেন ভাবলো, তারপর কোনো কথা না বলে ভেতরে চলে গেলো।

## আট

উকিলের প্রথম কিস্তির টাকাটা মেটানোর জন্যে বেটি স্টেইন আমাকে একশো ডলার দিয়েছিলো। কোকিল-ডাকা ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে আমি দরা-দরি করার চেষ্টা করলাম, কিন্তু ভদ্রলোককে এক চুলও নড়ানো গেলো না। এমন কি, সাধারণত আমি যা কখনও করি না, আমার জীবনের শেষ পাঁচটা বছরের নানান কাহিনীও ওঁকে শোনালাম, কেননা পাঁচশো ডলার ঋণের বোঝা আমার কাছে সত্যিই গুরুভার। টাকাটা দেবার সময় বেটি স্টেইন বলেছিলো, 'তোমার জীবনের করুণ কাহিনীগুলো ওঁকে বোলো, তাহলে হয়তো কিছুটা কাজ হতে পারে। তাছাড়া ওগুলোর কোনোটাই তো আর মিথ্যে নয় যে বলতে তোমার সংকোচ হবে।' কিন্তু তাতেও কোনো লাভ হলো না। উকিল ভদ্রলোক হাসতে হাসতেই বললেন, 'আমি আপনার কাছ থেকে যথেষ্ট কম করেই নিয়েছি, মিস্টার রস। নইলে আমার সাধারণ পারিশ্রমিকও এর চাইতে অনেক বেশি। আর উদ্বাস্তুর কথা যদি বলেন, আপনার মতো দেড় লক্ষ উদ্বাস্তু প্রতি বছরই আমেরিকায় আসছে। আপনার কাহিনীর মধ্যেও কোথাও কোনো নতুনত্ব নেই। বরং সেই তুলনায় বলতে গেলে আপনি তরুণ এবং আপনার স্বাস্থ্যও অনেক ভালো। আজকের দিনে আমাদের দেশে যাঁরা কোটিপতি, তাঁদের অনেকেই আপনার মতো অবস্থা থেকে জীবন শুরু করেছিলেন। আপনি তো তবু হোটেলে ডিশ ধোওয়ার অবস্থা অতিক্রম করে এসেছেন এবং শুনেছি আপাতত আপনি একটা বেশ ভালোই কাজ পেয়েছেন। আপনার অবস্থা এমন একটা কিছু খারাপ নয়। কাদের অবস্থা খারাপ জানেন? যেসব ইহুদি নিঃস্ব, রিক্ত, বৃদ্ধ আর অসুস্থ অবস্থায় এখনও জার্মানিতে টিকে রয়েছে তাদের অবস্থা আপনার চাইতে অনেক খারাপ। সুতরাং আপনি এখন আসতে পারেন, আমার অত্যন্ত জরুরী অনেক কাজ পড়ে রয়েছে। আর দেখবেন, দ্বিতীয় কিস্তির টাকাটা দিতে যেন খুব একটা দেরি করবেন না।'

বাইরে বেরিয়ে আসার পর যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম, মনে মনে ভাবলাম—এতক্ষণ ধরে আমার কথা শোনার জন্যে উনি যে বাড়তি পারিশ্রমিক চাননি, এর জন্যে অন্তত আমার খুশি হওয়া উচিত। মন্থর পায়ে শহরের মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলেছি। সকালের নীলিম আকাশে রোদ ঝলমল করছে। সন্থ ধোয়া গাড়িগুলো থেকে দীপ্তি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। শিশুদের কলহাস্যে সেন্ট্রাল পার্কটা ইতিমধ্যেই মুখর হয়ে উঠেছে। উকিল ভদ্রলোকের ওপর থেকে আমার প্রচ্ছন্ন রাগটা ততক্ষণে উধাও হয়ে গেছে, কেবল নিজেরই নিজেকে কেমন যেন ছোট মনে হচ্ছে। এর জন্যে বেটিকেও দোষ দেওয়া যায় না। দোষটা আমার নিজের, কেন আমি এসব কথা ওঁকে বলতে গেলাম ?

উন্মুক্ত একটা প্রাঙ্গণে বসে আমি কফির ফরমাস দিলাম। মনে মনে হিসেব করে নিলাম—আপাতত আমার কাছে চল্লিশ ডলার আছে আর ধার রয়েছে চারশো ডলার। তবু আমি স্বাধীন আর সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, এবং কোটিপতি হবার প্রাথমিক স্তরটা এখনও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। আমি আর এক পেয়ালা কফি নিলাম। গ্রীষ্মের উজ্জ্বল আলোকিত রোদটার দিকে তাকিয়ে আমার পারিতে জার্ডিন ত্য লুক্সেমবার্গের কথা মনে পড়ে গেলো। ঠিক এমনই একটা দিনে অন্তরণশিবির থেকে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে আমি পালিয়ে এসেছিলাম। আর আজ আমি ভ্রাম্যমান কোনো পুলিশেরই কাছে সিগারেট ধরানোর জন্যে আগুন চাই। সেদিন "লুক্সেমবার্গের কাউন্ট" গানটা শুনতে শুনতে আমার লুক্সেমবার্গে অন্তরণশিবিরের কথাই মনে পড়ে গিয়েছিলো। কিন্তু সেটা ছিলো রাত, আর এখন বাতাস-ভরা রোদ-ঝলমলে সুন্দর একটা দিন। সত্যি, দিনের বেলায় সবকিছুই কেমন যেন অন্য রকম মনে হয়।

'হা ভগবান, কোথায় ছিলে এতক্ষণ ?' আমাকে দেখেই সিলভারস বলে উঠলেন। 'উকিলকে টাকা দিতে সারাটা দিন সময় লাগে নাকি ?'

'অবস্থা কাহিল হলে কখনও কখনও তার চাইতেও বেশি সময় লাগতে

পারে।' আমি বিরক্তি প্রকাশ করলাম।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে···আমি এমনিই ঠাট্টা করছিলাম।' সিলভারস ব্যাপারটাকে চাপা দেবার চেষ্টা করলেন। 'আসলে কয়েকটা বিশেষ জরুরী কাজ রয়েছে।'

মনে মনে ভাবলাম নিশ্চয়ই শিকারের গন্ধ পেয়েছেন। এ কদিনে অন্তত এটুকু বুঝতে অসুবিধে হয়নি যে মুখে যত ভালো ব্যবহারই করুন না কেন, শিল্পপ্রীতিটা তাঁর এক ধরণের অভিনয় এবং অর্থ ছাড়া উনি আর কিছুই বোঝেন না।

ইজেল নিয়ে আমরা পাশের ঘরে গেলাম। দুটো ছবি পাশাপাশি দুটো ইজেলে গেঁথে সিলভারস জানতে চাইলেন, 'আমি তোমায় একটা প্রশ্ন করবো, খুব তাড়াতাড়ি জবাব দেবে—কিনতে হলে এ দুটোর মধ্যে তুমি কোনটে কিনবে?'

দুটোই দেগার আঁকা নাচিয়ে মেয়ের ছবি, তখনও ফ্রেমে বাঁধানো হয়নি।

'একি, ভাবলে চলবে না,' সিলভারস তাড়া লাগালেন। 'তাড়াতাড়ি বলো।'

আমি বাঁদিকেরটা দেখিয়ে বললাম, 'এইটা।'

'কেন?'

'যেহেতু এটা আমার বেশি ভালো লাগছে। তবে কারণ জিগেস করলে এত তাড়াতাড়ি বলা সম্ভব নয়।'

'নিশ্চয়ই, সেটা আমি জানি। আর সেই জন্যেই বিতর্কিত বা তাত্ত্বিক কোনো কারণ আমি তোমাকে জিগেস করিনি। আমি শুধু অল্প দু-একটা কথায় জানতে চাইছি ছবিটা কেন তোমার ভালো লাগছে।'

'কিন্তু আপনিই বা সেটা জানতে চাইছেন কেন?'

'যারা ছবি সম্পর্কে কিছু বোঝে না, প্রথম দেখায় তাদের কি ধরণের প্রতিক্রিয়া হতে পারে, সে সম্পর্কে আমি একটা ধারণা পাবার চেষ্টা করছি।'

মুখে কিছু না বললেও, মনে মনে কিছুটা অপমানিত বোধ না করে পারলাম না। আমার মুখ-চোখের অভিব্যক্তি দেখে সিলভারস সম্ভবত কিছুটা অনুমানও করতে পেরেছিলেন, তাই চকিতে মিষ্টি হেসে ঘনিষ্ঠ বন্ধুরই মতো কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'আরে, না না···তোমাকে আঘাত করার জন্যে আমি ওকথা বলিনি। আমি শুধু তোমার প্রাথমিক ধারণাটা-কেই কাজে লাগাতে চাইছি। কোন ছবিটার কি দাম আমি জানি, কিন্তু ক্রেতাদের কি ধরণের প্রতিক্রিয়া হতে পারে সেটা এখনও আমার জানা হয়নি। কি বলতে চাইছি তুমি বুঝতে পারছো?'

'হ্যাঁ। কিন্তু আপনি আগেভাগেই বা সেটা জানতে চাইছেন কেন? ওঁদেরকে দুটোই দ্যাখান।'

'পাগল হয়েছো!' সিলভারস ঠোঁট চেপে মুচকি মুচকি হাসলেন। 'একজনের আঁকা দুটো ছবি কখনও দেখানো উচিত নয়, তাতে ক্রেতাদের মন স্থির করতে অসুবিধে হয়। আসলে কি জানো···' সিগারেট ধরিয়ে সিলভারস গল গল করে একমুখ ধোঁয়া ছাড়লেন। 'ক্রেতাদের যত কম ছবি দেখানো যায়, ততই ভালো। ছবি কেনা আর ভালো দামে ছবি বিক্রি করা—দুটো সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। ঠিক আছে, আমি তোমার পছন্দকেই স্বীকার করে নিচ্ছি। ডান দিকের ছবিটাই বেশি দামী, তুমি যেটা বেছেছো সেটা নয়। ডানদিকের ছবিটা সরিয়ে রেখে তুমি বরং এটাকেই ফ্রেমে বসাও। ভদ্রলোক যেকানো সময়ে এসে পড়তে পারেন।'

একগাদা খালি ফ্রেম থেকে আমি মনের মতো একটা বাছার চেষ্টা করছিলাম, সিলভারস তাড়া লাগালেন, 'এখন আর অত বাছাবাছির সময় নেই। মাঝারি আকারের মোটামুটি একটা ভারি ফ্রেম হলেই চলবে।'

কাঠামো যে একটা ছবিকে কত বদলে দিতে পারে, সত্যিই না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। না-বাঁধানো ছবি যেন মুক্ত বিহঙ্গ, এখুনি ডানা মেলে উড়ে যাবে দিগন্তে। আর ফ্রেমে বাঁধানোর পর ছবিটাকে মনে হবে ওটাই তার সম্পূর্ণ নিজস্ব পৃথিবী, এর মধ্যে অন্য কারুর আর কোনো অধিকার নেই।

'না-বাঁধানো অবস্থায় ছবি কখনও দেখানো উচিত নয়।' পোড়া সিগারেটের টুকরোটা সিলভারস ছাইদানীর মধ্যে গুঁজে দিলেন। 'এক-মাত্র যারা ব্যবসায়ী তারাই কেবল না-বাঁধানো ছবি দেখে যাচাই করতে পারে। তুমি কোন্ ফ্রেমটা বেছেছো?'

'এইটা।'

সমর্থনের ভঙ্গিতে সিলভারস আমার দিকে তাকালেন। 'নিঃসন্দেহে তোমার রুচির প্রশংসা করতে হয়। তা সত্ত্বেও আমাদের কিন্তু অন্য একটা ফ্রেম বাছতে হবে। তুমি বরং এইটে ছাখো।'

রীতিমতো কারুকার্য করা, বেশ চওড়া একটা ফ্রেমে নাচিয়ে মেয়ের ছবিটাকে আলতো করে বসিয়ে ভালো ভাবে দেখবেন বলে উনি একটু দূরে সরে গেলেন। আমি বললাম, 'ছবির তুলনায় ফ্রেমটা বড্ড বেশি ভারি হয়ে যাচ্ছে না—বিশেষ কোরে এ রকম একটা ছবি, যেটা এখনও সম্পূর্ণ শেষই করা হয়নি?'

ছুটো ছবিতেই "দেগার স্টুডিও থেকে" লেখা লাল ছাপ মারা। যেহেতু ছবিছুটো অসমাপ্ত তাই শিল্পী নিজে তাতে কোনো স্বাক্ষর করেননি। শিল্পীর সত্ত্বাধিকারী যাঁরা তাঁরই ছবি ছুটো বিক্রি করেছেন।

'ছবিটা অসমাপ্ত বলেই তো এ রকম একটা ভারি ফ্রেমের দরকার। ছবির ক্ষেত্রে ফ্রেম একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। ফ্রেম যত জমকালো হবে, ছবিটাকে ততই সম্পূর্ণ মনে হবে।'

একদিক থেকে কথাটা অবশ্য ঠিক। সিলভারসের নির্বাচিত ফ্রেমে আমি ছবিটা বাঁধানোর কাজ প্রায় যখন শেষ করে এনেছি, উনি দ্বিতীয় ছবিটার জন্যেও অন্য একটা ফ্রেম বেছে রাখলেন। 'ওটা শেষ হলে এটাকেও বাঁধিয়ে রেখো।'

'তাহলে কি ছুটো ছবিই দেখাবেন বলে স্থির করেছেন?'

'আদৌ না। এটাকে আমি সযত্নে সরিয়ে রেখে দেবো। এটার সম্পর্কে তুমি যেন আবার ওঁকে কিছু বোলো না। আসলে কি জানো...' সিলভারস ঠোঁট চেপে মুচকি মুচকি হাসলেন। 'ছুটো ছবিই সম্পূর্ণ নতুন,

আনাদের ভাষায় যাকে বলে কুমারী মেয়ের মতো অক্ষত। বিশেষ করে এ রকম দুটো ছবি কক্ষোনো একসঙ্গে দেখানো উচিত নয়। তুমি কিন্তু একটু তাড়াতাড়ি হাত চালাও, ভদ্রলোক যেকোনো সময়ে এসে পড়তে পারেন।'

ছোট ছোট কাঁটা-পেরেকগুলোকে ফ্রেমে ঠুঁকে ছবির পেছন পিঠে কাগজ সাঁটতে সাঁটতে ভাবলাম—বলা যায় না, হয়তো এই ফ্রেমটার জন্যেই বাড়তি পাঁচ হাজার ডলার দর হেঁকে বসবেন। অথচ দেগা নিজে কখনও সাদা রঙকরা হালকা ধরণের ফ্রেম ছাড়া ব্যবহার করতেন না। হয়তো এমনও হতে পারে যে তার চাইতে বেশি খরচ করার মতো পয়সা ওঁর ছিলো না। আর ভ্যান গগের ফ্রেম তো দূরের কথা, নিজের খাবার পয়সাই জুটতো না।

'আচ্ছা, ভ্যান গগের দর এখন কত যাচ্ছে?' হঠাৎ কৌতূহল বশেই আমি জিগেস করলাম।

'সেটা অবশ্য ছবির ওপরে নির্ভর করে। তা ধরো…' সিলভারস বোদ্ধার ভঙ্গিতে ঠোঁট কামড়ালেন। 'যদি ডাচ্ পর্যায় হয়, দশ থেকে ত্রিশ হাজার ডলার, পারি পর্যায় হলে পঁচিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার ডলার। আর্লস পর্যায়ের যেকোনো একটা ভালো ছবির দাম এক লক্ষ ডলারও হতে পারে। বছর দশেক আগে হলে এর এক চতুর্থাংশ দামে তুমি কিনতে পারতে, আবার আজ থেকে দশ বছর পরে এখনকার দামের তিন গুণেরও বেশি পড়ে যাবে।'

সত্যি, ভাবতেও অবাক লাগে—এক একটা ছবির দাম যে এত হবে ভ্যান গগ নিজেও কখনো কল্পনা করতে পারেনি।

দুটো ছবিই বাঁধানো হয়ে যাবার পর সিলভারস বললেন, 'এটা যেখানে ছিলো সেখানে রেখে দাও। আর প্রথম ছবিটা নিয়ে যাও আমার স্ত্রীর শোবার ঘরে।'

আমি স্তব্ধ বিস্ময়ে ওঁর মুখের দিকে তাকালাম।

উনি সেই আগের ভঙ্গিতেই ঠোঁট চেপে হাসলেন। 'হ্যাঁ, তুমি ঠিকই শুনেছো। চলো, আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি।'

শ্রীমতী সিলভারসের শোবার ঘরখানা যেমন খোলামেলা, তেমনি সুন্দর সাজানো। প্যাস্টেল আর জলরঙে অল্প যেকটা ছবি আছে, নিঃসন্দেহে তা রুচি আর প্রশংসার দাবী রাখে।

'রেনোয়ার ছবিটা নামিয়ে তার জায়গায় দেগার এই ছবিটা টাঙিয়ে দাও। হ্যাঁ, এবার দুপাশ থেকে পরদাদুটো টেনে দাও। না, অতটা নয়, আর একটু ফাঁক রাখো। হ্যাঁ, এই ঠিক হয়েছে···এবার আলোটা জ্বেলে দাও।'

সিলভারসের পরিকল্পনাটা বুঝতে আমার কোনো অসুবিধে হলো না। নরম অথচ মিষ্টি আলোয় ছবির ব্যাঞ্জনাতে ফুটে উঠেছে একটা গভীর তন্ময়তা।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতেই সিলভারস আমাকে বুঝিয়ে দিলেন ভদ্রলোককে কি কি ছবি দেখাবেন বলে স্থির করেছেন। ঠিক হলো—আমি পাশের ঘরে থাকবো, যখনই কোনো ছবির প্রয়োজন হবে উনি ঘন্টি বাজাবেন। এমনিভাবে চার-পাঁচটা ছবি দেখানোর পর উনি যখন দেগার ছবিটার কথা জিগেস করবেন, আমি তখন যেন ওঁকে স্মরণ করিয়ে দিই যে ছবিটা ওঁর স্ত্রীর শোবার ঘরে আছে। 'সব সময়েই চেষ্টা কোরো ফরাসীতে কথা বলতে। কিন্তু দেগার কথা জিগেস করার সময় ইংরিজিতেই জবাব দিও, যাতে ভদ্রলোক তোমার কথা স্পষ্ট বুঝতে পারেন।'

নির্দেশ দেওয়া শেষ হওয়ার আগেই সদর-দরজায় ঘন্টি বেজে উঠলো। সিলভারস ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। 'তুমি ও ঘরে যাও, আমি দেখছি।'

সিলভারস নিজে অতিথিকে অভ্যর্থনা জানাতে গেলেন, আমি পাশের ছবি রাখার ছোট ঘরটায় এসে বসলাম। চারদিকের কাঠের তাকে থরে থরে সাজানো ছবি, প্রতিটা জানলায় ভারি গরাদ আর ঘসা-কাঁচ লাগানো। চারদিক বন্ধ, স্বল্পালোকিত ছোট ঘরটায় বসে থাকতে থাকতে আমার হঠাৎ সুইজারল্যাণ্ডে একটা কারা-কুঠরির কথা মনে পড়ে গেলো।

অবৈধ প্রবেশের জন্যে আমাকে দুসপ্তা ওই কুঠরিতে বাস করতে হয়েছিলো। কুঠরিটা যেমন ঝকঝকে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, রাত্তিরে তেমনি ঘরখানাকে উত্তপ্ত রাখারও ব্যবস্থা ছিলো। ও রকম একটা ঘরে আরও দুসপ্তা আমি অনায়সেই কাটিয়ে দিতে পারতাম—তাছাড়া খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাও ছিলো সুন্দর। কিন্তু এক ঝড়ের রাতে ওরা আমাকে অ্যানেমাসের কাছে, ফ্রান্সে সীমান্ত বরাবর একটা জায়গায় নিয়ে এলো, তারপর একটা সিগারেট দিয়ে বলতে গেলে এক রকম গলা ধাক্কা দিয়েই বললো, 'আপনি এখন ফ্রান্সে। আর যেন কোনো দিনও আপনার মুখ সুইজারল্যাণ্ডে না দেখতে পাওয়া যায়।'

হয়তো একটু ঝিমুনি এসেছিলো, হঠাৎ পাশের ঘর থেকে ঘণ্টি বাজানোর শব্দ শুনতে পেলাম। আমি ভেতরে গেলাম। কুতকুতে চোখ, টকটকে লালচে কান, রীতিমতো বলিষ্ঠ চেহারার এক ভদ্রলোক বসে রয়েছেন।

আমাকে দেখে সিলভারস অত্যন্ত নরম গলায় বললেন, 'মঁসিয়ে রস, অনুগ্রহ করে 'সিসিলির দৃশ্যালী' ছবিটা একবার নিয়ে আসুন না।'

ছবিটা এনে আমি ইজেলে বসিয়ে দিলাম। কোনো কথা না বলে সিলভারস উঠে গিয়ে জানলার সামনে দাঁড়িয়ে মেঘেদের আনাগোনা দেখতে লাগলেন। বেশ খানিকক্ষণ নীরবতার পর উনি নিজেই ঘুরে দাঁড়ালেন। 'কি, কেমন দেখছেন? সিসিলির যত ভালো ছবি, তার মধ্যে এটা একটা।'

'একেবারে রদ্দি।' ভরাট গলায় ভদ্রলোক নির্দিধায় জবাব দিলেন।

সিলভারস এবার আমাকে কোন ছবিটা আনতে বলবেন আমি তার জন্যেই অপেক্ষা করছি। কিন্তু উনি কিছু বললেন না দেখে আমি ইজেল থেকে ছবিটা খুলে নিলাম। বেরিয়ে আসার সময় ওঁকে বলতে শুনলাম: 'মানসিক দিক থেকে আজ হয়তো আপনি খুব একটা প্রস্তুত হয়ে আসেননি, মিস্টার কুপার। তার চেয়ে বরং অন্য আর একদিন আসুন।'

পাশের বন্দী-কুঠরিটা থেকে ভাবলাম—বাঃ অভিনয়টা মন্দ জমেনি।

তবে এবার নিঃসন্দেহে চাল দেওয়ার পালা মিস্টার কুপারের। কয়েক মিনিট পরে সংকেত পেয়ে গিয়ে দেখলাম দুজনেই বেশ আয়েস করে ক্রেতাদের জন্যে বিশেষ হাভানা চুরুট ধরিয়ে টানছেন। সিলভারসের নির্দেশ মতো আমি একে একে অন্যান্য ছবিগুলোও দেখালাম, সবশেষে শুনতে পেলাম সেই আকাঙ্খিত শব্দটা :

'দেগার ছবিটা একবার নিয়ে আসুন না, মঁসিয়ে রস।'

'ছবিটা এখানে নেই, মিস্টার সিলভারস।' অপরাধীর ভঙ্গিতে আমি বললাম।

'নিশ্চয়ই আছে। নইলে কোথায় যাবে?'

সামনের দিকে একটু ঝুঁকে এসে প্রায় অস্ফুট স্বরে আমি বললাম, 'ছবিটা ওপরের তলায়, মিসেস সিলভারসের শোবার ঘরে, স্যার।'

'কোথায় বল্লেন।'

ইংরিজিতে আমি আবার বললাম, 'মিসেস সিলভারসের শোবার ঘরে স্যার।'

সিলভারস কপাল চাপড়ালেন। 'হা, ভগবান, তাই তো। আমি একদম ভুলেই গিয়েছিলাম। এ ক্ষেত্রে সত্যিই আমি দুঃখিত, মিস্টার কুপার।'

মনে মনে সিলভারসের অভিনয়-দক্ষতার প্রশংসা না করে পারলাম না। উনি আমাকে ছবিটা আনতে বলেননি, বা কুপারকেও বলেননি যে ছবিটা ওঁর স্ত্রীর। উনি শুধু ব্যাপারটায় ইতি টেনে দিয়ে এখন চুপ-চাপ অপেক্ষা করছেন।

আমিও বন্দী-কুঠরিটায় ফিরে এসে প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। হাঙরটাকে সিলভারস যে বঁড়শিতে গাঁথতে পেরেছেন সে বিষয়ে আমি সুনিশ্চিত। তবে কতটা খেলিয়ে তুলতে পারবেন আমি জানি না, কেননা হাঙরটার পক্ষে সুতো কেটে অতল জলে তলিয়ে যাওয়া যেমন সহজ, তেমনি সিলভারসও আবার মনে মনে যে দাম ধরে রেখেছেন তার একটুও কমে ছবিটাকে উনি কিছুতেই ছাড়বেন না। ওঁদের কথা-

ার্তা শোনার জন্যে আমি ইচ্ছে করেই দরজাটা খোলা রেখেছিলাম। রাদরি প্রসঙ্গে স্বাভাবিক ভাবেই যুদ্ধের পরিস্থিতি, শেয়ার, মুদ্রাস্ফীতি, কমিউনিস্টদের আক্রোশ, কালোবাজারি প্রভৃতি এসে পড়লো। মিস্টার ক্পারের ধারণা আজকের দিনে যার পয়সা আছে, আমেরিকায় সে-ই ম্রাট, কেননা পয়সা দিয়ে এখন যেকোনো জিনিসই অর্ধেক দামে াওয়া যায়—বিশেষ করে বিলাস-সামগ্রী।

মদিরার পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে সিলভারস এতক্ষণ চুপচাপ ুনে যাচ্ছিলেন, এবার কৃত্রিম ভঙ্গিতে হাসলেন। 'আপনি কিন্তু একটা িনিস ভুল করছেন, মিস্টার কুপার। ডলারের মূল্যমান কমে যাচ্ছে লে জিনিসপত্রের দাম যে বেড়ে যাচ্ছে এ কথা খুব সত্যি। কিন্তু ছবির ্যাপারটা সম্পূর্ণ আলাদা। অর্থের মূল্যমান একবার কমে গেলে তা ার কোনো দিনই বাড়বে না, অথচ ছবির দাম দিন দিন বেড়েই যাবে। রুন আজকের দিনে কোনো ছবির যে দাম, কয়েক বছর পরে তা পাঁচ-ুণ হয়ে ফিরে আসবে।'

'তাহলে তো আপনার কোনো ছবিই বিক্রি করা উচিত নয়, মিস্টার িলভারস।'

'না করতে পারলে আমি সত্যিই খুশি হতাম। তবে একথা সত্যি, িতান্ত ব্যবসাটাকে চালু রাখার জন্যে যতটা প্রয়োজন তার চাইতে কটাও বেশি ছবি আমি বিক্রি করি না। ইচ্ছে করলে আপনি আমার দ্দেরদের জিগেস করতে পারেন। এই তো, পাঁচ বছর আগে দেগার ছবিটা আমি বিক্রি করেছিলাম, গত পরশুই সেটা কিনলাম ঠিক িগুণ দাম দিয়ে।'

এতক্ষণ পর হাঙরমশাইকে আমি সব চেয়ে বড় ঘাইটা দিতে দেখলাম, ার কাছ থেকে?'

'ওঃ, না, সেটা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়, মিস্টার কুপার। তারপর ারই হয়তো একদিন আমাকে জিগেস করবে কত দামে আমি াপনাকে দেগার ছবিটা বিক্রি করেছি। আসলে কি জানেন, এসব

ব্যাপারে আমি নিজস্ব একটা নীতি মেনে চলি।'

'আচ্ছা আপনার কাছে দেগার আর অন্য কোনো ছবি নেই?'

'আপাতত আমার কাছে দেগার ছবি ওই একটাই, যেটা আমার স্ত্রীর ঘরে রয়েছে।' সিলভারস ইতস্তত করলেন, তারপর ঘন্টি বাজালেন 'মিসেস সিলভারস কি এখন ঘরে আছেন?'

'না, আধঘণ্টা আগে উনি কোথায় যেন বেরিয়ে গেলেন।'

'আয়নার পাশে দেগার যে ছবিটা টাঙানো রয়েছে, ওটা একবার আনা যায়?'

'নিশ্চয়ই। তবে একটু সময় লাগবে, মিস্টার সিলভারস। কাঠের গুলির সঙ্গে স্ক্রু দিয়ে আঁটা আছে।'

'তার চাইতে আমার মনে হয়···আপনি যদি কিছু মনে না করেন, চলুন না মিস্টার কুপার, ওপরে গিয়ে ছবিটা আমরা একবার দেখে আসি।'

'না না, আমার কোনো অসুবিধে নেই।'

সুতরাং আমি আবার আমার বন্দী-কুঠরিতে ফিরে এলাম। বাগানের দিকে খোলা জানলার সামনে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম মিসেস সিলভারস এখন রান্নাঘরে তাঁর গৃহস্থলির কাজে ব্যস্ত, যিনি ছবিটা সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত হয়তো কিছুই জানেন না, অথচ মিস্টার সিলভারস নিশ্চয়ই মিস্টার কুপারকে বোঝানোর চেষ্টা করছেন যে ছবিটা মিসেসের অত্যন্ত প্রিয় এবং ওটা উনি নিজস্ব সংগ্রহে রাখতে চান—তবে কুপারের পছন্দ হলে উনি অবশ্যই স্ত্রীকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করাতে পারবেন।

মিনিট পাঁচ-সাতেক পরেই আমি ওঁদের কথা বলতে বলতে ফিরে আসতে শুনলাম। এবার কিন্তু সিলভারস সন্তর্পণে দরজাটা পেছন থেকে বন্ধ করে দিলেন। ফলে ওঁদের আলোচনার কোনো অংশই আমার কানে এলো না। আধ ঘণ্টা পরে দরজা খুলে সিলভারস মিস্টার কুপারকে বিদায় জানালেন, তারপর নিজেই আমার কুঠরিতে এসে হাজির হলেন।

'তুমি এখন যেতে পারো। কাল-পরশুর মধ্যে ছবিটা কিন্তু মিস্টার কুপারের বাড়িতে পৌঁছে দিতে হবে।'

'যাক, শেষ পর্যন্ত পরিকল্পনাটা তাহলে কার্যকরী হয়েছে?'

কৌতূহল থাকা সত্ত্বেও ছবিটা কত দামে বিক্রি হলো আমি আর সেটা জিগেস করতে পারলাম না।

সিলভারস হাসলেন। 'না হবার তো কোনো কারণ সেই। এর জন্যে যথেষ্ট মাথা ঘামাতে হয়েছে। তবে এই অল্প কদিনে তোমারও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে।'

'তাহলে তো আমার মাইনে বাড়িয়ে দেওয়া উচিত।'

একটা কথা কিন্তু ভুলে যাচ্ছো, রস। যাতুঘরের তত্ত্বাবধায়ক তোমাকে যা শেখাতে পারেনি, তুমি কিন্তু সেই সব জিনিসই আমার কাছ থেকে বিনা পয়সায় শিখে নিতে পারছো—ব্যবহারিক জীবনে যার মূল্য অনেকখানি।'

টাকাটা ধার দেওয়ার জন্যে সন্ধ্যেবেলায় বেটি স্টেইনকে ধন্যবাদ জানাতে গেলাম। দেখলাম কেঁদে কেঁদে ফুলিয়ে ফেলা ওর চোখদুটো অশ্রুসজল। কয়েকজন পরিচিত বন্ধুবান্ধব ওকে ঘিরে সান্ত্বনা দিচ্ছে। খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকার পর সুযোগ বুঝে বললাম, 'আমি বরং আর একদিন আসবো। আমি শুধু তোমাকে ধন্যবাদ জানাতে এসেছিলাম।'

'কেন, কিসের জন্যে?' বেটি বিহ্বল চোখে তাকালো আমার মুখের দিকে।

'টাকাটা ধার দেওয়ার জন্যে। নইলে আমি সত্যিই উকিলের পারিশ্রমিক সংগ্রহ করতে পারতাম না, এবং তখন এ দেশে বেশি দিন থাকা আমার পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠতো না।'

কোনো কথা না বলে বেটি আবার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। রাবিনোভিৎজ্ নামে একজন অভিনেতা ওকে দুহাতে জড়িয়ে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছে। কিছুটা অবাক হয়েই আমি প্রশ্ন করলাম, 'কিছু কি

হয়েছে?'

'সেকি, আপনি এখনও কিছু জানেন না? মিস্টার মোলার মারা গেছেন। উনি মারা গেছেন গত পরশু।'

বেটিকে সোফা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে রাবিনোভিংজ্ আবার আমার কাছে ফিরে এলো। নাৎসিদের ওপর তোলা ছবিটাতে ও-ও অভিনয় করছে। আমার পরিচিতের মধ্যে ও-ই সবচাইতে নম্র আর সরল।

'আসলে মিস্টার মোলার গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। লিপস্‌শুৎজ্‌ই ওঁকে প্রথম দেখতে পেয়েছিলেন। উনি নিশ্চয় দু'তিন দিন আগেই মারা গিয়েছিলেন। ঝাড়লণ্ঠনের আংটার সঙ্গে দড়ি লাগিয়ে ঝুলছিলেন। ঘরের সবকটা আলোই জ্বালানো ছিলো।'

মর্মাহত না হলেও, ঘটনার আকস্মিকতায় সত্যিই আমার খুব খারাপ লাগছিলো, ইচ্ছে হচ্ছিলো চলে যাই। সম্ভবত আমার মানসিকতা বুঝতে পেরেই রাবিনোভিংজ্ বাধা দিলো, 'না না, এখুনি চলে যাবেন না। মিসেস স্টেইনের আশেপাশে যত লোকজন থাকে ততই ভালো। এই মুহূর্তে ওঁকে একলা রাখাটা ঠিক হবে না।'

ঘরটায় অসম্ভব গরম, মনে হচ্ছে যেন দম বন্ধ হয়ে যাবে। আসলে বেটি তার ঘরের প্রতিটা দরজা-জানলা সম্পূর্ণ রুদ্ধ করে রেখেছে। কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধরনের ওর অদ্ভুত একটা ধারণা আছে—বিলাপকে বাতাসে মিলিয়ে যেতে দেওয়া মানেই মৃতের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা। মৃত মানুষের আত্মাকে মুক্তি দেওয়ার জন্যে দরজা-জানলা খুলে দেওয়ার কথা শুনেছি, কিন্তু দুঃখকে ধরে রাখার জন্যে দরজা-জানলা বন্ধ করে দেওয়ার কথা কখনও শুনিনি।

'আমি এমন বোকা যে আগে থেকে ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারিনি।' রুমালে চোখ মুখতে মুছতে বেটি ডুগরে উঠলো। 'কিন্তু তোমার কথা একদম ভুলেই গিয়েছিলাম। দাঁড়াও, তোমার জন্যে একটু কাফি বানিয়ে আনি।' বেটি উঠে দাঁড়ালো। 'তোমার কি আর কিছু লাগবে?'

'না না, আমার কিচ্ছু লাগবে না। আমি বেশ ভালোই আছি।'

'না, তা হোক। আমি এখুনি আসছি।'

তীব্র আপত্তি জানানো সত্ত্বেও ঘাঘরায় খসখস শব্দ তুলে বেটি রান্নাঘরের দিকে চলে গেলো।

'কেউ কি জানে কেন উনি এমন করলেন?' আমি রাবিনোভিংজ্‌কে জিগেস করলাম।

'এর জন্য কি কোনো কারণের দরকার হয়?'

'না, তা অবশ্য ঠিক।'

'তবে সত্যি বলতে কি জনেন—উনি তেমন নিঃসঙ্গ বা অসুস্থ ছিলেন না। সপ্তা দুয়েক আগে লিপসঙ্গুৎজের সঙ্গে ওঁর দেখাও হয়েছিলো।'

'উনি কি কাজ করার অনুমতি পেয়েছিলেন?'

'না। ওটাই ওঁকে সবচেয়ে বেশি মর্মাহত করেছিলো। উনি লিখতে পারতেন, কিন্তু প্রকাশ করার অনুমতি ছিলো না। বিগত কয়েক বছরে ওঁর কোনো লেখাই প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু আজকের দিনে এ তো বহুলোকের ক্ষেত্রেই বাস্তব। এর জন্যে আত্মহত্যার সত্যিই কোনো প্রয়োজন ছিলো না।'

'উনি কি চিঠি-টিঠি কিছু লিখে গিয়েছিলেন?'

'না। মুখখানা নীল, জিভটা ফুলে ঢোল হয়ে গিয়েছিলো, চোখের কোটরে মাছি ভনভন করছিলো। উঃ, কি বিভৎস, সত্যিই ভাবা যায় না।' চোখের সামনে দৃশ্যটাকে স্পষ্ট ফুটিয়ে তোলার ভঙ্গিতে রাবিনোভিংজ্‌ কেঁপে উঠলো। 'সবচেয়ে মুশকিল কি হয়েছে জানেন, মিসেস স্টেইন ওঁকে দেখতে চাইছেন।'

'উনি এখন কোথায়?'

'শবখানায়।'

হঠাৎ মনে পড়ায় বেটির নিজে হাতে সাজানো সারি সারি ছবিগুলোর দিকে দৃষ্টি ফেরালাম। মিস্টার মোলারের ছবিখানা এখন আর জীবিতদের মধ্যে নেই, স্থান পেয়েছে মৃতদের দলে। তবে ছবিখানাকে

রঙিন রেশমী কাপড়ের কুঁচি দিয়ে সুন্দর করে সাজানো হয়েছে। পনের বছর আগে তোলা ছবিটায় মিস্টার মোলারের হাসি হাসি মুখখানা সত্যিই খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।

ফুল-আঁকা চীনামাটির পাত্রে কফি আর পেয়ালা-পিরিচ নিয়ে বেটি ফিরে এলো, পাত্রে কফি ঢেলে এগিয়ে দিলো আমাদের দিকে।

'কাল অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। তুমি আসছো তো?'

'যদি পারি নিশ্চয়ই আসবো। আসলে আসতে গেলে আমাকে কয়েক ঘণ্টার ছুটি নিতে হবে।'

'তবু এসো। আমি চাই ওর পরিচিত যারা সবাই আসুক। যাতে কারুর অসুবিধে না হয় সেই জন্যে আমরা সাড়ে বারোটায়, দুপুরে খাবার ছুটির সময়টাকেই বেছে নিয়েছি।'

'আমি নিশ্চয়ই আসবো। কাজটা কোথায় হবে?'

চতুর্দশ সরণীতে অ্যাশারের ফিউনার্যাল হোমে।' বেটির পেছন থেকে লিপসশুৎজ্ই জবাব দিলো।

'আর কোথায় কবর দেওয়া হবে?'

'কবর দেওয়া হবে না, বৈদ্যুতিক চুল্লীতে ওখানেই পোড়ানো হবে।'

'পোড়ানো হবে?' যান্ত্রিক ভঙ্গিতে আমি পুনঃরাবৃত্তি করলাম।

'পোড়াতে অনেক কম খরচ পড়ে···তাছাড়া ওরাই সমস্ত ব্যবস্থা করে দেবে।' লিপসশুৎজ্ ম্লান ঠোঁটে হাসলো। 'আমেরিকাতে মরার খরচও অনেক বেশি।'

'কিন্তু জার্মানীতে মরার কোনো খরচ নেই।' খালি পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে আমি উঠে দাঁড়ালাম।

'অচেনা একটা দেশে অজানা মানুষের মধ্যে কাউকে কবর দেওয়ার চাইতে এ অনেক ভালো।' বেটির চোখদুটো আবার সজল হয়ে উঠলো। 'তবে ওরা ইচ্ছে করলে তার আগে পর্যন্ত মৃতদেহটা আমাদের কাছে রেখে দিতে পারতো। যাই হোক, তুমি কিন্তু কাল অবশ্যই এসো।'

বেটির হাতদুটো জড়িয়ে ধরে আমি বললাম, 'নিশ্চয়ই আসবো

বেটি।' কেননা ও ছাড়া তখন আমার আর অন্য কিছুই বলার ছিলো না

'আর টাকাটা ধার দেওয়ার জন্যে তুমি তখন আমাকে ধন্যবাদ জানানোর কথা বলছিলে না? ওতে কিন্তু আমার কোনো কৃতিত্ব নেই। টাকাটা ধার দিয়েছে ফ্রিয়েসল্যাণ্ডার।

'ফ্রিয়েসল্যাণ্ডার?' আমি সত্যিই অবাক হয়ে গেলাম।

'নিশ্চয়ই। ওর ছাড়া আর কার টাকা আছে বলো?'

সেই মুহূর্তে আমি কোনো জবাব দিতে পারলাম না। রাবিনোভিৎজ্ আমাকে দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিলো। 'আমাদের সবাই মিলে চেষ্টা করা উচিত যাতে মিসেস স্টেইন কোনো মতেই না মিস্টার মোলারকে দেখার সুযোগ পান। কেননা চেহারার ওই রকম একটা বিশ্রী অবস্থার পরেও যখন আবার কাটা ছেঁড়া করা হবে, তখন যে আরও কি ভয়ঙ্কর দেখাবে—ভাবতেও আমারই গা শিউরে উঠছে। অবশ্য একটু আগে লিপসশুৎজ্‌কে দেখলাম মিসেস স্টেইনের কফির পেয়ালায় ঘুমের বড়ি মিশিয়ে দিতে। নইলে ওঁকে সামলানো সত্যিই খুব মুশকিল হবে। যাই হোক আপনি কাল আসছেন তো?'

'আমি সত্যিই চেষ্টা করবো, রাবিনোভিৎজ্।'

'শুভরাত্রি, হের রস।'

## নয়

সেদিন রাত্রে একটুও ভালো ভাবে ঘুমোতে পারলাম না, বার বার কেবলই ঘুম ভেঙে যেতে লাগলো। খুব ভোরে হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়লাম। উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে খানিকক্ষণ ঘুরে পঞ্চম সরণীর বাস ধরে এলাম মেট্রোপলিটন যাদুঘরে। কিন্তু তখনও খোলেনি দেখে সেণ্ট্রাল পার্কের মধ্যে দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে সেক্সপীয়ার উদ্যানে এলাম। সেখান থেকে হ্রদের পাড় ধরে হাঁটতে হাঁটতে শীলারের এলাম প্রতিমূর্তির সামনে। নিউ

ইয়র্কের মাঝনধ্যিখানে জার্মান কবির এই প্রতিমূর্তিটাকে আমার কেমন যেন বেমানান মনে হলো, তার ওপর ধবধবে সাদা বেদীর গায়ে লাল খড়ি দিয়ে কে যেন রীতিমতো অশ্লীল একটা ছবি এঁকে রেখেছে। মন্থর পায়ে আমি ফিরে চললাম—নিশ্চয়ই এতক্ষণে যাতুঘরের দরজা খুলেছে।

এর আগেও আমি কয়েকবার এখানে এসেছি এবং প্রতিবারেই আমাকে ব্রুসেলস যাতুঘরে দিনগুলোর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আজকে মেট্রোপলিটনের এই সীমাহীন নির্জনতা মনে হলো আরও অবাস্তব, যেন আমি এমনই একটা ভয়ঙ্কর ঘূর্ণী ঝড়ের কেন্দ্রে বাস করছি যেখানে নিঃশ্বাস নিতে পারছি না, দম বন্ধ হয়ে আসছে। তবু কয়েক ঘণ্টা ধরে সবকিছু ঘুরে ঘুরে দেখে আমি বাইরে বেরিয়ে এলাম।

মিস্টার মোলারের মৃত্যু যে আমাকে এমন গভীর ভাবে নাড়া দেবে আমি সত্যিই ভাবতে পারিনি। প্রথমে ভেবেছিলাম গত কয়েক বছরে আমার পরিচিত বন্ধু-বান্ধবদের অনেকেই যেমন অতি তুচ্ছ কারণে আত্ম-হত্যা করেছে, এটাও সে রকম। আমার মনে পড়লো—ফরাসী একটা অন্তরণশিবিরে থাকার সময় হ্যাসেন ক্লেভার যখন জানতে পারলো জার্মানরা যেকোনো মুহূর্তে এসে পড়তে পারে, ওদের হাতে ধরা পড়ার ভয়েই সে আত্মহত্যা করলো। তবু এই ঘটনার পেছনে একটা যুক্তি ছিলো। কিন্তু মিস্টার মোলারের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অন্য রকম। উনি আদৌ কোনো বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে ছিলেন না, বরং বলতে গেলে উনি বিপদমুক্তই ছিলেন। তবু উনি আত্মহত্যা করলেন যেহেতু জীবনের প্রতি ওঁর কোনো স্পৃহা ছিলো। কিন্তু এই জীবন-বিতৃষ্ণা কত গভীর হলে তবেই কোনো মানুষ আত্মহত্যা করতে পারে—এই ভাবনাটাই আমাকে সবচাইতে গভীর ভাবে নাড়া দিলো।

চতুর্দশ সরণীতে অ্যাশারের ফিউনার‍্যাল হোমে পৌঁছতে আমার কিছুটা দেরিই হয়ে গেলো। যত কম খরচেই ব্যাপারটা মেটানোর চেষ্টা করা হোক না কেন—টবে সাজানো বাহারি ফুল থেকে শুরু করে বাদ্যযন্ত্রে করুণ শোকগাথা পর্যন্ত, আয়োজনের কোথাও কোনো ত্রুটি ছিলো না।

উপস্থিত দর্শকমণ্ডলীর উদ্দেশ্যে লিপসশুৎজ্ ছোটখাটো একটা ভাষণ দিলেন, কিন্তু তার একটা শব্দও আমার কানে ঢুকলো না। কফিনের ওপর জমে ওঠা ছোটখাটো একটা ফুলের পাহাড় থেকে ভেসে আসা গন্ধে আমার মাথা তখন ঝিমঝিম করছিলো। জনা ত্রিশ মানুষের মধ্যে কয়েক-জন লেখক আর অভিনেতা ছাড়া অধিকাংশই আমার অচেনা। পরি-চিতের মধ্যে রয়েছে রাবিনোভিৎজ্, ফ্রিয়েসল্যাণ্ডারের দুপাশে ঢেউ খেলানো উজ্জ্বল লালচে চুল কোলার দুই বোন, কান আর কারমেন। তবে কান আর কারমেন পাশাপাশি নয়, ওরা বসেছে বেশ খানিকটা তফাতে। আমার মনে হলো লিপসশুৎজের ভাষণে অভিভূত হয়ে কারমেন হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে।

অনুষ্ঠানের শেষে কালো দাস্তানা পরা দুজন লোক এসে নিঃশব্দে হাতলওয়ালা কাঁচের বাক্সটা তুলে ধরলো এবং এমন অদ্ভুত ভঙ্গিতে ওটাকে বয়ে নিয়ে গেলো, মনে হলো যেন ওরা ঘাতকেরই অনুচর। আমার সামনে দিয়ে নিয়ে যাবার সময় মনে হলো দুর্গন্ধে বুঝি এখুনি বমি হয়ে যাবে, তবু অবাক হয়েই আবিষ্কার করলাম আমার চোখের কোলে টলটল করছে দুফোঁটা অশ্রু।

সার বেঁধে আমরা একে একে বাইরে বেরিয়ে এলাম। কাঁচে শবা-ধারটি ততক্ষণে উধাও হয়ে গেছে। দরজার সামনে দেখলাম আমি ফ্রিয়েসল্যাণ্ডারের ঠিক পাশটিতে দাঁড়িয়ে রয়েছি। মনে মনে ভাবলাম ধার দেওয়ার জন্যে ধন্যবাদ জানানোর এটাই উপযুক্ত সময়।

উনি জানালেন, 'গাড়ি আছে। ইচ্ছে করলে আপনিও আমাদের সঙ্গে যেতে পারেন।'

ভয়ে ভয়েই প্রশ্ন করলাম, 'কোথায়?'

'বেটির বাড়িতে। ও আমাদের জন্যে সামান্য কিছু খাবার ব্যবস্থা করেছে।'

'আমার কিন্তু সত্যিই বেশি সময় নেই।'

'এখন তো বিরতির সময়। তাছাড়া খুব একটা বেশি সময় লাগবে

না—শুধু একবার মুখটা দেখিয়ে আসা, যাতে ও বুঝতে পারে আপনিও উপস্থিত ছিলেন।'

আমাদের সঙ্গে রাবিনোভিৎজ্, কোলার দুই বোন, কান আর কারমেনও এলো। রাবিনোভিৎজ্ বললো, 'মিসেস স্টেইন যাতে মিস্টার মোলারকে দেখার সুযোগ না পান, তার জন্যে আমরা নিজেরাই প্রস্তাব দিয়েছিলাম যে অনুষ্ঠানের শেষে এখানে এসে খাবো। পরিকল্পনাটা অবশ্য মেয়ারের, কিন্তু ও ছাড়া ওঁকে আটকে রাখার অন্য কোনো উপায় ছিলো না। রান্নাবান্নার জন্যে উনি সেই ভোর ছটা থেকেই ব্যস্ত হয়ে রয়েছেন।'

বেটি আমাদের জন্যে দরজা খুলে দিলো, যমজ দুই বোন ওর পেছন পেছন রান্নাঘরের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেলো। আজকের দিনের জন্যে বেটি তার সবচেয়ে দামী ঢাকনাগুলোকে বিছিয়ে কাঁটা-চামচ আর চীনামাটির পাত্র দিয়ে টেবিল সাজিয়ে রেখেছে, যেন সংক্ষিপ্ত খাবারের এই আয়োজনটাকে সুসম্পূর্ণ করে তোলার জন্যে বেটি ওর দুঃখকে একেবারে পরিপূর্ণ ভাবে উজাড় করে দিয়েছে।

সিলভারসের কাছে ব্যবসায়িক তালিম নিতে নিতেই বিকেলটা কেটে গেলো। কোনো একটা ছবি পাশের ঘরে থাকা সত্ত্বেও, কিভাবে আমাকে এসে বলতে হবে যে ছবিটা কোনো একজন রকফেলার, ফোর্ড কিংবা মেলন দেখতে নিয়েছেন—তারই মহড়া চললো। এবং রীতিমতো বিশ্বাসযোগ্য মনে না হওয়া পর্যন্ত আমাকে বেশ কয়েকবার তা পুনরাবৃত্তি করে দেখাতে হলো। 'ক্রেতাদের আকৃষ্ট করতে গেলে এগুলো যে কি ভীষণ কার্যকরী, তুমি কল্পনাও করতে পারছো না, রস। অবজ্ঞা এবং পরশ্রীকাতরতাই ছবি-ব্যবসায়ীদের সব চাইতে বিশ্বস্ত বন্ধু।'

'কিন্তু সেইসব ক্রেতাদের কি হবে যারা সত্যিই ছবি ভালোবাসে?'

'ওদের সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে। আজকের দিনে কেবল তারাই ছবি কেনে যারা এটাকে বিনিয়োগ কিংবা আভিজাত্যের একটা প্রতীক

হিসেবে ধরে নেয়।'

'আচ্ছা ধরুন, কেউ একজন যার খুব একটা পয়সা নেই, অথচ সত্যিই ছবি ভালোবাসে—সে যদি আপনার কাছ থেকে ছবি কিনতে চায়, তাকে কি আপনি কম দামে ছবি বিক্রি করবেন?'

চিবুকে হাত বোলাতে বোলাতে সিলভারস কি যেন ভাবলেন। 'মিথ্যে বলা খুব সহজ। কিন্তু এক্ষেত্রে আমি বলবো—না। গরীব, যাদের ছবি কেনার পয়সা নেই, তাদের উচিত যাদুঘরে গিয়ে প্রাণভরে ছবি দেখে আসা।'

'কিন্তু ধরুন, ছবিটা সে নিজের সংগ্রহে রাখতে চায়...'

'তখন তার ছাপানো ছবি কেনা উচিত। আজকাল এত ভালো অফসেট প্রিণ্ট হচ্ছে যে অনেক সময় মূল ছবির সঙ্গে ছাপানো ছবির পার্থক্যই বোঝা যায় না।'

এর পর আর কোনো প্রশ্নই চলে না। আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে সিলভারস নিজে থেকেই হাসতে হাসতে বললেন, 'একবার বৃদ্ধ ওপেনহেমারের কি হয়েছিলো জানো তো? ওঁনার ছবির খুব ভালো একটা সংগ্রহ ছিলো এবং তার জন্যে ঝামেলার অন্তত ছিলো না। একবার ওঁনার সবচেয়ে দুটো ভালো ছবি চুরি হয়ে গেলো। যদিও পরে ছবি দুটোকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছিলো, কিন্তু চুরির ভয়ে উনি স্বস্তিতে ঘুমতে পারতেন না, বাড়ি ছেড়ে কোথাও বেরুতে পারতেন না। কেননা উনি ছবি সত্যিই খুব ভালোবাসতেন। যদিও বহু টাকার বীমা করা ছিলো, তবু একদিন সব ছবি নিউ ইয়র্কের একটা যাদুঘরে বিক্রি করে দিয়ে মুক্তি পেলেন। তারপর থেকে যখনই তাঁর ইচ্ছে হতো যাদুঘরে গিয়ে ছবিগুলোকে দেখে আসতেন আর ছবি-সংগ্রহকারীদের ঠাট্টা করে বলতেন—যারা সত্যিকারের বোকা তারাই কেবল ছবি সংগ্রহ কোরে তালাচাবি দিয়ে নিজেদেরকে ঘরের মধ্যে বন্দী করে রাখে।

আত্মপরিতৃপ্ত মানুষের মতো বিপুল স্বস্তিতে সিলভারকে হেসে উঠতে দেখে সেই প্রথম আমি মনে মনে ঈর্ষাবোধ না করে পারলাম না।

মোড়ের মাথায় বাঁক নিতেই আমি দূর থেকে হোটেল রুবেনের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা রোলস-রয়েসটাকে দেখতে পেলাম। পৌঁছোনোর আগেই যদি নাতাশা চলে যায় সেই ভয়ে আমি দ্রুত পা চালালাম।

'এই তো, এসে গ্যাছে,' ঝুল-বারান্দায় আমাকে ঢুকতে দেখেই নাতাশা বলে উঠলো। তারপর মেলিকভের দিকে ফিরে হাসতে হাসতে জিগেস করলো, 'ওকে কি একটু ভদকা দেওয়া উচিত বলে তোমার মনে হয়?'

'অসম্ভব গরম,' আমি বললাম। 'সারা শহরটাকে মনে হচ্ছে যেন তুরস্কীয় কোনো স্নানাগার হয়ে রয়েছে।'

'তাহলে চলো কোথাও গিয়ে একটু ঠাণ্ডা হওয়া যাক। গাড়িটাকে রাত এগারোটা পর্যন্তও আটকে রাখলে কোনো অসুবিধে হবে না।'

সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক অবস্থাটা একবার পর্যালোচনা করে নিলাম।

'তুমি কোথায় যাওয়ার ভাবছো?'

নাতাশা হাসলো। 'নিশ্চয়ই প্যাভিলনে নয়।'

'আমাকে ওর সঙ্গে যাওয়ার জন্যে নাতাশা বলছিলো,' মেলিকভ বললো। 'আমার সত্যিই লিওপোল্ডের বাড়িতে নেমন্তন্ন আছে।'

'বিয়ের না শ্রাদ্ধের?' নাতাশা ঠাট্টা করলো।

'ছুটোর কোনোটাই নয়। লিওপোল্ড আমাদের হোটেলের পুরনো অতিথি। সম্প্রতি নতুন একটা বাসায় উঠে যাচ্ছে। মনিবের হুকুমে লিওপোল্ডকে সব রকম সাহায্য করার দায়িত্ব পড়েছে আমার ওপর।'

'মনিব বলতে কে?' কৌতূহলী হয়ে আমি জানতে চাইলাম।

'যিনি এই হোটেলের মালিক।'

'তুমি এমন ভাবে বলছো যেন এটা রিজের মতো নামকরা কোনো হোটেল। তা তোমার মনিবটি কে? আমি কি ওঁকে কখনও দেখেছি?'

'না।'

নাতাশা বললো, 'একজন পালের গোদা।'

মেলিকভ চকিতে নাতাশার দিকে তাকালো। 'ছিঃ, নাতাশা, না জেনে তোমার কারুর সম্পর্কে এভাবে বলা উচিত নয়।'

নাতাশা ঢেউ খেলিয়ে হাসলো। 'আমি ওকে খুব ভালো করেই চিনি। তুমি ভুলে যাচ্ছো কেন ইভান, এক সময়ে আমি এখানেই থাকতাম। আর তোমার যে মনিব, ও সব সময়েই চাইতো আমার সঙ্গে শুতে।'

'নাতাশা!'

'বিশ্বাস যদি না হয়, তুমি নিজেই ওকে জিগেস কোরো।'

'বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন এটা নয় নাতাশা। আর সেকথা যদি বলো, শুধু উনি কেন, অনেকেই তোমার সঙ্গে শুতে চেয়েছিলো।'

'কিন্তু যাদেরকে আমার কখনও ভালো লাগেনি শুধু তারাই। যাগ্‌গে ওসব কথা। আমাকে বরং আর একটু ভদকা দাও।' নাতাশা হঠাৎ আমার দিকে ফিরে তাকালো। 'এখানকার ভদকা এত ভালো কেন জানো? এই হোটেলের মালিকের মদ তৈরির একটা কারখানাও আছে। সেই জন্যে এখানকার মদ শুধু যে ভালো তাই নয়, অন্য জায়গার তুলনায় দামেও অনেক সস্তা। জানো রস, এখানকার যে মনিব, সব মিলিয়ে লোকটা কিন্তু খুব একটা খারাপ নয়। বেচারি আমার সঙ্গে শোয়ার আশা এখনও ত্যাগ করতে পারেনি।'

মেলিকভ দ্রুত বাধা দিলো, 'নাতাশা, শোনো…'

'ঠিক আছে ইভান, ঠিক আছে…আমরা চলে যাচ্ছি।'

চালক গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছিলো। আমাকে দেখে বললো, 'আপনি কি চালাবেন, স্যার?'

'রোলস-রয়েস চালাবো আমি! পাগল হয়েছো তুমি? প্রথমত আমার গাড়ি চালাবার কোনো অনুমতিপত্র নেই, দ্বিতীয়ত আমি দীর্ঘদিন গাড়ি চালাইনি। অপরের গাড়ি নিয়ে আমি কোনো বিপদ-আপদ ঘটাতে রাজি নই।'

'হলে কিন্তু সত্যিই দারুণ হতো!' নাতাশা বললো।

আমি চকিতে ওর মুখের দিকে তাকালাম। ওর ঠোঁটের কোণে চাপা দুর্বোধ্য হাসিটুকুর সত্যিই কোনো তুলনা হয় না।

আমার দিকে না তাকিয়েই নাতাশা হুকুম দিলো, 'সেণ্ট্রাল পার্ক।'

'সত্যি কি তুমি ওখানে যেতে চাও?'

'হ্যাঁ, রেস্তোর্ঁার বাইরে খোলামেলা পরিবেশে খেতে আমার খুব ভালো লাগে।'

পায়ে পায়ে রাত্রি নামছে। চিড়িয়াখানায় ভিড়ও অনেক পাতলা হয়ে গেছে। বাদামী ভাল্লুকরা শুয়ে পড়লেও, মেরু অঞ্চলের ভাল্লুকগুলো তখনও তাদের ছোট ছোট জলাধারে সাঁতার কাটছে। গাড়ির চালক অন্য একটা টেবিলের সামনে বসে বড় তিনটে হ্যামবার্গার, শুকনো পিকল্‌স্‌ আর কফির ফরমাস দিলো।

নাতাশা জিগেস করলো, 'আজ সারাদিন কি করলে?'

'আর বোলো না। সারাটা দিন আমার মনিবের উপদেশ শুনতে শুনতেই কেটে গেলো।' তখন আমি সংক্ষেপে সারাদিনের ঘটনা ওকে প্রায় সবই বললাম।

'সত্যি, উপদেশ দিতে পারলে লোকে আর কিছু চায় না। যেন আমার জীবনটাকে কিভাবে সাজানো উচিত, তা নিয়ে ওদেরই চোখে ঘুম নেই।'

'অবশ্য অন্যের উপদেশ ছাড়া, আমি মৃদু প্রতিবাদ করলাম, 'তুমি ইচ্ছে করলে নিজেই নিজের জীবনটাকে সাজিয়ে নিতে পারো।'

'কিন্তু জানো, কথাটা সত্যি নয়।' দূরায়ত চোখে নাতাশা মৃদুভাবে বললো। 'আমার যা প্রয়োজন আমি সবই পেতে পারি। কিন্তু আমি যা করি সব ভুল। অসুখী হতে চাই না, অথচ আমি তাই। নিঃসঙ্গতা আমার ভালো লাগে না, অথচ আমি বরাবরই নিঃসঙ্গ। তুমি হয়তো মনে মনে হাসছো, ভাবছো কত লোকের সঙ্গেই না আমার পরিচয়। হ্যাঁ, একদিক থেকে কথাটা যেমন সত্যি, অন্যদিকে আবার সত্যি নয়ও বটে।'

দিনান্তে বন্য পশুদের শেষ গর্জন যেখান থেকে ভেসে আসছে, ঘনায়মান সেই অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বাচ্ছাদের মতো অনর্গল বকে চলা নাতাশাকে সত্যিই ভারি মিষ্টি দেখাচ্ছে। ওর কথা শুনতে শুনতে আমার হঠাৎই আজ বিকেলে শোনা সিলভারসের কথাগুলো মনে পড়ে গেলো—মনে হলো সিলভারস, নাতাশা—এরা দুজনেই অসম্ভব নিঃসঙ্গ। এদের আবেগের মধ্যে কোথাও কোনো জটিলতা নেই, এদের হতাশাও শিশুদের চাইতে গভীর কিছু নয়, যখন স্পষ্টই বুঝতে পারছে—সুখ জলের বুকে জাগা তরঙ্গেরই মতো ক্ষণভঙ্গুর; যা না বিস্মরণ, না অভিশাপ, না নিষ্কলুষ, না অপরাধ-জর্জরিত কোনো নির্যাতন। অথচ একদিন নিজেদের কৃতকার্য, উদ্ভাবনী, এমন কি ব্যর্থতাতেও ওরা ছিলো অন্য কোনো শতাব্দীর ডানা-মেলা পাখির মতো আশ্চর্য সুখী। ওদের মতো আমিও যদি সবকিছু ভুলে যেতে পারতাম, নিজেকে কি অসম্ভবই না সুখী মনে হতো!

দু হাতের স্তব্ধ করপুটে চিবুক রেখে নাতাশা এতক্ষণ অন্ধকারের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে ছিলো, হঠাৎ আমার দিকে ফিরে ম্লান ঠোঁটে হাসলো। 'আসলে কি জানো, আমরা কেউই নিজের কাছ থেকে পালাতে পারি না।'

'পারি, শুধু একবার। তারপর আর ফিরে আসার কোনো উপায় থাকে না।' নিউ ইয়র্কে গ্রীষ্মের উত্তপ্ত এক রাতে ঝাড়লণ্ঠনের আংটা থেকে মোলারের ঝুলন্ত মৃত দেহটার কথা ভাবতে ভাবতেই আমি বললাম। লিপসশুৎজ্ আমাকে বলেছিলেন উনি সেদিন সবচেয়ে ভালো সুট আর পরিষ্কার কামিজটা পরেছিলেন। এমন কি গলাবন্ধের ফাঁসটাও বেঁধেছিলেন নিখুঁত হাতে, ভঙ্গিটা এমন যাতে খুব তাড়াতাড়ি শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরতে পারেন। সত্যি ভাবতেও কেমন যেন অবাক লাগে। এ যেন ট্রেনের খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছটফট করলেই ট্রেনটা দ্রুত পৌঁছে যাবে।

আমি বললাম, 'কয়েকদিন আগে কিন্তু বলেছিলে তুমি অসুখী।

তারপরেই আবার বললে কথাটা সত্যি নয়। ভাবনার এই দ্রুত পরিবর্তনের জন্যে সত্যিই তোমাকে আমার হিংসে হয়।'

'ঠাট্টা কোরো না। দু'টোর কোনোটাই সত্যি নয়।'

'ঠাট্টা করিনি, নাতাশা। কোনোদিন কাউকে ঠাট্টা করতে শিখিনি। যে যা বলে আমি তাই-ই বিশ্বাস করি। এবং সেটাই সবচাইতে সহজ।'

নাতাশা সন্দিগ্ধ চোখে তাকালো আমার মুখের দিকে। 'সত্যিই তুমি ভারি অদ্ভুত। সব সময় এমন বুড়োদের মতো কথা বলো। আচ্ছা, তুমি কি কখনও যাজক ছিলে?'

আমি হাসলাম। 'কস্মিনকালেও না।'

'মাঝে মাঝে তোমাকে কেমন যেন যাজকের মতো মনে হয়—যেমন গম্ভীর, তেমনি ভারিক্কি। কেন, সবার সঙ্গে একটু হাসি-ঠাট্টা করতে পারো না? অবশ্য জার্মানরা...'

'হ্যাঁ নাতাশা, তুমি ঠিকই বলেছো। সূক্ষ্ম রসবোধ বলতে জার্মানদের প্রায় কিছু নেই বললেই চলে। প্রাণ খুলে ওরা কারুর সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করতে জানে না। ওরা জানে কেবল মানুষের দুর্ভাগ্যে বিদ্বেষভরা আনন্দে নিজেদেরকে ভরিয়ে তুলতে।'

নাতাশা ঢেউ খেলিয়ে হাসলো। 'এবার থেকে তোমাকে আমি অধ্যাপক-মশাই বলে ডাকবো। কি, নামটা মানাবে তো?'

'হ্যাঁ, বলবে জার্মান অধ্যাপক।'

'কিন্তু রবার্ট, আমি যে নিঃস্ব, রিক্ত, অসুখী আর ভাবপ্রবণ—সেকথা কি তুমি বুঝতে পারো না?'

'পারি নাতাশা, পারি।'

নাতাশা অবাক চোখে তাকালো। 'জার্মানরা কি সত্যিই কখনও এসব কথা বুঝতে পারে?'

'নিশ্চয়ই, পারে বইকি।'

'তুমিও?'

আমি আর সে প্রশ্নের কোনো জবাব দিলাম না।

একটু নীরবতার পর নাতাশা নিজেই প্রশ্ন করলো, 'আচ্ছা, তুমিও কি অসুখী, রবার্ট ?'

'সত্যিই আমি জানি না, নাতাশা। আসলে এ পৃথিবীতে সুখ শব্দটা ভীষণ আপেক্ষিক।'

নাতাশা অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো। প্রকম্পিত আলোর রেখায় দেখলাম ওর চোখের মণিদুটো ঝিকমিক করছে।

মৃদুভাষে আমি বললাম, 'নতুন করে আমাদের জীবনে আর কিছুই ঘটবে না। আমরা হলাম রূপকথার সেই দগ্ধ শিশু, আগুনের সামান্যতম একটু আভাসেই চমকে উঠি।'

পরিচারক হিসেব নিয়ে এলো। নাতাশা বললো, 'ওদের বোধ হয় বন্ধের সময় হয়ে এসেছে।'

আমরা উঠে পড়লাম। এতক্ষণ খেয়াল করিনি, আশেপাশে তাকিয়ে দেখলাম লোকজন প্রায় নেই বললেই চলে, চিড়িয়াখানাটাও খাঁ খাঁ করছে। নাতাশাই প্রথম আমার হাতটা জড়িয়ে ধরলো। অদ্ভুত ধরণের একটা প্রতীতি অনুভব করলাম—যার নির্দিষ্ট কোনো নাম নেই, বিশেষ কোনো আকর্ষণও নেই। ধ্বংস আর সান্ত্বনার মাঝে এ এমনই এক অদ্ভুত ধরণে প্রতীতি—যার মধ্যে হঠাৎ নতুন কিছু পাবার সম্ভাবনা নেই, তেমনি আবার নতুন করে কিছু হারাবারও ভয় নেই। আগে অন্ধের মতো অতীতকে হাততে বেড়াতে হতো বলেই আমি বেশি লজ্জা পেতাম, এখন নাতাশার কাছে আমার আবেগকে গোপন রাখতে হচ্ছে বলে লজ্জা পাচ্ছি। কিন্তু সেই লজ্জা বা প্রচ্ছন্ন আবেগের সঙ্গে বিপদ বা যন্ত্রণার কোনো সম্পর্ক ছিলো না, কেননা তখনও পর্যন্ত তার নির্দিষ্ট কোনো নাম নেই।

'তোমাকে আমার ভালো লাগে, নাতাশা,' ছায়া ছায়া পথ মাড়িয়ে পঞ্চম সরণীর দিকে এগিয়ে যেতে যেতে আমার নিজের অজান্তেই কথা-কটা বলে ফেললাম। 'বিশ্বাস করো, সত্যিই তোমাকে আমার ভীষণ ভালো লাগে।'

নাতাশা চকিতে ফিরে তাকালো। 'মিথ্যেবাদী। তোমার একটা কথাও আমি বিশ্বাস করি না। তবু তুমি বলে যাও। শুনতে ভীষণ আমার ভালো লাগছে।'

এতক্ষণ আমি যে স্বপ্ন দেখছিলাম, সেটা বুঝতে বেশ খানিকক্ষণ সময় কেটে গেলো। ঘরের ভেতরের গাঢ় অন্ধকার, নিউ ইয়র্কের রক্তাভ রাত্রির অস্পষ্ট একটা আভায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠা জানলার চৌকো রেখাটার দিকে তাকিয়ে একটু একটু করে বুঝতে পারলাম আমি বিছানায় শুয়ে রয়েছি। অনেক কষ্টে নিজেকে জাগিয়ে তুললাম—যেন বিহ্বলতার গহন অতল থেকে ধীরে ধীরে নিজেকে টেনে তুললাম ঊর্মিল স্রোতে।

এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলাম আমি যেন কাকে খুন করেছি, মৃতদেহটা কবর দিয়েছি ছোট্ট নদীর ধারে পরিত্যক্ত একটা বাগানের মধ্যে। কয়েক বছর পরে মৃতদেহটাকে হঠাৎ খুঁজে পাওয়া গেছে এবং সবাই আমাকে খুঁজছে। আমি জানি না যাকে খুন করেছিলাম—সে নারী না পুরুষ, কিংবা কেন। কোনো কিছুই আমার কাছে তেমন স্পষ্ট নয়, শুধু মনে আছে জেগে ওঠার পরেও আমি অনেকক্ষণ আতঙ্কের রেশটাকে কাটিয়ে উঠতে পারিনি। এতদিন আমার স্মৃতির চারপাশে যে অবরোধ গড়ে তুলেছিলাম—অন্ধকার রাত্রি আর এই আতঙ্ক-বিহ্বল জাগরণ তাকে যেন ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে, হুড়মুড় করে ঢুকে পড়েছে আমার ঘরের মধ্যে। আমি শুনতে পাচ্ছি ওদের রক্ত হিম করে দেওয়া ক্রুদ্ধ তর্জন: "কুত্তাটাকে টেনে বার করো! ভেঙে গুঁড়িয়ে দাও শয়তানটার মাথার খুলিটা!" ওদের রিরংসু বীভৎস চোখ-মুখগুলো আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম, ওদের আমি হাজারো বার বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করলাম যে সামান্য একটু অসতর্কতার মুহূর্তে আমি যদি ওকে হত্যা না করতাম, তাহলে আমার মতো হাজার হাজার নিরপরাধ বন্দীকে ও নির্দ্বিধায় খুন করতো। ওরা কিন্তু কেউ আমার কথা শুনলো না। আমি অসহায়ের মতো আর্তনাদ করে উঠলাম। তার আগেই কপালে জমে উঠেছে গুঁড়ি গুঁড়ি

ঘামের রেখা। জেগে ওঠার পর বুঝতে পারলাম ওটা মার্জ, এগন মার্জের মুখ আর জায়গাটা ডাচ সীমান্তের খুব কাছাকাছি। আমি জানি এটাই শেষ নয়, এর পরেও বহুবার—মৃত্যুর ঠিক পূর্ব মুহূর্তে ঠেলে বেরিয়ে আসা মার্জের বিস্ফারিত চোখদুটো আমার স্বপ্নে হানা দেবে এবং হানা দিয়ে যাবে আমার মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত।

গুমোট সেই গ্রীষ্মের রাতে হাঁটুদুটো জড়িয়ে ধরে আমি বিছানায় চুপচাপ বসে রইলাম আর এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে ভাবতে লাগলাম সেইসব কথা, বিগত কয়েকটা বছরে যাকে আমি সযত্নে ভুলে যেতে চেয়েছিলাম। যতবারই মনে হলো এ জীবনে নতুন করে বাঁচাটা বোধহয় সম্ভব নয়, ততবারই নিজেকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলাম—ব্যর্থতায়, হতাশায় মোলারের মতো জীবনটাকে এভাবে শেষ করে দিলে চলবে না, দেশে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত যেভাবেই হোক জীবনটাকে আঁকড়ে রাখতে হবে। বেদনায় দুঃখে ক্রোধে রাত্রির উতল নির্জনতায় আমি অসহায়ের মতো জানলার দিকে তাকিয়ে রইলাম কখন ভোর হবে। অথচ নিশান্তিকায় পুবের আকাশে যখন ফুটে উঠলো আরক্তিম আলোর আভা, নিজেকে এমনই বিধ্বস্ত মনে হলো যেন অন্তহীন কালো তুলোর দেওয়ালে ছুরি চালাতে চালাতেই আমার সারাটা রাত কেটে গেছে।

## দশ

দেগার ছবিটা কুপারের বাড়িতে টাঙিয়ে দিয়ে আসার জন্যে সিলভারস আমাকে পাঠালেন। ওঁর স্বয়ংসম্পূর্ণ বাসাটা পার্ক এভিনিউয়ে আকাশচুম্বী একটা বাড়ির কুড়ি তলায়। আমি ভেবেছিলাম চাকর-বাকরদের কেউ হয়তো এসে দরজাটা খুলে দেবে, কিন্তু শুধু সার্ট গায়ে মিস্টার কুপার নিজেই দরজা খুলে আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন। 'আসুন, আসুন, মিস্টার, রস। কি পান করবেন. বলুন—হুইস্কি, না কফি ?'

'ধন্যবাদ। আমার শুধু এক পেয়ালা কফি হলেই চলে যাবে।'

'এই গরমে হুইস্কি ছাড়া আমার আবার অন্য কিছু ভালো লাগে না।'

সত্যিই দেখলাম পাকা টম্যাটোর মতো ওঁর মুখখানা একেবারে টকটকে লাল হয়ে উঠেছে. অথচ ওঁর ঘরে শীত-তাপনিয়ন্ত্রণের মেশিন চলছে এবং ঘরখানা খুবই ঠাণ্ডা। ভেতরে প্রবেশ করার পর মনে হলো আমি যেন প্রাচুর্যে ভরা কোনো সমাধির গর্ভগৃহে রয়েছি। অধিকাংশ আসবাবই প্রাচীন ফরাসী ঢঙের, ছোট ছোট কুর্সীগুলো ইতালীয় রীতিতে তৈরি। সাজ-সজ্জার ফিকে হলদে রঙের ভেনিসিয় টেবিলটার সত্যিই কোনো তুলনা হয় না। লাল বুটিদার মখমলে ঢাকা দেওয়ালে টাঙানো রয়েছে ফরাসী ( বাস্তবরূপধর্মী ) ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পীদের আঁকা কয়েকটা ছবি।

মোড়ক খুলে দেগার ছবিটাকে মিস্টার কুপার একটা কুর্সীর গায়ে হেলান দিয়ে রাখলেন। 'যদি কিছু মনে না করেন এ প্রসঙ্গে আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই, মিস্টার রস। অনেক ধানাই-পানাই করে মিস্টার সিলভারস আমাকে বলেছিলেন যে ছবিটা উনি স্ত্রীকে উপহার দিয়েছিলেন, ফিরে এসে স্ত্রী যদি ছবিটা দেখতে না পান, তাহলে এক তুলকালাম কাণ্ড বাঁধিয়ে বসবেন। এখন সত্যি করে বলুন তো—ওটা ওঁর চালাকি নয় তো?'

'আপনি কি সেই জন্যই ছবিটা কিনেছেন?'

'নিশ্চয়ই না। ছবিটা আমার সত্যিই খুব ভালো লেগেছিলো বলে কিনেছি। আপনি জানেন ছবিটার জন্যে মিস্টার সিলভারস কত দাম নিয়েছেন?'

'সত্যিই এ সম্পর্কে আমি কিছু জানি না।'

'ত্রিশ হাজার ডলার।'

আমি জানি উনি মিথ্যে বলেছেন এবং অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে ভেতরের কথাগুলোকে টেনে বার করার চেষ্টা করছেন। 'বলুন, টাকাটা বড্ড বেশি নয়?'

'আমার কাছে ওটা অনেক টাকা।'

'তার মানে! আপনি হলে ছবিটার জন্যে কত দিতেন?'

'একটা পয়সাও না।'

'কি বলতে চাইছেন আপনি?' কুপার ক্রুদ্ধ দৃষ্টি তাকালেন আমার দিকে।

'আমি বলতে চাইছি যে আমার অত টাকা নেই। এই মুহূর্তে আমার নিজের বলতে মাত্র পঁয়ত্রিশ ডলার আছে।'

মিস্টার কুপার অত সহজে ছেড়ে দেবার পাত্র নন। 'ধরুন আপনার যদি অনেক টাকা থাকতো তাহলে কত দিতেন?'

'যা থাকতো সব।' আমার মনে হলো এক পেয়ালা কফির তুলনায় যথেষ্ট প্রশ্নের জবাব দিয়েছি। 'আসলে কি জানেন—ছবিকে সত্যি-কারের ভালোবাসার চাইতে ভালো ব্যবসা আর কিছু নেই। আমি বাজি রেখে বলতে পারি, বিক্রি করতে চাইলে এই ছবিটাই মিস্টার সিলভারস ভালো দামে আপনার কাছ থেকে কিনে নিতে চাইবেন।'

আমার কথা শুনে কেনই জানি মিস্টার কুপার হো হো করে হেসে উঠলেন। 'বেশ, তাহলে মিস্টার সিলভারসকে বলবেন এক সপ্তা পরে আমি পঞ্চাশ শতাংশ লাভে ছবিটা বিক্রি করে দিতে রাজি আছি।'

নাচিয়ে মেয়েটাকে কোথায় টাঙানো হবে সে প্রসঙ্গে আলোচনার মাঝেই হঠাৎ মিস্টার কুপারের ফোন এলো। পাশে পড়ার ঘরে ফোনটা ধরার আগে উনি বললেন, 'আমি কাজের মেয়েটিকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। ওর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে দেখুন, নিশ্চয়ই কোনো একটা উপযুক্ত জায়গা খুঁজে বার করতে পারবেন।'

কুপার বেরিয়ে যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কাজের মেয়েটি যে কোথা দিয়ে এসে হাজির হলো আমি খেয়ালই করিনি। ও-ই আমাকে প্রথমে শোবার ঘরে নিয়ে গেলো। অন্যান্য ঘরের মতো এখানেও প্রাচুর্যের কোনো অভাব নেই। ঘরের ঠিক মাঝখানে আশ্চর্য রুচিসম্মত চওড়া একটা শয্যা। মনে মনে অবাক হয়ে ভাবলাম—কুপার হয় নিজে শিল্পী, নয়তো ওঁর কোনো শিল্প-উপদেষ্টা আছে। আবার বলা যায় না, হয়তো

এক সঙ্গে দুটোই সত্যি হতে পারে।

শোবার ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই সবার আগে যা দৃষ্টি আকর্ষণ করলো—সোনালী ফ্রেমে বাঁধানো একটা বিরাট অরণ্যের দৃশ্যাবলী। ঝরনার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা হরিণ আর কয়েকটা হরিণী। স্তব্ধ বিস্ময়ে আমি ছবিটার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

'ছবিটা কি মিস্টার কুপারের আঁকা?'

পরিচারিকা লজ্জা পেলো। 'আমি ঠিক জানি না। এখানে আসার দিন থেকেই দেখছি এখানে রয়েছে। ছবিটা খুব সুন্দর, তাই না?'

'নিশ্চয়ই। একটু চুপ করে থাকলে মনে হবে হরিণটার নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যাবে। আচ্ছা, মিস্টার কুপার কি আগে শিকার করতেন?'

'তাও ঠিক জানি না।'

'আমার মনে হয় এ ঘরে অন্য কোনো ছবি না টাঙানোই ভালো। এটা ছাড়া ওপরের তলায় আর কোনো ঘর নেই?'

'হ্যাঁ, শুধু ছোট একটা বসার ঘর আছে। আসুন, দেখিয়ে দিচ্ছি।'

পরিচারিকার সঙ্গে সিঁড়ির চাতালে এসে দাঁড়াতেই নিচের শহরটার দিকে তাকিয়ে আমি অবাক হয়ে গেলাম। গগনচুম্বী কোনো বাড়ির একুশ-তলা থেকে রৌদ্রদগ্ধ নিউ ইয়র্কের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হলো এই ইস্পাত-নগরীটা কয়েক শতাব্দী ধরে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠেনি। গড়ে উঠেছে প্রায় রাতারাতি, দৃঢ়চেতা কিছু মানুষের অসম দক্ষতায়। এই প্রথম আমার মনে হলো—আমেরিকানদের সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে তন্ময় ধ্রুপদী ধারার যতটা না সম্পর্ক রয়েছে, তার চাইতে অনেক বেশি রয়েছে নতুন ধরনের এক দুঃসাহসী প্রয়াস।

বসার ঘরটা ছোট হলেও বেশ সুন্দর, ছিমছাম সাজানো। রোদ ঝলমলে হালকা নীল রঙের দেওয়ালগুলো আশ্চর্য উজ্জ্বল। টেবিলের ওপর চীনা ব্রোঞ্জের তিনটে নাচিয়ে মূর্তি। এক নজরেই বুঝতে পারলাম ওগুলো তাঙ যুগের ব্রোঞ্জ। মনে মনে ঠিক করলাম এই মূর্তিগুলোর ওপরের দেওয়ালটাতেই ছবিটা টাঙাবো।

এতক্ষণ পড়ার ঘর থেকেই মিস্টার কুপারের গলা শুনতে পাচ্ছিলাম, এবার উনি নিজেই হাঁফাতে হাঁফাতে ওপরে উঠে এলেন। 'কি, জায়গা খুঁজে পেয়েছেন?'

'হ্যাঁ।' ছবিটাকে নির্দিষ্ট উচ্চতায় তুলে ধরে বললাম, 'আমার মনে হয় এখানেই সব চাইতে ভালো মানাবে।'

'ঠিক আছে, তাহলে ওখানেই টাঙিয়ে দিন। কিন্তু দেখবেন দেওয়ালে যেন খুব বড় গর্ত করবেন না।'

'না না, সরু একটা পেরেক পোঁতার জন্যে যতটুকু প্রয়োজন, তার চাইতে একটুও বড় গর্ত করবো না।'

ছবিটা টাঙাতে আমার বেশি সময় লাগলো না। ফিরে আসার সময় চীনা ব্রোঞ্জের মূর্তিগুলোর দিকে আমাকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে দেখে কুপার জিগেস করলেন, 'ব্রোঞ্জ সম্পর্কে আপনার কোনো ধারণা আছে?'

'সামান্য।'

'মূর্তিগুলো কেমন?'

'সত্যিই তুলনাবিহীন।'

'এগুলোর এখন কত দাম হবে?'

'এগুলোর দামের অতীত।'

'তার মানে! আপনি কি বলতে চান—ছবির চাইতে ব্রোঞ্জের পেছনে বিনিয়োগ করা অনেক বেশি বুদ্ধিমানের কাজ?'

'না।' মনে মনে সতর্ক হয়ে উঠেই আমি সন্তর্পনে জবাব দিলাম। 'তবে মূর্তিগুলো সত্যিই দুর্লভ।'

'আপনি ঠিক বলছেন?'

'নিশ্চয়ই।'

'আপনি কি আর এক পেয়ালা কফি খাবেন?'

'না, ধন্যবাদ।'

ফিরে এসে সিলভারসকে খবর দিলাম। সব শুনে সিলভারস তো একেবারে ক্ষেপে আগুন। 'ওই লোকটা বরাবরই ওই রকম—একেবারে হাড় বজ্জাত! আমি যখনই যাকে ওর ওখানে পাঠাই, সব সময়েই আমার হাঁড়ির খবর টেনে বার করার চেষ্টা করে। অথচ তুমি শুনলে অবাক হয়ে যাবে—প্রথম জীবনে লোকটা ঠেলাগাড়ি বোঝাই পুরনো লোহা-লক্কর কেনা-বেচা করতো। কয়েক বছর যেতে না যেতেই ট্রেনে মালপত্তর পাঠাতো। তারপর যুদ্ধের সময় জাপানীদের কাছে যুদ্ধোপকরণ আর পুরনো লোহা-লক্কর বেচেই রাতারাতি বড়লোক হয়ে গেলো। যে টাকা দিয়ে ও আজ দেগার ছবিটা কিনলো, তাতে কত মানুষের রক্ত আর চোখের জল মিশে আছে তুমি জানো?'

আমি কোনোদিন সিলভারসকে সত্যিই এমন রাগতে দেখিনি। আমি বললাম, 'তাই যদি হয়, মিস্টার কুপারকে ছবিটা বিক্রি করতে গেলেন কেন?'

'যেহেতু বিক্রি করাটা আমার পেশা। আগে মনে হয়নি, তাই প্রকৃত দামের ওপর মাত্র পাঁচ হাজার ডলার বেশি ধরেছিলাম—নইলে আমার আরও পাঁচ হাজার ডলার বেশি ধরা উচিত ছিলো।'

'আমার মনে হয় সে সুযোগ আপনি খুব শিগগিরই পাবেন।'

'তার মানে!'

'আমি নিজে ওঁকে বলেছি আপনার কাছে এর চাইতেও মূল্যবান একটা দেগার ছবি আছে, যেটা এর সঙ্গে সত্যিই খুব ভালো মানাবে। আমার মনে হয় কয়েক দিনের মধ্যে উনি আপনার সঙ্গে দেখা করবেন।'

'বাঃ, তোমার তো দারুন উন্নতি হচ্ছে! সত্যিই যদি কুপার মাস-খানের মধ্যে দেগার দ্বিতীয় ছবিটার জন্যে আসে, আমি তোমাকে বাড়তি একশো ডলার দেবো।'

**প্লাজা থেকে বেরিয়ে নাতাশাকে উনষাটতম সরণী অতিক্রম করে যেতে**

দেখলাম। ভাবনার অতলে ও এমন তলিয়ে রয়েছে যে আমাকে দেখতেই পায়নি।

আমি দ্রুত এগিয়ে গিয়ে পেছন থেকে ডাকলাম। 'এই নাতাশা, কি এতো ভাবছো শুনি ?'

নাতাশা চকিতে ফিরে তাকালো। 'দুপুরে তোমায় কোথায় খেতে নিয়ে যাবো সেই কথাই ভাবছিলাম।'

'খুব দুষ্টুমি হচ্ছে, না ?'

'মোটেই না, বিশ্বাস করো···আজ দুপুরে একজনের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দেবো বলে আমি কথা দিয়েছি।'

'কে ?'

'আমার পরিচিত একজন বৃদ্ধা। উনি কয়েকটা ছবি কিনতে চান। আমি তোমার কথা ওঁকে বলেছি।'

'কিন্তু নাতাশা, তুমি তো জান আমি ছবি বিক্রি করি না।'

'জানি, কিন্তু মিস্টার সিলভারস করেন। তুমি যদি ওঁর হয়ে কোনো খদ্দের নিয়ে আসো, উনি তোমাকে দালালির অংশ দেবেন।'

'সেটা আবার কি জিনিস ?' আমি অবাক হয়েই প্রশ্ন করলাম।

'কেউ যদি কারুর হয়ে কোনো খদ্দের নিয়ে আসে, লাভের একটা অংশ সে পায়। এটা এখানকার রীতি। নিউ ইয়র্কের প্রায় অর্ধেক লোক বলতে গেলে একরকম দালালির ওপরেই জীবিকা নির্বাহ করে।'

'সত্যিই এ কথা জানতাম না।'

'বেশ, এখন জানলে তো ? চলো, আমার কিন্তু ভীষণ খিদে পেয়ে গেছে।'

বড় বড় পা ফেলে নাতাশা দ্রুত এগিয়ে চললো। আমি বললাম, 'তোমাকে কিন্তু সত্যিই ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে।'

'ওমা, তাই নাকি !'

'আমি যদি সত্যিই দালালির কোনো অংশ পাই, তোমাকে শ্যাম্পেন আর ক্যাভিয়ার খাওয়াবো।'

'শাবাশ, এই তো চাই!'

রেস্তোরাঁয় অসম্ভব ভিড়। নিজেকে আমার মনে হলো খাঁচায় বন্দী একঝাঁক প্রজাপতি কিংবা পাখির মতো। পরিবেশন করতে করতে বেচারি পরিচারকরা হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। যথারীতি এখানেও দেখলাম সবাই নাতাশার পরিচিত।

আমি বললাম, 'কি আশ্চর্য, তুমি কি নিউ ইয়র্কের অর্ধেক লোককেই চেনো নাকি?'

'বোকার মতো বোলো না। পোশাক এবং সাজগোজ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনের সঙ্গে জড়িত মাত্র অল্প কয়েকজনকেই আমি চিনি।' একটা সিগারেট ধরিয়ে নাতাশা অপাঙ্গে আমার মুখের দিকে তাকালো। 'বরং সেদিক থেকে বলতে গেলে—আমার চাইতে তোমার পরিচিতের সংখ্যা অনেক বেশি। ওই যে, ভদ্রমহিলা আসছেন।'

আমি আশা করেছিলাম কুপারেরই মতো দেখতে গোলগাল কোনো স্থূলাঙ্গী মহিলা হবেন। কিন্তু তার পরিবর্তে দেখলাম ছোটখাটো শীর্ণ চেহারার এক বৃদ্ধা—লালচে চিবুক, ধবধবে সাদা একরাশ কোঁকড়ানো চুল। যদিও বয়েস সত্তরের কাছাকাছি, তবু দেখলে মনে হবে পঞ্চাশের বেশি নয়। গায়ের চামড়া পাতলা কাগজের মতো খসখসে, কিন্তু কোথাও কোনো ভাঁজ পড়েনি। কেবল শীর্ণ ভঙ্গুর হাতদুটো দেখলেই বোঝা যায় ওঁর বয়েস হয়েছে। গলায় মুক্তোর কণ্ঠীহার।

নাতাশা আমাকে শ্রীমতী হোয়াইম্পারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলো। উনি আমাকে পারি সম্পর্কে নানান প্রশ্ন করলেন, যেন অতীত স্মৃতিতে পারির সঙ্গে ওঁর কোথায় একটা অদৃশ্য বন্ধন রয়েছে। আমিও এমন সন্তর্পণে জবাব দিলাম যেন ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধের কোনো সম্পর্ক নেই এবং সেখানে আমি যে ধরণের জীবনযাপন করেছি, তার সম্পর্কে উনি কোনো আভাস না পান। নাতাশার চোখে চোখ রেখে আমি একের পর এক সেইন, এল সাঁ-লুই, কোয়ে দ্য গ্রাঁদস্ আগুস্তিন, লুক্সেমবার্গে গ্রীষ্মের বিকেল, সাঁজেলিজে সন্ধ্যে আর বয়ার কথা বলে চললাম। ভদ্রমহিলা

হয়ে শুনতে শুনতে নাতাশারই মুখটা কেমন যেন করুণ হয়ে উঠলো।

অসম্ভব ব্যস্ততার মধ্যেই নিপুণ হাতে খাবার পরিবেশন করা হলো এবং আধ ঘণ্টার মধ্যেই শ্রীমতী হোয়াইম্পার উঠে পড়লেন। 'আশা করি আপনি একদিন আমাকে মিস্টার সিলভারসের সংগ্রহ দেখাতে নিয়ে যাবেন। আচ্ছা, কাল বিকেল পাঁচটা নাগাদ কি আপনার সময় হবে আমাকে বাড়ি থেকে নিয়ে যাওয়ার?'

'নিশ্চয়, খুব খুশি হয়েই···' কথাটা শেষ করতে পারলাম না, টেবিলের নিচে নাতাশার পায়ের গোঁতা খেয়ে চুপ করে গেলাম।

'আশা করি তোমার খুব একটা লাগেনি,' ভদ্রমহিলা চলে যাবার পর নাতাশা হাসতে হাসতে বললো।' "নিশ্চয়" বলার পর—আমি ওখানে দরজা-জানলা খুলি, ঝাড়মোছ করি, এসব বলার কোনো দরকার নেই। তুমি জানো না, এখানে বহু লোক ধনী বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের সাহায্য করে অনেক পয়সা রোজগার করে। এখানে কত লোক শুধু উপদেশ দিয়ে পয়সা রোজগার করে সে খবর তুমি রাখো?'

'সত্যিই আমি জানি না, নাতাশা।'

'বেশ, তাহলে আমার কাছ থেকে শুনে রাখো।'

'কিন্তু মুশকিল কি হয়েছে জানো,' নিজেকে জাহির করার জন্যেই দার্শনিকের ভঙ্গিতে নাতাশাকে বললাম, 'আমি যদি ওঁকে একটু বুঝিয়ে না বলি, তাহলে হয়তো কোথাও ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ থাকতে পারে। কেননা উনি তো আর আমাকে জন্ম থেকেই চেনেন না।'

'কেউ কাউকেই জন্ম থেকে চেনে না, চেনার কোনো দরকারও নেই। তুমি যে ওঁকে পারির কথা, সেইন আর বয়ার কথা বলেছো, তাতেই উনি তোমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে বসে আছেন।'

'কিন্তু সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, ছবির সম্পর্কে কিন্তু একটা কথাও হয়নি।'

'হ্যাঁ, ওটাই তোমার সবচাইতে বুদ্ধিমানের কাজ হয়েছে।'

সেই মুহূর্তে আমি নাতাশাকে মনে মনে শ্রদ্ধা না করে পারলাম না।

পঞ্চাশতম সরণী ধরে আমরা এগিয়ে চললাম। নিজেকে আমার কেমন যেন হালকা আর সুখী মনে হতে লাগলো। কম্বল বোঝাই একটা ট্রাক আমাদের দ্রুত অতিক্রম করে গেলো। কলহাস্যে মুখর হয়ে উঠেছে রাস্তাটা আর আমার রাত্রির সেই দুঃস্বপ্নটাকে মনে হচ্ছে যেন ফেলে এসেছি অনেক দূরে।

আমি জিগেস করলাম, 'আজ রাত্তিরে কি তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে?'

নাতাশা ছোট্ট করে মাথা নেড়ে সায় দিলো।

'হোটেলে?'

'হ্যাঁ।'

ঘড়িতে যখন ঠিক কাঁটায় কাঁটায় পাঁচটা, আমি শ্রীমতী হোয়াইস্পারের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছলাম। উনি থাকেন পার্কের ওপারে পঞ্চম সরণীতে। ঘরে রমনি আর রুইসদেল ছাড়া অন্য কারুর আঁকা ছবি চোখে পড়লো না।

'আপনার কি এ সময়ে মার্টিনি চলবে?' মিসেস হোয়াইস্পার জিগেস করলেন।

দেখলাম সামনেই টেবিলের ওপর ওঁর গেলাসটা রয়েছে। রঙ দেখে মনে হলো ভদকা। কৌতূহলী হয়েই আমি প্রশ্ন করলাম, 'এটা কি ভদকা মার্টিনি?'

'ভদকা মার্টিনি! সেটা আবার কি জিনিস? এটা জিনের সঙ্গে ভারমুথ মেশানো।'

সদ্য শেখা অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাবার জন্যে আমি বললাম, 'জিনের পরিবর্তে ভদকা ব্যবহার করতে পারেন।'

'সে রকম হয় নাকি? তাহলে তো একবার খেয়ে দেখতে হয়।' পরিচারকের জন্যে উনি ঘন্টি বাজালেন। 'জন, আমাদের ভাঁড়ারে কি ভদকা আছে?'

'আছে, ম্যাডাম।'

'তাহলে মিস্টার রসের জন্যে একটা মার্টিনি নিয়ে এসো, কিন্তু জিনের বদলে ভদকা দেবে।' আমার দিকে ফিরে প্রশ্ন করলেন, 'কি ভারমুথ দেবে—ইতালীয় না ফরাসী।'

'আমার ধারণা ফরাসী ভারমুথ হলে আরও ভালো হবে। কিন্তু আমি আপনাকে কোনো অসুবিধের মধ্যে ফেললাম না তো? নইলে জিনেতেও আমার কোনো অসুবিধে হতো না।'

'না না, আমার কোথাও কোনো অসুবিধে হবে না। আমরা সব সময়েই নতুন কিছু শেখার প্রতি আগ্রহী। জন, আমার জন্যেও একটা কোরো।'

আমি স্পষ্টই বুঝতে পারলাম আমাদের নিরীহ বৃদ্ধাটি একটু বেশিই পানাসক্ত। তবে এইটুকু সান্ত্বনা, যেহেতু আমাদের এখন সিলভারসের ওখানে যেতে হবে, আপাতত উনি খুব একটা মাত্রা ছাড়িয়ে যাবেন না।

জন আমাদের দুজনের জন্যে মার্টিনি নিয়ে এলো। শ্রীমতী হোয়াইস্পার এক ঢোকেই অর্ধেকটা খালি করে ফেললেন। 'সত্যিই ভারি চমৎকার। জন, তুমি জিনিসটা শিখে নিয়েছো তো?'

'হ্যাঁ, ম্যাডাম।'

'দেখো যেন সব সময়েই এই জিনিসটা আমাদের ভাঁড়ারে থাকে।'

'আচ্ছা, ম্যাডাম।'

'আপনি কার কাছ থেকে শিখেছেন জানি না,' শ্রীমতী হোয়াইস্পার পাখির মতো শীর্ণ ঘাড় ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকালেন। 'তবে জিনিসটা সত্যিই খুব ভালো লাগলো।'

'এটার সবচেয়ে বড় সুবিধে, কখনও ভদকার গন্ধ পাওয়া যায় না।'

গেলাসের বাকি পানীয়টুকু গলায় ঢেলে দিয়ে শ্রীমতী হোয়াইস্পার মুখ মুছলেন। 'জন, ড্রাইভারকে বলো গাড়িটা বার করতে। আমরা একটু মিস্টার সিলভারসের কাছে যাবো।'

'আচ্ছা, ম্যাডাম।'

চালকের পরিবর্তে জনই আমাদের জন্যে ক্যাডিলাকের দরজা খুলে এক-পাশে সরে দাঁড়ালো। মনে মনে ভাবলাম এত অল্প সময়ের ব্যবধানে গাড়ির ব্যাপারে আমার কপালটা মন্দ যাচ্ছে না—প্রথমে রোলস-রয়েস, এখন ক্যাডিলাক, তাও আবার চালক সমেত। রোলস-রয়েসের মতো এখানেও দেখলাম পানের সমস্ত ব্যবস্থা রয়েছে। আশা করছিলাম শ্রীমতী হোয়াইস্পার হয়তো আবার নতুন করে এক প্রস্থ পানের জন্যে আহ্বান জানাবেন, কিন্তু জানালেন না। তার পরিবর্তে উনি ফ্রান্স, বিশেষ করে পারি সম্পর্কে একের পর এক নানান প্রশ্ন করে গেলেন, আর আমিও কিছুটা ওঁকে খুশি করার জন্যে, কিছুটা পরবর্তী কালে আমার নিজেরই সুবিধের জন্যে যতটা সম্ভব সংক্ষেপে জবাব দিয়ে গেলাম।

নিজের প্রভাব এবং কৃতিত্ব জাহির করার জন্যে প্রথমে ভেবেছিলাম সিলভারস হয়তো আমাকে কোনো ছুতোয় ঘর থেকে বার করে দেবেন কিন্তু যেহেতু শ্রীমতী হোয়াইস্পার প্রায় সারাক্ষণই আমাকে উদ্দেশ্য করে মন্তব্য করছিলেন এবং ফরাসী শব্দ ব্যবহার করছিলেন, সম্ভবত সেই জন্যে সিলভারস আমাকে অন্য ঘরে পাঠাবার ঠিক সুযোগ করে উঠতে পারেন নি। তাছাড়া ভাল বুঝে আমি জিগেস করলাম আর একটা ভদকা মার্টিনি চলবে কিনা। শ্রীমতী হোয়াইস্পার শুধু পাখির মতো ঘাড় ঘুরিয়ে আমার দিকে হাসি হাসি মুখে তাকালেন, কিন্তু সিলভারসের চোখে দেখলাম ভর্ৎসনার ছায়া। স্কচ ছাড়া অন্য কিছু পরিবেশন করাটাকে উনি বর্বরতারই নামান্তর বলে মনে করেন। আমি তখন ওঁকে বুঝিয়ে বললাম যে স্বাস্থ্যের কারণেই ডাক্তার ওঁকে স্কচ খেতে বারণ করেছেন এবং রান্নাঘরে এসে পাচকের সাহায্যে এক বোতল ভদকা খুঁজে বার করলাম। তারপর নিজে হাতে মিশিয়ে ছুটো ভদকা মার্টিনি আর সিলভারসের জন্যে একটা স্কচ পাঠিয়ে দিলাম। আমি নিজে ইচ্ছে করে ফিরে এলাম পাশের ছোট ঘরটায়। খোলা জানলার সামনে দাঁড়াতে

কানে এলো পারাবতের ছন্দময় অথচ মুখর কলগুঞ্জন। ভেনিসের মতো নিউ ইয়র্কেও পায়রার সমারোহ খুব একটা কম নয়। আগে থেকে বেছে রাখা রেনোয়ার ছবিগুলোকে নির্দিষ্ট জায়গায় থাকতে না দেখে বুঝতে পারলাম সিলভারস নিজে এসে শ্রীমতী হোয়াইম্পারকে দেখাবার জন্যে নিয়ে গেছেন, সাধারণত উনি যা কখনও করেন না। কেননা উনি সব সময়েই ক্রেতাদের দেখাবার চেষ্টা করেন যে ওঁর একজন যোগ্য সহকারী আছে।

মিনিট কয়েক পরে সিলভারস হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকলেন। 'আরে তুমি এখানে? আর তোমার গেলাস পড়ে রয়েছে ওখানে···চলো, চলো।'

শ্রীমতী হোয়াইম্পার ইতিমধ্যেই ওঁর গেলাসটা শেষ করে ফেলেছেন। বয়েস হলে কি হবে, উনি একেবারে পাশার ঘুঁটির মতো শক্ত হয়ে বসে রয়েছেন। আমাকে দেখেই পুতুলের মতো কুতকুতে চোখ নাচিয়ে হাসলেন। 'কি ব্যাপার, এই বুড়ো মানুষটা, না মার্টিনি, কার ভয়ে পালিয়ে ছিলে শুনি? দ্যাখো তো রেনোয়ার এই ছবিটা তোমার কেমন লাগে?'

ওটা ১৮৮০ সালে আঁকা একটা স্থিরচিত্র। আমি বললাম, 'ছবিটা সত্যিই খুব সুন্দর। একবার বিক্রি হয়ে গেলে অতদিন আগেকার এত ভালো ছবি আমরা আর একটাও খুঁজে পাবো না'

শ্রীমতী হোয়াইম্পার ঠোঁট টিপে মুচকি মুচকি হাসলেন। 'মিস্টার সিলভারস বলছিলেন তুমি নাকি খুব ভালো ছবি টাঙাতে পারো। আমার জন্যে কষ্ট করে কাল ছবিটা একটু টাঙিয়ে দিয়ে এসো।'

বৃদ্ধাকে আমি গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিলাম। অত বড় একটা ভদকা মার্টিনি ওঁর ওপর আদৌ কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পেরেছে বলে মনে হলো না। যদিও তখন বেশ গরম রয়েছে, তবু সায়াহ্নের ঝিরঝিরে মিষ্টি একটা বাতাস বয়ে আসছে পার্কের ওপর থেকে শোনা যাচ্ছে পাতার মৃদু মর্মর।

ফিরে আসতে না আসতেই সিলভারস বিরক্তির স্বরে একেবারে ফেটে পড়লেন, 'তুমি আগে বলোনি কেন? মিসেস হোয়াইস্পারকে তো আমি খুব ভালো করেই চিনি।'

'আমি কিন্তু আপনাকে বলেছিলাম।'

'হ্যাঁ, বলেছিলে। কিন্তু এই নিউ ইয়র্ক শহরে কত হোয়াইস্পারই তো রয়েছে। তুমি কিন্তু বলোনি যে উনি মিসেস আন্দ্রে হোমাইস্পার। ওঁর সঙ্গে আমার পরিচয় দীর্ঘ দিনের। যাই হোক, তাতে অবশ্য কিছু এসে যায় না।'

'নিশ্চয়ই,' ভেতরের চাপা বিরক্তিটাকে প্রকাশ না করেই আমি বললাম, 'আর কিছু না হোক একটা ছবি তো বিক্রি হলো।'

সিলভারস হাত দিয়ে এমন একটা ভঙ্গি করলেন যেন মাছি তাড়াচ্ছেন। 'জোর করে কিছুই বলা যায় না। এই রকম ঘ্যানঘ্যানে বুড়িগুলোকে আমি একদম পছন্দ করি না। কেনার নাম করে ছবিটা নিয়ে গিয়ে—ফ্রেমের রঙ চটিয়ে, ভেতরে নোংরা হাতের দাগ লাগিয়ে শেষে ছবিটা ফিরিয়ে দেয়। তুমি যতটা ভাবো, ছবির ব্যবসা তত সহজ নয়। ঠিক আছে, তবু উনি যখন ছবিটা পছন্দ করে গেলেন, ওটাকে এখন আলাদা করে সরিয়ে রাখো। কাল বিকেলে গিয়ে টাঙিয়ে দিয়ে এসো। আমি এখন একটু বেরুচ্ছি।'

উনি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার পরেও আমি কয়েক মুহূর্তের জন্যে স্থবিরের মতো চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। শয়তান আর কাকে বলে! লাভের অংশ দিতে হবার ভয়ে এখন বলছেন আমি মিসেস হোয়াইস্পারকে দীর্ঘ দিন ধরে চিনি। ঠিক আছে, আমার প্রাপ্য দালালি না পেলে আমিও একদিন ঠিক এর শোধ তুলবো! রেনোয়ার অন্য তিনটে ছবি নিয়ে গিয়ে তাকে গুছিয়ে রাখলাম, শ্রীমতী হোয়াইস্পারের ছবিটাকে বাঁধানোর জন্যে রেখে দিলাম আলাদা করে। তারপর দরজা-জানলা বন্ধ করে তালা লাগিয়ে চাবি নিয়ে গেলাম মিসেস সিলভারসের কাছে।

উনি জিগেস করলেন, 'দর-দাম সব মিটে গেছে?'

'এই, সত্যিই তুমি কিছু মনে করোনি তো?'

ঘুরে আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নাতাশা অবাক চোখে তাকালো, তারপর ফিসফিসিয়ে বললো, 'তখন না করলে তোমাকে আমি খুনই করে ফেলতাম।'

তোয়ালেটা বুক থেকে সরিয়ে দিতেই ওটা মেঝেতে খসে পড়লো।

'তোমার মতো এত লম্বা আর সুন্দর স্বাস্থ্যের মেয়ে আমি সত্যিই খুব কম দেখেছি!'

দুহাতের স্তব্ধ করপুটে ওর মুখখানাকে পরিপূর্ণ আলোয় একটু তুলে ধরে আমি চুমু দিলাম। নাতাশা আমার হাতদুটোকে সরিয়ে এনে রাখলো ওর বুকের ওপর। হাত বাড়িয়ে আমি আলোটা নিভিয়ে দিলাম, তারপর দুজনে জড়াজড়ি করে এগিয়ে গেলাম বিছানার দিকে। অন্ধকারে আমি কিছুই দেখতে পেলাম না, কেবল ছুঁইয়ে ছুঁইয়ে উপভোগ করতে লাগলাম মেয়েলী গন্ধে ভরা ওর শরীরের স্নিগ্ধ মাধুরিমা।

এক সময়ে অনুভব করলাম আমরা দুজনেই অন্ধকার ঢেউয়ের মাথায় দুলছি। ভরা-জোয়ারের স্রোতে প্রচণ্ড গর্জনে আছড়ে পড়ার পরেও আমরা অনেকক্ষণ চুপচাপ শুয়ে রইলাম এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসগুলোকে পরস্পরে আলাদা করে চিনতে পারছি, ততক্ষণ কেউ কিছুই ভাবলাম না। অবশেষে নাতাশাই প্রথম নীরবতা ভেঙে জিগেস করলো, 'এই, তোমার সিগারেট আছে?'

'হ্যাঁ।'

দেশলাইয়ের কাঠির প্রজ্বলিত আভায় দেখলাম ওর মুখখানা কি শান্ত আর নিষ্পাপ। কাঠিটা জ্বলতে জ্বলতে আঙুলের একেবারে শেষ প্রান্তে এসে না পৌঁছনো পর্যন্ত আমি ওটাকে ধরে রইলাম, তারপর পোড়া কাঠিটাকে খাটের নিচে চালান করে দিয়ে বললাম, 'তুমি কিছু পান করবে?'

অন্ধকারে জ্বলন্ত সিগারেটের নড়াচড়ার সংকেতে বুঝলাম—না।

'ভদকাও না?'

'না। আসলে আমার ভীষণ খিদে পেয়ে গেছে।'

'তাহলে জামা-কাপড় পরে নাও। চলো, আজ আমরা 'দি কিং অফ সী'-তে যাবো।'

'তুমি তো এখনও মিসেস হোয়াইম্পারের ছবি বিক্রির টাকাটা পাওনি?'

'না।'

'তাহলে?'

'কোনো অসুবিধে হবে না, আমার কাছে এখনও কিছু টাকা আছে।'

'তাহলে আমরা 'দি কিং অফ সী'-তেই যাবো।'

নাতাশা বিছানা থেকে লাফিয়ে নামতেই আমি আলোটা জ্বেলে দিলাম। তোয়ালেটা মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিয়ে ও ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো। পেছন থেকে আমি চেঁচিয়ে বললাম, 'তিনটে দরজা পরে।'

নাতাশা খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো। 'এবার আর ভুল হবে না।'

## এগারো

'শোনো রস, আমি তোমাকেই খুঁজছিলাম,' সিগারেটটা ছাইদানীর মধ্যে গুঁজে দিয়ে সিলভারস ঘড়ি দেখলেন। 'মিনিট পনেরোর মধ্যেই মিস্টার আর মিসেস ল্যাস্কি এসে পড়বেন। আমি বললে তুমি প্রথমে যেকোনো দুটো ছবি নিয়ে আসবে। আমি তখন তোমাকে সিসিলির ছবিটা আনার কথা বলবো। তুমি ছবিটা এনে দেওয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে রেখে আমার কানে কানে কিছু বলবে। আমি তোমার কথা বুঝতে পারবো না, কিছুটা রেগে গিয়েই আরও স্পষ্ট করে বলার কথা বলবো। তুমি তখন শোনা যায় এমন ভাবে ফিসফিসিয়ে বলবে যে সিসিলির ছবিটা মিস্টার রকফেলার কিংবা ওই রকম কেউ একজন সংরক্ষিত করে গেছেন। তুমি আমার পরিকল্পনাটা বুঝতে পারছো?'

'হ্যাঁ।'

মহড়া মাফিক সমস্ত পরিকল্পনাটা অত্যন্ত সুষ্ঠু ভাবেই সম্পন্ন হলো। আমার ওপর রীতিমতো চটে উঠে সিলভার বললেন, 'আমার কানের কাছে এত ফিসফিস করে বলার কি আছে? আমি তোমাকে সিসিলির ছবিটা নিয়ে আসার কথা বলছি, নিয়ে আসবে।'

একটু সোজা হয়ে বিনীত ভাবে হাত কচলাতে কচলাতে বললাম, 'আপনি বোধহয় একটু ভুল করছেন, মিস্টার সিলভারস ; ছবিটা সংরক্ষিত করা হয়ে গ্যাছে।'

'কই, আমার তো মনে পড়ছে না!'

'আমার লেখা আছে, এই দেখুন,' ছোট পকেটবইটা বার করে আমি ওঁকে দেখালাম। 'মিস্টার রকফেলার এটাকে সংরক্ষিত করে গেছেন।'

'তাই তো! আমার একদম মনেই ছিলো না,' অসহায়ের মতো সিলভারস কুর্সিতে গা এলিয়ে দিলেন। 'তাহলে অবশ্য এখন আর কিছুই করার নেই। ঠিক আছে, তুমি এটা নিয়ে যাও।'

ছবিটা আমার হাতে ধরাই ছিলো, দরজার দিকে এগিয়ে যেতেই মিসেস ল্যাস্কি বললেন, 'আচ্ছা, ছবিটা একটু দেখা যায় না?'

মিস্টার ল্যাস্কি ভঙ্গুর ধরণের মানুষ, পরণে নাল সুট, পায়ে বাদামী রঙের জুতো। ঝকঝকে টাকের ওপর অল্প কয়েকটা চুল অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে আঁচড়ানো। মিসেস ল্যাস্কি চেহারায় স্বামীর ঠিক বিপরীত। লম্বায় স্বামীর চাইতে হাতখানেক উঁচু, পরিধিতে প্রায় দ্বিগুণ। আমার মনে হলো উনি ইচ্ছে করলে যেকোন সময় স্বামীর দম অনায়াসেই বন্ধ করে দিতে পারেন।

'নিশ্চয়ই, ম্যাডাম,' মিসেস ল্যাস্কির শেষ প্রশ্নে সিলভারস চকিতে সোজা হয়ে বসলেন। 'রস, তুমি একটু কষ্ট করে ছবিটা এজেলে টাঙিয়ে দিয়ে যাও।'

ছবিটা ইজেলে টাঙিয়ে দিয়ে আমি ছবি রাখার ছোট ঘরটায় ফিরে এলাম। এই ঘরটায় আমি যখন চুপচাপ একা বসে থাকি, বরাবর আমার কেনই জানি ব্রুসেলস যাদুঘরের কথা মনে পড়ে যায়। পাশের ঘর থেকে

ভেসে আসছে টুকরো টুকরো কথা। সামনের তাক থেকে ছোট একটা ছবি পেড়ে নিয়ে আমি দীর্ঘক্ষণ ছবিটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। মানের আঁকা একখানা স্থির চিত্র—জলের গেলাসে শুধু ছোট্ট একটা পিওনী। পিওনীর পাপড়িতে টলমল করছে একবিন্দু শিশির। ভোরের প্রথম আলোয় শিশিরবিন্দুটাকে এমন স্বচ্ছ আর জীবন্ত মনে হচ্ছে যে আমি আমার অস্তিত্বের কথাই ভুলে গেলাম। হঠাৎ পেছনে পায়ের শব্দ শুনে চমক ভাঙলো।

'কি, একটা চুরুট চলবে নাকি?'

সন্দিগ্ধ চোখে আমি সিলভারসের মুখের দিকে তাকালাম। ওঁর ঠোঁট চেপে হাসার ভঙ্গি দেখে স্পষ্টই বুঝতে পারলাম শিকারকে বঁড়শিতে গাঁথা হয়ে গেছে। তবু ঘাড় নেড়ে প্রত্যাখ্যান করলাম, কেননা আমি যা চাই—চুরুট নয়, মিসেস হোয়াইস্পারের কাছ থেকে পাওয়া টাকার অংশ, যেহেতু চেকটা গতকালই আমি নিজে ওঁর হাতে তুলে দিয়েছি।'

'ওঁরা কি চলে গেছেন?'

'হ্যাঁ। আমি বললাম মিস্টার রকফেলার অনেকদিন আগে ছবিটা সংরক্ষণ করেছিলেন, কিন্তু বর্তমানে তিনি ব্যবসায়িক কাজে শহরের বাইরে রয়েছেন, হয়তো ছবিটার কথা ভুলেও গেছেন। মিসেস ল্যাস্কির তখন মনে হলো যে যেভাবেই হোক ছবিটা ওঁর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে হবে।'

'কিন্তু একটা' জিনিস আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না—এমন সস্তা চালাকিতে ওঁরা কি করে এত সহজে ধরা দেন?'

'কেন দেবে না তাই বলো? যার যার নিজের ব্যবসায় ওরাও ঠিক একই ধরণের চালাকি করে, যেটা আমরা ওপর থেকে ধরতে পারি না। ওরাও তখন ঠিক আমাদেরই মতো হাসাহাসি করে।'

'আজ আমার ছবি তোলার দিন, এখন আমাকে সত্যিই ফিরে যেতে হবে।' নাতাশা বললো। 'বরং চলো না আমার সঙ্গে। খুব একটা

বেশি সময় লাগবে না।'

'তবু কতক্ষণ?'

'ধরো ঘণ্টাখানেক। তার বেশি নয়। অবশ্য ওখানে তোমার খুব একঘেয়ে লাগবে।'

'না, সেজন্যে নয়। আমি কেবল জানতে চাইছিলাম—আমরা কখন খাবো, ছবি তোলার আগে না পরে।'

'পরে। তখন আমরা অনেক সময় পাবো। তুমি কি মিসেস হোয়াই স্পারের ছবির টাকা থেকে নিজের অংশ পেয়ে গেছো?'

'না, এখনও পাইনি। তবে আজ বাড়তি দশ ডলার রোজগার করেছি। ওটাকে ওড়াবার জন্যে প্রাণ ছটফট করছে।'

খুশিয়াল চোখে নাতাশা আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো। 'ঠিক আছে, আজ রাতেই আমরা দুজনে ওটাকে উড়িয়ে দেবো।'

ভেতরটা সত্যিই খুব ঠাণ্ডা। দরজা-জানলা সব বন্ধ করে দিয়ে বাতানুকূলযন্ত্রটা চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। মনে হচ্ছে আমি যেন কোনো ডুবো জাহাজের মধ্যে বসে রয়েছি।

ইতিমধ্যে সবকটা স্পটলাইট জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। আজ শুধু নাতাশারই ছবি তোলা হবে। আমাকে দেখে আলোকচিত্র-শিল্পী নিকি হাসলো। 'এই আগাস্টেও গরমের বহরটা দেখেছেন একবার?'

'নিশ্চয়ই। সেই তুলনায় এখানে অনেক ঠাণ্ডা।'

'তবু তো যুদ্ধের জন্যে আমরা কিছুই করতে পারিনি। অবশ্য আশা করছি এই বছরেই যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে।'

'আপনার কি তাই মনে হয়?'

'নিশ্চয়ই। গত কয়েকদিন ইউরোপ ঘুরে আমার তাই মনে হয়েছে?'

উজ্জ্বল আলোয় ভরা শীততাপনিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসে আমার মনে হলো এখুনি বুঝি দম বন্ধ হয়ে আসবে। আমি জানি—জার্মানদের পক্ষে যুদ্ধের অবস্থা খুবই খারাপ, কিন্তু মৃত্যুর কথা যতটা বেশি করে ভাবতে পারি শান্তির কথা ভাবতে গেলেই মাথাটা কেমন যেন ঝিমঝিম করে ওঠে।

কেননা এতদিন সংবাদপত্রের খবরকে বিশ্বাস না করাতেই আমি অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। অথচ আজ ছোটখাটো এই মানুষটার অত্যন্ত উদাসীন ভাবেই ছুঁড়ে দেওয়া মন্তব্যটাকে আমি কিছুতেই গুরুত্ব না দিয়ে পারলাম না।

হৈ চৈ, ব্যস্ততার মধ্যে এককাঁধ খোলা, আঁট-সাঁট সান্ধ্য পোশাকে নাতাশাকে ধীরে ধীরে মঞ্চের দিকে এগিয়ে আসতে দেখলাম। দুহাতে দীর্ঘ সাদা দস্তানা, মাথায় সম্রাজ্ঞী ইউজেনির সেই টায়রাটা। পরিপূর্ণ আলোয় এসে দাঁড়ানোর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত ওকে চিনতে পেরেছিলাম, কিন্তু পরক্ষণেই ওকে আমার অচেনা মনে হলো—কেননা আগের দিন রাত্রে দীর্ঘদেহী, সম্পূর্ণ নগ্ন দেখা মেয়েটার সঙ্গে আজকের এই কৃত্রিম আলোয় রাজকীয় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকা লাস্যময়ী নাতাশার কোনো সম্পর্ক নেই।

'রোলস-রয়েসটা আপনার কেমন লাগে?' আমার পাশের আসন থেকে কে যেন বললো।

'গাড়িটা কি আপনার?'

'হ্যাঁ।'

মনে মনে যেমনটা আশা করেছিলাম, দেখলাম গাড়ির মালিকের সঙ্গে তার চেহারার কোনো মিল নেই। ফ্রেসারের সঙ্গে যখন আলাপ হয়েছিলো তখন জানতাম না যে সে-ই গাড়িটার মালিক। ফ্রেসার আমার চাইতে বয়েসে অনেক ছোট, রীতিমতো লম্বা আর অসম্ভব ছটফটে।

'আজ আমরা লুচাউ-এ যাবো। নাতাশার সঙ্গে আমার কথা হয়ে গেছে। আপনি কিন্তু প্রস্তুত থাকবেন।'

যদিও ভেবেছিলাম দশ ডলারের বখশিশটা আজরাতে নাতাশার সঙ্গে উড়িয়ে দেবো, কিন্তু নাতাশা যদি নিজে ফ্রেসারের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে থাকে আমার না করার কোনো প্রশ্নই আসে না।

ছবি তোলার কাজ মিটতে খুব একটা সময় লাগলো না। গাড়িটা বাইরেই দাঁড়িয়ে ছিলো। ষ্টুডিওর হিমেল পরিবেশ ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে

আসতেই গরমের দাপটটা বুঝতে পারলাম।

রুমালে মুখ মুছতে মুছতে ফ্রেসার বললো, 'আগামী বছর গাড়িটাকে বাতানুকুল করিয়ে নেবো। যন্ত্রটা বাজারে পাওয়া গেলেও, যুদ্ধের পরিপেক্ষিতে সবাইকে দেওয়া হচ্ছে না।'

মনে মনে ভাবলাম একবার বলি—আর কয়েক মাসের মধ্যেই যখন যুদ্ধ থেমে যাচ্ছে, ইচ্ছে করলে তুমি এখন থেকেই চেষ্টা করতে পারো।

শীতক-খুপরির কপাট খুলে ফ্রেসার একটা বোতল বার করলো।

'ভদকা চলবে নাকি?'

'না, ধন্যবাদ। বড্ড গরম লাগছে।'

'এটা কিন্তু সত্যিই খুব ভালো পোলিশ ভদকা। প্রথমটায় একটু গরম লাগলেও পরে দেখবেন আর ততটা গরম লাগছে না।'

সারা পৃথিবীতে পোল্যাণ্ডের যখন আর কোনো অস্তিত্বই নেই, তখন আমার পোলিশ ভদকা খাবার কোনো ইচ্ছে ছিলো না, কিন্তু নাতাশা বাচ্চা মেয়ের মতো হাত বাড়িয়ে আবদার জুড়ে দিলো, 'আমি খাবো, আমাকে একটু দাও, জ্যাক···লক্ষ্মীটি···'

ষ্টুডিও থেকে লুচাউ খুব একটা বেশি দূরে নয়। প্রথমে আমার ধারণা ছিলো ওটা হয়তো কোনো চীনা রেস্তোরাঁ। কিন্তু ভেতরে ঢোকার পর বুঝতে পারলাম ওটা সম্পূর্ণ জার্মান রেস্তোরাঁ। শুধু তাই নয়—ঝলসানো হরিণের মাংস, আলুর আসকে-পিঠে থেকে শুরু করে ফলের পুডিং পর্যন্ত, সবই জার্মান খাবারের ফরমাস দেওয়া হলো। আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার জন্যে নাতাশার সঙ্গে পরামর্শ করে এসব কাণ্ড ঘটানো হচ্ছে কিনা বুঝতে পারলাম না। এর পরে যদি কাফে হিণ্ডেনবুর্গে গিয়ে কফি আর কেকের ফরমাস দেওয়া হয়, তাহলে হয়তো একটুও অবাক হবো না। কিন্তু এ সব শুধু আমারই জন্যে করা হচ্ছে ভেবে ভেতরে ভেতরে সঙ্কুচিত হয়ে উঠলাম—বিশেষ করে যতটা না ফ্রেসারের জন্যে, তার চাইতে অনেক অনেক বেশি এই সরকারের কাছে, যাঁরা জার্মান জেনেও আমাকে এ দেশে থাকার অনুমতি দিয়েছেন।

'এল মরক্কোতে একটা ঘুমপাড়ানিয়া পানীয় হয়ে গেলে কেমন হয়?' ফ্রেসারই প্রস্তাব রাখলো।

আমার তেমন কোনো ইচ্ছে না থাকলেও, আশা করেছিলাম নাতাশা সবার আগে কলকলিয়ে উঠবে, কেননা এল মরক্কো ওর খুবই প্রিয়। কিন্তু ওকে ফ্রেসারের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে দেখে সত্যিই খুব অবাক হলাম: 'না জ্যাক, তুমি বিশ্বাস করো, আজ আমি সত্যিই খুব ক্লান্ত। তুমি বলো, সারাটা দিন কম টানা-পোড়েন গেলো?'

'তাহলে থাক। আমি শুধু মিস্টার রসের কথা ভেবেই বলেছিলাম।'

আমরা বাইরে বেরিয়ে এলাম। রীতিমতো উষ্ণ রাত। নাতাশাকে বললাম, 'আমি বরং হেঁটেই ফিরে যাই।'

'না না, তা কেন হবে,' ফ্রেসার আপত্তি জানালো। 'আমি আপনাকে বাড়িতে পৌঁছে দেবো।'

আমি প্রায় সুনিশ্চিতই ছিলাম যে ফ্রেসার আমাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে নাতাশাকে হয়তো এল মরক্কো কিংবা নিজের বাড়িতেই নিয়ে যাবে। অবশ্য তা নিয়ে আমার তেমন মাথা ঘামাবার কিছু ছিলো না। কেননা নাতাশার ওপর আমার সত্যিকারের তেমন কোনো অধিকার নেই, যদি কারুর থাকে তো ফ্রেসারের।

'কি ব্যাপার, আসুন।' ফ্রেসার তাড়া লাগালো।

নতুন কোনো আত্মঅবমাননাকে এড়াবার জন্যেই বললাম. 'আমি খুব কাছেই থাকি, হেঁটে যেতে আমার কোনো অসুবিধে হবে না।'

'বুদ্ধু আর কাকে বলে! এই গরমে তোমার হেঁটে যাবার দরকারই বা কি?' প্রায় ধমকেরই সুরেই বলে উঠলো নাতাশা। 'জ্যাক, তুমি বরং আমাদের আমার বাড়িতে পৌছে দাও। ওখান থেকে রবার্টের বাসাটা মাত্র কয়েকটা পা।'

'সেই ভালো।'

নাতাশার বাড়ির সামনে নামিয়ে দিয়ে ফ্রেসার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতোই আমাদের বিদায় জানালো। 'সত্যিই আজকের দিনটা ভারি

চমৎকার কাটলো। আশা করি খুব শিগগিরই আবার আমাদের দেখা হবে।'

'আজকের দিনটার জন্যে ধন্যবাদ।'

ফ্রেসার নাতাশার কপালে চুমু দিলো।

'শুভরাত্রি, জ্যাক। তোমার সঙ্গে যেতে পারলাম না বলে সত্যিই দুঃখিত। বিশ্বাস করো, কেন জানি না আজ আমার ভীষণ ক্লান্ত লাগছে।'

'ঠিক আছে। অন্য আর একদিন হবে। শুভরাত্রি প্রিয়তমা।'

'শুভরাত্রি।'

আমার মনে হলো আমেরিকায় 'প্রিয়তমা' শব্দের অর্থ—সবকিছু, আবার কিছু না। যাকে ছাড়া তুমি বাঁচতে পারবে না এমন কোনো মহিলাকে যেমন প্রিয়তমা বলা যায়, তেমনি অচেনা কোনো দূরভাষ-নন্দিনীকেও নির্দ্বিধায় প্রিয়তমা বলে সম্বোধন করতে পারো।

নাতাশা আর আমি—এখন আমরা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রয়েছি। আমি জানি এখন যদি রাগ দেখাতে যাই তাহলে সমস্ত পারিপার্শ্বিকতাটাই ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। তাই ভেতরের চাপা উত্তেজনাটাকে সামলে রেখে বললাম, 'ছেলেটি কিন্তু ভারি চমৎকার! কিন্তু তুমি কি সত্যিই খুব ক্লান্ত, নাতাশা?'

'হ্যাঁ, বিশ্বাস করো।' কেমন যেন ম্লান হয়ে উঠলো নাতাশা কণ্ঠস্বর। 'আসলে আজকের দিনটা আমার একটুও ভালো যায়নি। আর ফ্রেসারের কথা যদি বলো, ওটা একটা এঁটুলে পোকা।'

'তোমার কি সত্যিই তাই মনে হয়? কিন্তু ওকে দেখে তো আমার সে রকম মনে হলো না! বরং আমারই জন্যে জার্মান রেস্তোরাঁয় নিয়ে গিয়ে বেচারিকে মিছিমিছি এতটা কষ্ট করতে হলো।'

নাতাশা চটে উঠলো। 'বেচারির জন্যে যদি তোমার এতই দরদ, তাহলে দশ ডলার দুজনে মিলে উড়িয়ে দেবো বলে কথা দেওয়া সত্ত্বেও তুমি কেন ওর প্রস্তাব গ্রহণ করতে গেলে?'

'কে, আমি ?'

'হ্যাঁ, তুমি। তাছাড়া আবার কে ? তুমি যদি না করতে, তাহলে আমাকেও ওর সঙ্গে যেতে হতো না।'

'সত্যিই আমার ভুল হয়ে গেছে, নাতাশা। লক্ষ্মীটি, তুমি আমায় ভুল বুঝো না।'

নাতাশা সন্দিগ্ধ চোখে তাকালো আমার মুখের দিকে। 'সত্যি বলছো, না কি এটাও তোমার একটা চালাকি ?'

'ছুটোই, নাতাশা।'

'ছুটোই ?'

'বিশ্বাস করো, আমি সত্যিই বোকার মতো কাজ করে ফেলেছি, যেহেতু আমি তোমাকে শ্রদ্ধা করি।'

'আমি কিন্তু কোথাও তার কোনো লক্ষণ দেখছি না।'

'ওটা কাউকে কখনও দেখানো যায় না নাতাশা। তাছাড়া আমার শ্রদ্ধার প্রকাশ ভঙ্গিটাও অন্য অনেকের চাইতে একটু ভিন্ন ধরণের। কেননা আমার শ্রদ্ধা রূপ নেয় ধ্বংস, ঘৃণা আর প্রতিবন্ধকতার মধ্যে থেকে। বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, তবে তুমিই আমার স্থবিরতা ভেঙে চুরমার করে দিয়েছো।'

'রবার্ট, প্রিয়তম আমার, আমি তোমাকে ভুল বুঝেছি। তুমি আমার ওপর রাগ কোরো না। তোমাকে আমার ঘরে নিয়ে যেতে পারছি না বলে নিজেরই খুব খারাপ লাগছে। কোনো পুরুষমানুষকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি জানতে পারলে আমার পাশের ঘরের মহিলাটি প্রথমেই অজ্ঞান হয়ে যাবেন, তারপর জ্ঞান ফিরে এলে দরজায় কান পেতে শুনবেন। অথচ তুমি বিশ্বাস করো, আমার সত্যিই ভীষণ করতে ইচ্ছে করছিলো।'

'ঠিক আছে, আজ না হয় অন্য কোনোদিন হবে।'

মুখে বললেও, সেই মুহূর্তে এ পৃথিবীতে কোনো কিছু পাওয়ার চাইতে নাতাশাকে পেলেই সব চাইতে বেশি সুখী হতাম, তবু পাওয়া সম্ভব নয় জেনে মনে মনে কেন জানি খুশিও হলাম। ছুহাতে ওকে বুকের মধ্যে

নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে চুমু দিলাম।

ধূসর অন্ধকারেও ঝিকমিকিয়ে উঠলো নাতাশার চোখদুটো। সান্ধ্য-পোশাকের ওপর থেকেই নিষ্পেষণে আমি স্পষ্ট অনুভব করতে পারছিলাম ওর নিটোল স্তনভার।

'তোমাকে আর বেশিদিন কষ্ট করতে হবে না সোনামণি।' মৃদু গুঞ্জরণে নাতাশা বললো। 'দু-একদিনের মধ্যেই আমি একটা নতুন বাসা পাচ্ছি। তখন আমাদের আর রেস্তোরাঁর এককোণে চুপটি করে বসে থাকতে হবে না। ওখানে আমরা দুজনে সারাক্ষণই পায়রার মতো বক বকম করতে পারবো। তাছাড়া গরমেও কোনো অসুবিধে হবে না—ঘরটাতে তাপনিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা আছে।'

'তুমি কি এ ঘরটা ছেড়ে দিচ্ছো?'

'না না, এটা যেমন আছে তেমনি থাকবে। আমার পরিচিত এক ভদ্রলোক গ্রীষ্মের ছুটিতে কানাডায় বেড়াতে যাচ্ছেন। ওঁর ঘরটা দেখা-শোনা করার জন্যেই আমি মাস দুয়েক ওখানে থাকবো।'

'ঘরটা কি ফ্রেসারের?' কোনো কিছু না ভেবেই আমি জিগেস করলাম।

'আচ্ছা বোকা তো! ফ্রেসারের হতে যাবে কেন?' রীতিমতো বিরক্তির স্বরেই নাতাশা বললো। 'ওটা অন্য এক ভদ্রলোকের, তুমি ওঁকে চিনবে না।'

'আমি কাউকে চিনতে চাই না, শুধু ফ্রেসারের না হলেই হলো।'

'ওরে, বাব্বা! ফ্রেসারের ওপর ছেলের তো কম রাগ নয়?'

'নয়ই তো!'

'ঠিক আছে, আর রাগ করতে হবে না···এসো···' নাতাশা আমাকে টানতে টানতে সদর দরজার ওপারে সিঁড়ির অন্ধকার কোণটাতে নিয়ে এলো। তারপর ঘাঘরার প্রান্ত তুলে ফিসফিসিয়ে বললো, 'করো, আমার ভীষণ ইচ্ছে করছে।'

আমি ইতস্তত করলাম। 'কিন্তু কেউ যদি এসে পড়ে।'

'এত রাত্তিরে এখন আর কেউ আসবে না। শিগগির করো, নইলে কিন্তু আমি সত্যিই চেঁচাবো।'

স্বল্পালোকিত সুড়ঙ্গের ছায়া-ছায়া অন্ধকার মাড়িয়ে আমি স্টেশনে এসে পৌঁছলাম। দূর থেকেই দেখতে পাচ্ছিলাম ইঞ্জিনের তীব্র আলো, এক সময় প্রচণ্ড গর্জনে সুড়ঙ্গ কাঁপিয়ে অন্ধকার ফুঁড়ে ট্রেনটা এসেও পড়লো। কামরাগুলোর অধিকাংশই ফাঁকা। আমি যে কামরাটায় উঠলাম, তার জানলার দিকের এক কোণে এক মহিলা বসে রয়েছে। উলটো দিকের আসনে, কিছুটা তির্যক রেখায় বসের য়েছেন একজন বয়স্ক ভদ্রলোক গভীর মনোযোগ দিয়ে কাগজ পড়ছেন। আমি বসলাম মধ্যিখানের একটা ফাঁকা আসনে।

'ওটা একটা অসভ্য, নোংরা শূয়োর!' মহিলাটি হঠাৎ চিৎকার করতে করতে আমার দিকে ছুটে এলো। 'এবার আর শয়তানটা পালাতে পারবে না। আপনি নিজে চোখে সব দেখলেন তো? আপনিই আমার সাক্ষী।'

আমার তখন গাছ থেকে পড়ার মতো অবস্থা। 'সাক্ষী! কিসের সাক্ষী?'

'ওই ইতর ছোটলোকটার। এতক্ষণ ধরে ও বসে বসে আমাকে যৌনাঙ্গ দেখাচ্ছিলো।'

'এ আপনি কি বলছেন!' আমি রীতিমতো হকচকিয়ে গেলাম।

'আপনিই আমার সাক্ষী। আমি এক্ষুণি পুলিশ ডেকে ওকে ধরিয়ে দেবো। পুলিস! পুলিস!'

ভদ্রলোক আসন ছেড়ে উঠে ধীরে ধীরে আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন, তারপর বেশ মার্জিত স্বরেই বললেন, 'শুনুন, আপনি বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, এবং ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই কোনো দুঃস্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু আপনি যদি এভাবে কোনো ভদ্রলোককে অপমান করেন, তাহলে আমি নিজেই পুলিস ডাকতে বাধ্য হবো।'

ভদ্রলোকের কথা শুনে মহিলাটি খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো।

'শয়তানটার কথা শুনছেন ?'

'আপনি কিন্তু ভুল করছেন, মাদাম। আমার দিকে একবার ভালো করে তাকিয়ে দেখুন।' অপমান-ক্ষুব্ধ স্বরে ভদ্রলোক বললেন। 'আমি একজন সুখী, বিবাহিত মানুষ। যথেষ্ট বয়েসও হয়েছে! পুলিস কিন্তু আপনারই কথা শুনে হাসবে।'

'হাসবে না। এখন আমি একজন সাক্ষী পেয়েছি।' কামরার অনুজ্জ্বল আলোয় ঝিকিয়ে ওঠা ক্রোধোদীপ্ত চোখে মহিলাটি আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'আপনি আমার হয়ে সাক্ষী দেবেন, বুঝলেন ?'

'আমি ?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি।'

'উনি আপনার হয়ে কখনই সাক্ষী দিতে পারেন না,' এই প্রথম ভদ্রলোককে কিছুটা ক্রুদ্ধ হতে দেখলাম। 'প্রথমত উনি কিছুই দ্যাখেননি, দ্বিতীয়ত উনি যতটুকু দেখেছেন তাতে আপনার বায়ুরোগকেই বেশি করে সমর্থন করবে। কেননা পুলিস বায়ুরোগ-সংক্রান্ত মহিলাদের খুব ভালো করেই চেনে। ওরা আপনার হাঁটা দেখেই ব্যাপারটা স্পষ্ট বুঝতে পারবে। তখন কোনো ভদ্রলোকের চরিত্র হননের দায়ে আপনাকে ট্রেন থেকে নামিয়ে হয়তো আদালতেও নিয়ে যেতে পারে। আপনি যদি বেশি বাড়াবাড়ি করেন, আমি হয়তো সত্যিই পুলিস ডাকতে বাধ্য হবো।'

অত্যন্ত সংযত ভঙ্গিতে ভদ্রলোক কেটে কেটে প্রতিটা শব্দ এমন ভাবে উচ্চারণ করলেন, যে তার চরিত্রের দৃঢ়তা সম্পর্কে আমার আর কোথাও কোনো দ্বিধা রইলো না। তাছাড়া সত্যিই তো আমি বিরুদ্ধাচরণের কোনো চিহ্নও চোখে দেখিনি।

'কিন্তু কাগজ পড়ার ভান করে আপনি যে যৌনাঙ্গ দেখাচ্ছিলেন, উনি সেটা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন।'

বিনীত স্বরে বললাম, 'আমি সত্যিই কিন্তু কিছু দেখিনি, মাদাম।'

কাঁচের মতো স্বচ্ছ, বিস্ফারিত চোখে মহিলাটি আমার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলো।

'বিশ্বাস করুন, ওসব আমি কিচ্ছু দেখিনি। সত্যিই এ ব্যাপারে আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারছি না।'

'বরং উনি যেটা দেখছেন—আপনার পাদুটো এখনও থরথর করে কাঁপছে। আপনার ভাগ্য ভালো যে শুভবুদ্ধি-সম্পন্ন কোনো মানুষ বলে আমি এখনও পুলিস ডাকিনি।'

'তাহলে, তাহলে বলবো...' কথা বলতে গিয়ে মহিলাটির ঠোঁটদুটো মৃদু কেঁপে উঠলো, 'আপনারা দুজনেই ইতর!'

কি যেন একটা স্টেশনে ট্রেন থামতেই মহিলাটি এক ঝটকায় দরজা খুলে নেমে গেলো। বাইরে থেকে শোনা গেলো তার কণ্ঠস্বর, 'এবার দুজনে মিলে যতখুশি করুন!'

ভদ্রলোক অসহায়ের মতো আমার দিকে তাকিয়ে নোংরা একটা রুমালে কপালের ঘাম মুছলেন। 'ধন্যবাদ, মঁসিয়ে।'

'চুপ করুন!' কি যেন একটা ক্রোধে আমি অসম্ভব জোরে চিৎকার করে উঠলাম আর ঠিক তখনই কাঁচা ঘুমটা ভেঙে গেলো।

## বারো

ভোর হতে না হতেই হ্যারি কান হোটেল রুবেনে এসে হানা দিলো। আমাকে বললো, 'চলো, আজ একটা অভিযানে বেরুবো।'

রীতিমতো ঘাবড়ে গিয়ে প্রশ্ন করলাম, 'কোথায়?'

'হির্শের বাড়িতে।'

'হির্শ বলতে সেই ভদ্রলোক যিনি ডাক্তার গ্রাফেনহেইমকে ঠকিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ, সেই ছোটলোকটা।' চাপা স্বরে কান বললো। 'ও বলেছে ডাক্তার গ্রাফেনহেইমের কাছ থেকে নাকি কোনোদিনই কিছু নেয়নি। সেই জন্যেই আজকের এই অভিযান। গ্রাফেনহেইমের কাছে যদি কোনো রসিদ থাকতো তাহলে আইনের আশ্রয় নেওয়া যেতো। এখন ওঁর হাতে

একটাও পয়সা নেই। আমরা যদি সাহায্য না করি তাহলে ওঁর গবেষণার কাজটাও বন্ধ হয়ে যাবে। উনি হির্শকে বেশ কয়েকটা চিঠি দিয়েছিলেন, কিন্তু কোনো জবাব পাননি। উনি নিজেও একবার দেখা করতে গিয়েছিলেন, কিন্তু হির্শ গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দিয়েছে, বলেছে ফের কোনোদিন এলে ব্ল্যাকমেল করার অভিযোগে পুলিসে ধরিয়ে দেবে।'

'তুমি এসব খবর জানলে কোত্থেকে?'

'বেটির কাছ থেকে।'

'তোমার আজকের এই অভিযানের খবর ডাক্তার গ্রাফেনহেইম কি কিছু জানেন?'

'না।'

'হির্শ কি জানে যে আমরা যাচ্ছি?'

'আজকেই যাবো সে খবর ও জানে না। তবে দুবার ফোনে আগে থেকে প্রস্তুত থাকার কথা জানিয়ে দিয়েছিলাম।'

'তাহলে দেখো উনি নিশ্চয়ই আমাদের বাড়িতে ঢুকতে দেবেন না, নয়তো নিজেই বাড়িতে থাকবেন না।'

কান আমার কথার কোনো জবাব দিলো না। সম্ভবত দাঁতে দাঁত চেপে রাখার ফলে দেখলাম ওর চোয়ালের হাড়দুটো শক্ত হয়ে উঠেছে। চাপা উত্তেজনায় ওর সমস্ত চেহারাটাই কেমন যেন পালটে গেছে। বড় বড় পা ফেলে ও দ্রুত এগিয়ে চলেছে। মনে পড়লো ফ্রান্সে ওকে ঠিক এমনটাই দেখেছিলাম। নিজে থেকে কোনো প্রশ্ন করে ওকে বিব্রত করতে সাহস পেলাম না।

এক সময়ে কান নিজে থেকেই বললো, 'বাড়িতেই থাকবে তুমি দেখো।'

'তাহলে নিশ্চয়ই কোনো উকিলকে সঙ্গে রেখে দেবে, যাতে আমাদের বিরুদ্ধে ব্ল্যাকমেল করার অভিযোগ আনতে পারে।'

'তেমন কিছু করবে বলে আমার মনে হয় না।' কান হঠাৎ থমকে গেলো। 'এই যে, আমরা এসে পড়েছি। বাঃ, বাড়িটা বেশ সুন্দর

দেখতে তো!'

চুয়ান্নোতম সরণীর ওপর প্রাসাদপম বাড়িটা সত্যিই দেখার মতো। সিঁড়ির সামনে লাল গালচে বিছানো। জমকালো পোশাকে দারোয়ানকে দেখতে ঠিক সেনাধক্ষ্যের মতো। আমাদের দেখে দরোয়ান বৈদ্যুতিক সিঁড়ির দরজা খুলে দিলো। কান বললো, 'ষোলো তলা। হের হির্শ।'

চারদিক বন্ধ ছোট্ট খাঁচায় বন্দী হয়ে আমরা যখন ওপরে উঠছি, কান বললো, 'সঙ্গে উকিল নিয়ে আমাদের অভিযুক্ত করার সাহস ওর হবে বলে আমার মনে হয় না। ফোনে আমি ওকে ভয় দেখিয়ে বলেছি যে আমার কাছে নতুন কয়েকটা তথ্য-প্রমাণ আছে। যেহেতু নিজের অপরাধ সম্পর্কে ও সচেতন, স্বাভাবিক ভাবেই তথ্য-প্রমাণগুলো দেখতে চাইবে। তাছাড়া যেহেতু ও এখনও আমেরিকান নাগরিকত্ব লাভ করেনি, পুরনো উদ্বাস্তু হিসেবে নিজের সম্পর্কে নিশ্চয়ই একটা ভয় আছে। কোনো আইনজীবীকে সঙ্গে নেবার আগে নিজের সম্পর্কে সুনিশ্চিত না হয়ে ও কখনই তা করবে না।'

বিজলি-বোতামে চাপ দিতেই একজন পরিচারিকা এসে দরজা খুলে দিলো এবং দামী দামী সোফা-সেঠি দিয়ে সুন্দর সাজানো বৈঠকখানায় আমাদের নিয়ে এলো।

'আপনারা একটু অপেক্ষা করুন মিস্টার হির্শ এখুনি এসে পড়বেন।'

হির্শের বয়েস পঞ্চাশের কাছাকাছি, মাঝামাঝি উচ্চতায় বেশ গাঁট্টা গোট্টা চেহারা। ভেতরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই ভয়ঙ্কর চেহারার একটা জার্মান শিকারী কুকুর ওঁকে অনুসরণ করলো। কান কুকুরটার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললো, 'এই ধরনের কুকুর আমি শেষ কোথায় দেখেছিলাম জানেন, হের হির্শ? দেখেছিলাম গেস্টাপোদের সঙ্গে। এদের সাহায্যে ওরা মানুষ শিকার করতো।'

'চুপ, চুপ হ্যারো, চুপ!' কুকুরটার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে হির্শ ধমক দিলেন। 'ও, আপনিই তাহলে আমার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলেন! কিন্তু আপনারা যে দুজন আসবেন সে কথা কিন্তু আগে

বলেন নি। যা বলার তাড়াতাড়ি বলুন, আমার বেশি সময় নেই।'

'আমি খুব বেশি একটা সময় নেবো না, হের হির্শ। ইনি মিস্টার রস, আমার বন্ধু। ডাক্তার গ্রাফেনহেইমের হয়ে আমরা আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। উনি খুব অসুস্থ, হাতে একটা পয়সা নেই। অর্থাভাবে হয়তো মাঝ পথেই গবেষণার কাজটা ছেড়ে দিতে হবে। আশা করি আপনি নিশ্চয়ই ওঁকে চেনেন।'

হির্শ সেই মুহূর্তে কোনো জবাব দিলেন না, তখনও চাপা গর্জনে ফুলে ফুলে ওঠা কুকুরটাকে তিনি শান্ত করতেই ব্যস্ত ছিলেন।

কান বললো, 'আমি ভালো করেই জানি আপনি ওঁকে চেনেন। বরং জানি না আপনি আমাকে চেনেন কিনা। কেননা কত কানই থাকতে পারে, যেমন রয়েছে কত হির্শ। তবে আশা করি গেস্টাপো কানের নাম আপনি নিশ্চয়ই শুনে থাকবেন। কেননা গেস্টাপোর সঙ্গে প্রতারণার কাজে বেশ কয়েকটা বছর আমার ফ্রান্সে কেটেছে। আর এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখি—যদি ভেবে থাকেন শিকারী কুকুর দিয়ে আত্মরক্ষা করবেন, তাহলে কিন্তু সত্যিই ভুল করবেন। কুকুর এবং কুকুরের মালিক —দুজনকেই গুলি করে মারতে আমি একটুও দ্বিধা করবো না। অবশ্য এখন এসব আলোচনা করতে চাই না, কেননা পরস্পরকে আঘাত করার জন্যে আমি এখানে আসিনি। আমি এসেছি ডাক্তার গ্রাফেনহেইমের জন্যে অর্থ সংগ্রহ করতে। আশা করি আপনি নিশ্চয়ই ওঁকে সাহায্য করবেন। এখন আপনি কতটা সাহায্য করার জন্যে প্রস্তুত আছেন তাই বলুন?'

'কিন্তু আমি কেন ওঁকে সাহায্য করতে যাবো?'

'অনেকগুলো কারণে। প্রথমত যেমন ধরুন সমবেদনার জন্যে।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে ভদ্রলোক কি যেন ভাবলেন, তারপর কুমীরের চামড়ার ব্যাগ থেকে দুটো নোট বার করে এগিয়ে দিলেন। 'এই কুড়ি ডলার নিয়ে যান। এর বেশি আর দিতে পারবো না। প্রতি-দিনই বহু লোক নানান বায়নাক্কা নিয়ে আসে, সবাইকে খুশি করতে

গিয়ে আমার জান বেরিয়ে যাবার যোগাড়। তবে আপনি যদি শখানেক উদ্বাস্তুর কাছে সাহায্যের জন্যে যান, তাহলে যে টাকা সংগ্রহ করতে পারবেন, তা দিয়ে ডাক্তার গ্রাফেনহেইমের গবেষণার কাজ বেশ ভালো ভাবেই চলে যাবে।'

আমি ভেবেছিলাম কান নোটদুটো সোজা হির্শের মুখের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দেবে, কিন্তু তা না করে সে নোটদুটো পকেটে চালান করে দিলো।'

'ধন্যবাদ, হের হির্শ। এখন আপনার কাছ থেকে পেতে হবে আরও নশো আশি ডলার, যেটা মদ বা ধূমপান না করে অত্যন্ত সাধারণ ভাবে খেয়ে পরে বাঁচার জন্যেই ডাক্তার গ্রাফেনহেইমের প্রয়োজন।'

'আপনি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন? অত্যন্ত দুঃখিত, সত্যিই আমার সময় নেই...'

'ও কথা বলবেন না, হের হির্শ। আমি জানি আপনার সময় কিছু কম নেই। এবং আশা করি নিশ্চয় এ কথাও বলবেন না যে পাশের ঘরে কোনো উকিলকে বসিয়ে রেখে এসেছেন, কেননা যেহেতু কথাটা সত্যি নয়। আমি বিশ্বাস করি আমার কথা শোনার জন্যে আপনি খুবই আগ্রহী। যদিও আপনি এখনও আমেরিকান নাগরিকত্ব পাননি, তবু আশা করছেন আগামী বছরেই পেয়ে যাবেন। সে ক্ষেত্রে আপনি নিশ্চয়ই চাইবেন না যে আপনার চরিত্রে কোনো কলঙ্কচিহ্ন লেগে থাকুক, কেননা যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ এসব ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক। আমার বন্ধু রস এখানকার একজন দুঁধে সাংবাদিক। প্রয়োজন হলে এ আপনাকে অনেক সাহায্য করতে পারবে।'

'কিন্তু আমি যদি এখন পুলিসে খবর দিই?'

কান হেসে উঠলো। 'তাহলে বলবো আপনি বোকামিই করবেন। আমি স্রেফ নথিপত্রগুলো পুলিসের হাতে তুলে দেবো।'

'আপনি জানেন, ব্ল্যাকমেল করাটা এ দেশে মারাত্মক ধরনের অপরাধ?'

'আপনি নিজেকে খুব চালাক মনে করেন, তাই না হের হির্শ?' চকিতে কানের গলার স্বর কেমন যেন পাল্‌টে গেলো। 'কিন্তু আপনি আদৌ চালক নন। তা যদি হতেন তাহলে ডাক্তার গ্রাফেনহেইমের টাকাটা অবশ্যই ফিরোত দিতেন। এখন আমার পকেটে দুটো আবেদন পত্র রয়েছে। দুটোই অভিবাসন কর্তৃপক্ষের কাছে লেখা। একটাতে প্রায় শ'দেড়েক উদ্বাস্তু আপনাকে আমেরিকান নাগরিকত্ব না দেবার জন্যে আবেদন জানিয়েছেন। অন্যটা ছজনের সই করা প্রায় একই ধরনের আবেদন, শুধু তার সঙ্গে যোগ করা আছে জার্মানীতে গেস্টাপোর সঙ্গে আপনার যোগসাজশের নানান তথ্য-প্রমাণ। এতেই বলা হয়েছে আপনি কিভাবে জার্মানী থেকে বিদেশে টাকা-পয়সা নিয়ে এসেছেন, এমন কি যে নাৎসিটি আপনার হয়ে টাকা-পয়সা নিয়ে সুইজারল্যাণ্ডে এসেছিলো তার নামও দেওয়া আছে। তাছাড়া আমার কাছে লিয়নস্ সংবাদপত্রের কিছু কাটা অংশ আছে, যাতে বলা হয়েছে—জিজ্ঞাসাবাদের সময় ইহুদি, হির্শ দুজন পলাতকের নাম বলে দেয়, পরে গেস্টাপোর হাতে ধরা পড়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যাদেরকে গুলি করে হত্যা করা হয়। উঁহু, প্রতিবাদ করার চেষ্টা করবেন না, হের হির্শ। এমনও তো হতে পারে যে ইহুদি হির্শ আর আপনি এক ব্যক্তি নন। কিন্তু আমি প্রমাণ করে দেবো যে আপনিই সেই ব্যক্তি। ফ্রান্সের মতো এখানেও সবাই আমাকে আপনার চাইতে বেশি বিশ্বাস করবে।'

হিরসের নিচের চোয়ালটা শিথিল হয়ে ঝুলে পড়েছে। 'আপনি ...আপনি মিথ্যে সাক্ষী দেবেন।'

'সামাজিক আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে মিথ্যে হলেও, বাইবেলের দৃষ্টি থেকে, আমাদের পূর্বপুরুষদের নিয়ম অনুসারে ব্যাপারটা আদৌ অন্যায় নয়—যেখানে বলা হয়েছে একটা চোখের বদলে একটা চোখ, একটা দাঁতের বদলে একটা দাঁত। আপনি ডাক্তার গ্রাফেনহেইমকে পথে বসিয়েছেন, আমরা আপনাকে পথে বসাবো—তা সে সত্যি হোক আর মিথ্যেই হোক। আমি তো আপনাকে আগেই বলেছি—নাৎসিদের সঙ্গে

থেকে থেকে আমার কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছে, যেগুলো সত্যিই বেশ কার্যকর।'

'এর পরেও আপনি নিজেকে একজন ইহুদি বলে দাবী করেন?'

'নিশ্চয়ই। এখানে আপনার সঙ্গে আমার খুব একটা তফাৎ নেই।'

'কিন্তু আমেরিকান পুলিস…'

'আমি তো আগেই বলেছি—আপনাকে জেলে পাঠানো কোনো ইচ্ছে আমার নেই। কিন্তু আপনি যদি মিছিমিছি ঝামেলা পাকাবার চেষ্টা করেন, আমি আইনের মুখ চেয়ে হাঁ করে বসে থাকবো না। নিজের ব্যবস্থা নিজেই করে নেবো এবং সে সাহস আমার আছে। তবু আপনার আর আমার রক্ত এক জেনেই আমি শেষ বারের মতো অনুরোধ করছি ডাক্তার গ্রাফেনহেইমের প্রাপ্য টাকার সামান্য একটা অংশ শুধু ফিরিয়ে দিন।'

আবার নিঃশব্দে চোয়াল নাড়তে নাড়তে হির্শকে কি যেন ভাবতে দেখলাম। 'আমার এখানে কোনো টাকা নেই।'

'আপনি টাকাটা চেকেও দিতে পারেন।'

হঠাৎ হির্শ উঠে একটা দরজা ঠেলে কুকুরটাকে যেতে দিলেন। 'যা হ্যারো, এখন ওখানে গিয়ে চুপ করে বসে থাক্।'

হির্শ আবার সন্তর্পণে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ফিরে এলেন।

'আপনি খুব ভালো করেই জানেন টাকাটা আমি চেকে দিতে পারি না। ওটা আমি নগদে দেবো।'

এত দ্রুত উনি যে টাকাটা দিতে রাজি হবেন আমি কল্পনাও করতে পারিনি। যুক্তির দিক থেকে কানের অনুমানই ঠিক—উদ্বাস্তুদের অত্যন্ত স্বাভাবিক অজানা আতংকের সঙ্গে হির্শের গোপন অপরাধ বোধই ওর নৈতিক চরিত্রের দৃঢ়তাকে শিথিল করে দিয়েছে।

কান বললো, 'ঠিক আছে, কাল এসে ওটা আম বরং নগদেই নিয়ে যাবো।'

'আর কাগজপত্রগুলো?'

'ওগুলো আমি আপনার চোখের সামনে পুড়িয়ে নষ্ট করে ফেলবো।'

'আমি কিন্তু কাগজগুলোর বিনিময়েই আপনাকে টাকাটা দেবো।'

কান ঘাড় নাড়লো। 'উঁহু, তা হবে না। যারা আপনার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে রাজি আছে, তাদের নামগুলো আমি আপনাকে কিছুতেই জানতে দিতে পারি না।'

'কিন্তু আমি কেমন করে জানবো যে ওগুলো ঠিক?'

'যেহেতু আমি আপনাকে বলছি।'

আবার সেই নিটোল নিস্তব্ধতা। এক সময়ে নীরবতা ভেঙে হিশ নিজেই বলে উঠলেন, 'ঠিক আছে, কাল তাহলে এই সময়েই আসবেন।' উনি আসন ছেড়ে উঠে পড়লেন। কপালে তখন জমে উঠেছে গুঁড়ি গুঁড়ি ঘাম। আজ আমি সত্যিই বেশি সময় দিতে পারছি না। আমার এক-মাত্র ছেলে খুবই অসুস্থ।'

'সত্যিই আমি দুঃখিত।' শান্ত স্বরে কান বললো। 'আশা করি আপনার ছেলে শিগগিরই সুস্থ হয়ে উঠবে। ইচ্ছে করলে আপনি ডাক্তার গ্রাফেনহেইমের সঙ্গেও যোগাযোগ করতে পারেন।'

কোনো জবাব না দিলেও আমি স্পষ্টই ওঁর মুখখানা ঘৃণা আর বেদনায় ভরে উঠতে দেখলাম। এবং জানি না কেন, আগের চাইতে ওঁকে এখন আমার অনেক বেশি তীক্ষ্ণ আর সতর্ক মনে হলো। বলা যায় না, হয়তো ছেলের অসুস্থতা প্রসঙ্গে ওঁর মনে কোনো সংস্কারও থাকতে পারে। হয়তো উনি ভাবছেন ডাক্তার গ্রাফেনহেইমের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার জন্যেই ছেলে অসুস্থ হয়ে পড়েছে এবং সেই জন্যেই হয়তো এত তাড়াতাড়ি টাকাটা দিয়ে দিতে রাজি হলেন। ওঁর জন্যে আমি মনে মনে কিছুটা বিষণ্ণ বোধ না করে পারলাম না।

খাঁচায় বন্দী হয়ে নামার সময় কান বললো, 'ওঁর ছেলে সত্যিই অসুস্থ কিনা আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।'

'নিশ্চয়ই অসুস্থ,' আমি বললাম। 'ইহুদিরা সাধারণত আত্মীয়-স্বজনের দুর্ভাগ্য নিয়ে ঠাট্টা করে না।'

কান চোখ পাকিয়ে তাকালো আমার দিকে। 'আমি বাজি রেখে বলতে পারি ওঁর কোনো ছেলেই নেই।'

উন্মুক্ত রাজপথে বেরিয়ে আসতেই রোদ্দুরে চোখ ধাঁধিয়ে গেলো। আমি জিগেস করলাম, 'তোমার কি মনে হয় কাল উনি কোনো ঝামেলা পাকাবেন?'

'আমার কিন্তু তা আদৌ মনে হয় না। উনি এখন নাগরিত্ব পাওয়ার ব্যাপারেই বেশি উৎসাহী।'

'তোমার কি মনে হয় কাল আমার আসা দরকার?'

'কোনো দরকার নেই। সাংবাদিক হিসেবে তোমার উপস্থিতি আজ আমার খুবই উপকারে এসেছে।'

'তোমার কাছে কি সত্যিই স্বাক্ষর করা আবেদনপত্র আছে?'

'পাগল হয়েছো!' কান অদ্ভুত ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসলো। 'সেই জন্যেই তো সব টাকা না চেয়ে মাত্র হাজার ডলার দাবী করেছি।'

'তুমি এমন ভাবে তাকাচ্ছো যেন কোথায় একটা মৃতদেহ লুকিয়ে রেখেছো।' হাসতে হাসতে নাতাশা বললো।

'কি করবো বলো, এটা আমার দীর্ঘদিনের অভ্যেস।'

জানলার উজ্জ্বল আলোকিত পটভূমিতে নাতাশাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে চুমু দিলাম। ভেসে এলো ওর চুলের স্নিগ্ধ সুবাস।

'আজ যে রোববার সেকথা মনে আছে?'

'আছে।'

'আমাদের যা যা প্রয়োজন এখানে সবই আছে—ভদকা বিয়ার দুধ রুটি মাখন ফল স্যালাড রেডিও।' পাকা গিন্নীর মতো নাতাশা ফিরিস্তি দিয়ে গেলো। 'শুধু একটা খবরের কাগজ হলেই সারা দিন আমাদের আর ঘর থেকে বেরুতে হবে না।'

নাতাশার নতুন আস্তানাটার দিকে আমি একবার চোখ বুলিয়ে

নিলাম। বসার ঘর, শোবার ঘর, রান্নাঘর, স্নানঘর নিয়ে ষোলো তলায় মাঝারি আকারের এই স্বয়ংসম্পূর্ণ বাসাটা সত্যিই বেশ সুন্দর। ফ্রেসার হয়তো নাক কোঁচকাবে, কিন্তু আমার কাছে রীতিমতো বিলাসবহুল মনে হলো। বসার আর শোবার ঘরের জানলাগুলো বেশ বড় বড়, যেখান থেকে ওয়াল স্ট্রীটটা সম্পূর্ণ দেখা যায়।

'তোমার এই নতুন বাসাটা কিন্তু সত্যিই বেশ সুন্দর হয়েছে।'

আমার কথা শুনে নাতাশা বড় বড় চোখ মেলে তাকালো।

'তোমার তাই মনে হয় বুঝি?'

'হ্যাঁ। নিউ ইয়র্কে থাকতে গেলে এই রকমই কোনো বাসায় থাকা উচিত। এখন কাগজের স্টলটা কোথায় শুধু তাই বলো?'

'নিচে, ডানদিকের কোণে। তুমি কাগজটা নিয়ে এসো, আমি তত-ক্ষণে একটু কফি বানাই।'

দ্বিতীয় সরণীতে একটু ঘোরাঘুরি করে, প্রায় দুশো পাতার 'টাইমস্' আর 'হেরাল্ড ট্রিবিউন' নিয়ে যখন ফিরে এলাম—দেখলাম নাতাশার মাথার ওপর চূড়ো করা চুলের সঙ্গে পাগড়ি বাঁধা, কোমরে জড়ানো শুধু একটা তোয়ালে, সারা অঙ্গে আর কোথাও কোনো আবরণ নেই।

'সত্যিই দারুণ দেখাচ্ছে!' কাগজ দুটো চেয়ারের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে আমি অতর্কিতে ওকে জড়িয়ে ধরলাম।

'তোমার আসতে দেরি হচ্ছিলো দেখে আমি স্নানের তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছিলাম।'

'ভাগ্যিস দেরি করেছিলাম, নইলে এমন দৃশ্যটা আমার জীবনে কোনোদিন দেখাই হতো না।'

'যাও, দুষ্টুমি করতে হবে না।'

নাতাশা সরে যাবার চেষ্টা করতেই আমি ওকে আরও নিবিড় করে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলাম।

'তোমার কফি কিন্তু ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।'

'কফি আমার লাগবে না।'

পরের দিন দুপুরে কানকে ফোন করলাম। টাকাটা ও হাতে পেয়েছে কিনা জানার কৌতূহল কিছুতেই চেপে রাখতে পারছিলাম না। কান বললো টাকাটা হাতে পেয়েছে এবং কোনো রকম ঝামেলা হয়নি। 'তুমি বরং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বেটির সঙ্গে একবার দেখা করে এসো।'

আমি মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। 'কেন, কিছু কি হয়েছে?'

'হ্যাঁ। তবে সত্যিকারের সেটা যে কি এখনও জানা যায়নি। ডাক্তার গ্রাফেনহেইম আর রাভিক ওকে পরীক্ষা করে দেখছে। এক ধরণের টিমমার। তবে অস্ত্রোপচার না করা পর্যন্ত ওরা সুনিশ্চিত করে কিছু বলতে পারছে না ওটা শুভ না অশুভ। রাভিকের ওপরেই বেটির দায়িত্ব পড়েছে। ও এখন মাউন্ট সিনাই হাসপাতালের একজন সহকারী।'

'রাভিকই কি অস্ত্রোপচার করবে?'

'ওর অস্ত্রোপচার করার অনুমতি আছে কিনা আমি ঠিক জানি না, তবে ও থাকবে। তুমি কখন যাবে?'

'এখন তো আর সময় হবে না। সন্ধ্যে ছটা নাগাদ নিশ্চয়ই যাবো তুমি কি তখন বেটির বাড়িতে থাকবে?'

'না, একটু আগেই আমি ওখান থেকে আসছি। শুধু গ্রাফেন-হেইম-কে টাকা দিতেই আমার পুরো একটা ঘণ্টা সময় কেটে গেলো। হির্শের মতো কোনো ছোটলোকের কাছ থেকে উনি টাকা নিতে আদৌ রাজি নন! সত্যি বলতে কি জানো, হির্শের কাছ থেকে টাকা আদায় করতে আমার যত কষ্ট হয়েছে, তার চাইতে অনেক বেশি পরিশ্রম করতে হয়েছে টাকাটা ওঁকে দিতে। যাই হোক, তাহলে আজ ছটার সময় তুমি ওখানে যাচ্ছো তো?'

'হ্যাঁ।'

'চেষ্টা কোরো সব সময় জার্মান ভাষায় কথা বলতে আর নানান গল্প-গুজবে ওকে একটু ভুলিয়ে রাখতে।'

'আচ্ছা।'

একটাও মেঘ নেই, আকাশের রঙ একেবারে ধূসর ছাইয়ের মতো। বেটির বাড়িতে পৌঁছে দেখলাম ফিকে গোলাপী রঙের একটা চীনা আলোয়ান জড়িয়ে ও বিছানায় বসে রয়েছে। আশেপাশে আরও জনা দশেক লোক রয়েছে, যাদের প্রায় সবাইকেই আমি চিনি, অন্তত বেশ কয়েকবার দেখেছি। রাভিক জানলার খাঁজে বসে বাইরে রাস্তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। গরম সত্বেও অন্য জানলাগুলো সব বন্ধ। বেটির ধারণা খোলা জানলা দিয়েই বেশি গরম আসে। মাথার ওপরে ক্লান্ত ভ্রমরের মৃদু গুঞ্জরণের মতো বিজলী পাখাটা ঘুরছে। পাশের ঘরের খোলা দরজা দিয়ে রান্নাঘরটা চোখে পড়ে। যমজ কোলার দুই বোন সেখানে কফি বানাচ্ছে, ভেসে আসছে অ্যাপেল স্ট ডেলের সুস্বাদু গন্ধ।

'রবার্ট, তুমি!' আমাকে দেখেই বেটি স্টেইন খুশির সুরে কলকলিয়ে উঠলো। 'তুমি এসেছো দেখে আমি সত্যিই খুব খুশি হয়েছি। এতগুলো বন্ধুকে একসঙ্গে পাওয়া রীতিমতো সৌভাগ্যের কথা।'

'বন্ধু নয় বেটি, আমরা তোমার সন্তান। তোমাকে ছাড়া আমরা এতগুলো উদ্বাস্তু সত্যিই মা-হারা হয়ে পড়বো।'

'তোমার কাজকর্ম কেমন চলছে ?'

'ভালো। আমার মনে হয় আর কিছুদিনের মধ্যেই ফ্রিয়েসল্যাণ্ডারের টাকাটা ফেরোত দিতে পারবো।'

বেটি ভ্রূ কুঁচকে তাকালো আমার দিকে। 'এখনও যথেষ্ট সময় আছে, এত তাড়াহুড়ো করার কোনো দরকার নেই। ফ্রিয়েসল্যাণ্ডারের অবস্থা এমন নয় যে টাকার জন্যে ও মরে যাবে। এমন কি ইচ্ছে করলে তুমি যুদ্ধের পরেও দিতে পারো।'

'না না, সুযোগ পেলেই আমি টাকাটা ফেরোত দেবো।'

'তুমি আসায় আমি সত্যিই খুব খুশি হয়েছি রবার্ট।' বেটি বিশীর্ণ ঠোঁটে মিষ্টি করে হাসলো। 'তুমি দেখো, আমি বেশি দিন অসুস্থ থাকবো না।'

'তুমি অসুস্থ থাকলে আমাদের নিজেদেরই খারাপ লাগবে, বেটি।'

'আমার মনে হয় শিগগিরই সুস্থ হয়ে ফিরে আসতে পারবো।'

'নিশ্চয়ই। তুমি না থাকলে আমাদের অন্তরণশিবিরে বন্দী হ থাকার মতোই মনে হবে।'

'তোমার কি মনে হয় আমার আর একটু বেশি সাহসের পরিচ দেওয়া উচিত?'

'একটুও না। তোমার চাইতে তুঃসাহসী মহিলা পৃথিবীতে খুব কম আছে, বেটি। আজ কিন্তু আমি একটু উঠবো। কাল এসে আবার দে করে যাবো।'

বেটি ছোট্ট করে ঘাড় নাড়লো, তারপর শীর্ণ হাতটা বাড়িয়ে দি বললো, 'বিদায় রবার্ট।'

'শুভরাত্রি, বেটি।'

বেরুবার মুখে রাভিকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। আমাকে দেখে বললো, 'চললে?'

'হ্যাঁ। আসলে কি জানো, অসুস্থ কোনো মানুষকে দেখতে আস আমি ঠিক উপযুক্ত নই। সারাক্ষণই কেবল উসখুস করি আর মনে ম পালাবার জন্যে কেমন যেন অস্থির হয়ে উঠি।'

'অল্পবিস্তর আমরা সবাই তাই করি আর সুস্বাস্থ্যের জন্যে আম নিজেদেরকেই অপরাধী মনে করি।'

'বেটির সত্যিকারের অবস্থাটা কেমন?'

'অস্ত্রোপচার না করা পর্যন্ত কিছুই বলা যাচ্ছে না।'

'তুমি কি নিজে অস্ত্রোপচার করবে?'

'হ্যাঁ। অবশ্য আমাকে সাহায্য করবে একজন আমেরিকান সহকর্মী

'চলি রাভিক, বিদায়।'

'এখন আমার নাম ফ্রেসেনবুর্গ। আমার আসল নাম।'

'আমার নাম এখনও রসই রয়েছে। এটা আমার আসল নাম নয়।'

রাভিক হাসলো। বাড়িয়ে দেওয়া উষ্ণ হাতের মুঠোটা ছেড়ে দি

ামি দ্রুত পা বাড়ালাম। আবার আমাদের পরস্পরে দেখা হবে কিনা জিগেস করার ইচ্ছে ছিলো, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হলো আমার মতো ও-ও াইবে না অতীত দিনের স্মৃতি রোমন্থন করতে। তাছাড়া পরস্পরে ামাদের সত্যিই কিছু বলার ছিলো না।

## তেরো

বটি স্টেইন হাসপাতাল থেকে ফিরে এসেছে শুনে দেখা করতে গেলাম।

'কেউ আমাকে সত্যি কথা বলেনি, কেউ না…' আমাকে দেখেই বটি আর্তস্বরে বলে উঠলো। 'না আমার বন্ধু, না আমার শত্রুরাও।'

'তোমার কোনো শত্রু নেই বেটি।'

'সত্যিই তোমার কোনো তুলনা হয় না, রবার্ট। কিন্তু ওরা আমাকে কন সত্যি কথাটা বললো না? জানলে আমি নিশ্চয়ই সহ্য করতে পারতুম। কিন্তু এই না জানতে পারাটা আরও খারাপ।'

চোরা চোখে আমি ডাক্তার গ্রাফেনহেইমের দিকে তাকালাম, যিনি উলটো দিকের একটা কুর্সিতে বসে মন দিয়ে কি যেন পড়ছিলেন। সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গিতে আমি বললাম, 'ওঁরা তোমাকে সবই সত্যি কথাই বলেছেন বেটি। মিছিমিছি খারাপ কিছুতে বিশ্বাস করার তোমার কোনো দরকার নেই।'

শিশুর মতো অনাবিল হাসিতে ভরে উঠলো ওর সারা মুখ। 'সত্যিটা জানতে পারলে আমি সেই ভাবে নিজেকে প্রস্তুত করে তুলতে পারতুম। ভালো আছি জানতে পারলে, সবার সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে মেলামেশা করতে পারতুম। কিন্তু আমার জীবনে বিপদ ঘনিয়ে আসছে জানলে আমি তার সঙ্গে পাগলের মতো লড়াই চালিয়ে যেতুম। জীবনে সংগ্রাম কি জিনিস আমি জানি। এত সহজে হাল ছেড়ে দেবার পাত্রী আমি নই। কি বলতে চাইছি তুমি বুঝতে পেরেছো?'

'নিশ্চয়ই। তোমার মধ্যে এমন কোনো জটিলতা বা কপটতা নেই যে কেউ বুঝতে পারবে না। তবে ডাক্তার গ্রাফেনহেইম যদি বলেন যে তুমি ঠিক আছো, তাহলে তোমার তাঁকে বিশ্বাস করা উচিত। উনি মিছিমিছি তোমাকে কেন মিথ্যে কথা বলতে যাবেন বলো?'

'যেহেতু ডাক্তাররা কখনও সত্যি কথা বলেন না, তাই।'

'কিন্তু তিনি যদি তোমার দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হন?'

'তাহলে তো আদৌ সত্যি কথা বলবে না।'

বেটি স্টেইনের মুখখানা এখনও অবুঝ কিশোরীর মতো কোমল, কেবল ওর অশান্ত ছুটো চোখের মণিতেই যা ফুটে উঠেছে এক টুকরো ম্লান যন্ত্রণা, যাকিছু উদ্বিগ্নতা। প্রতিনিয়তই কেউ না কেউ এসে ওর সঙ্গে কথা বলছে, হাসি-ঠাট্টা করছে, ওকে অন্যমনস্ক করে দেওয়ার চেষ্টা করছে আর বেটি স্টেইন কিশোরী-সুলভ চপলতায় ওদের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার ওর মনে ঘনিয়ে উঠছে সন্দেহের ছায়া। প্রায় প্রতিদিনই বার্লিনে বোমাবর্ষণের খবর ওকে সব চাইতে বেশি উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। হাসপাতালে থাকার সময়েই ডাক্তার গ্রাফেনহেইম কড়া নির্দেশ দিয়েছিলেন যাতে ও খবরের কাগজ দেখার কোনো সুযোগ না পায়। কিন্তু তাতে কোনো লাভ হয়নি। পরের দিনই বেতার যন্ত্রের সামনে বসে বেটি স্টেইনকে অঝরে কাঁদতে দেখা গেলো। বার্লিন সম্পর্কে ওর ভাবনাটা দ্বিমুখীন। ফ্যাসিস্টরা যখন ওর পরিবারের বহু আত্মীয়-স্বজনকে গুলি করে মেরেছিলো, বার্লিনের সেই ঘৃণায় মেশা দুঃস্বপ্নের স্মৃতিকে ও ভুলতে চেয়েছিলো অন্যান্য উদ্বাস্তুদের সাথে, কিন্তু এখন আবার ওর বহু সাধের সেই বার্লিনকে আমেরিকান বোমায় বিধ্বস্ত হতে শুনে বেটি মনে মনে ক্ষত-বিক্ষত করছে নিজেকেই। অথচ সমস্ত ব্যাপারটাই এমন পরস্পর বিরোধী যে ও কাউকে স্পষ্ট করে বুঝিয়ে বলতে পারছে না।

'তারপর রবার্ট, তোমার খবর কি বলো?'

'ভালো বেটি, সত্যিই খুব ভালো।'

'শুনে খুব খুশি হলুম। কিন্তু রবার্ট, বার্লিনের অলিভেয়ার প্লাতস্-এ

ওরা বোমাবর্ষণ করছে, তুমি জানো ?'

'জানি বেটি, সারা শহরেই ওরা বোমা ফেলছে।'

'কিন্তু অলিভেয়ার প্লাৎস্-এ আমরা থাকতাম। বার্লিনের মতো অমন সুন্দর পুরনো একটা শহর...'

'বার্লিন কি সত্যি সুন্দর বেটি,' চোখে চোখ রেখে অত্যন্ত সন্তর্পণেই আমি প্রশ্ন করলাম, 'অন্তত পারি কিংবা রোমের তুলনায় ? অবশ্য আমি স্থাপত্য রীতির দিক থেকেই বলছি।'

'আচ্ছা রবার্ট, তোমার কি মনে হয় বার্লিনকে না দেখা পর্যন্ত আমি বেঁচে থাকতে পারবো ?'

'নিশ্চয়ই। কেন নয় ?'

'না দেখতে পেলে ব্যাপারটা সত্যিই খুব দুঃখের হবে, রবার্ট। কেননা দীর্ঘ কয়েকটা বছর আমি অপেক্ষা করে থেকেছি শুধু ওর জন্যেই।'

'হয়তো আমাদের স্বপ্নের বার্লিনের সঙ্গে বর্তমান বার্লিনের কোনো মিল থাকবে না, তবু তুমি তাকে নিশ্চয়ই দেখতে পাবে, বেটি।'

নতুন কয়েকজন অতিথি এসে পড়ায় আমি বসার ঘরে ফিরে এলাম। দেখলাম টেনেনবাম চেয়ারে বসে লম্বা একটা কাগজে কি যেন লিখছে, কান পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে সিগারেট ফুঁকছে।

আমাকে দেখে টেনেনবাম হাসতে হাসতে বললো, 'এটা আমার রক্তের ঋণ শোধ করার তালিকা।'

'ঠিক বুঝলাম না।'

'যেসব জার্মানদের গুলি করে মারা উচিত, এটা তারই একটা তালিকা।'

গলগল করে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে কান আপাঙ্গে শুধু একবার তাকালো, কোনো কথা বললো না।

সউৎসাহেই টেনেনবাম বলে চললো, 'তালিকাটা অবশ্য এখনও সম্পূর্ণ হয়নি, এতে আরও অনেক নাম যোগ হবে।'

'কারা কারা সেই নাম দেবে ?' নির্লিপ্ত গলায় কান জানতে চাইলো।

'সবারই নাম দেওয়ার অধিকার আছে।'

'কারা কারা তাদের গুলি করে মারবে?'

'ছোট একটা সমিতি। আমরাই সেই সমিতিটা গঠন করবো।'

'তুমি কি হবে সেই দলের পাণ্ডা?'

টেনেনবাম মুহূর্তের জন্যে চুপ করে থেকে কি যেন ভাবলো। 'হ্যাঁ, সবাই মিলে যদি আমাকে নির্বাচন করে, নিশ্চয়ই হবো।'

'তাহলে আমার ছোট্ট একটা অভিভাবন আছে,' কিছুটা রূঢ় স্বরেই কান বললো। 'তালিকার প্রথম মানুষটাকে তুমি গুলি করে মারবে, বাকিগুলোর দায়িত্ব আমার।'

নীরবতার মুহূর্তে ডাক্তার গ্রাফেনহেইম আর রাভিক উৎসুক চোখে তাকিয়ে রইলো টেনেনবামের দিকে। কান বললো, 'তুমি বলতে কিন্তু অজানা সমিতির অন্য কাউকে দিয়ে নয়, তোমাকে নিজে হাতে গুলি করে মারতে হবে। কি, রাজি আছো?'

টেনেনবাম কোনো জবাব দিলো না।

'ভাগ্য ভালো যে তুমি কোনো জবাব দাওনি,' ছাইদানীর মধ্যে কান জ্বলন্ত সিগারেটটা গুঁজে দিলো। 'নইলে এক ঘুঁষিতে তোমার চোয়াল আমি গুঁড়িয়ে দিতাম। বৈঠকখানায় বসে বসে অমন রক্তক্ষয়ী বিপ্লব সবাই করতে পারে। এসব না করে তার চেয়ে বরং সিনেমার পেছনে লেগে থাকো অনেক বেশি লাভ হবে।'

কোনো দিকে না তাকিয়ে কান বেটির সঙ্গে দেখা করার জন্যে ভেতরে চলে গেলো। ওর গমন পথের দিকে তাকিয়ে টেনেনবাম চাপা স্বরে বললো, 'ওর মেজাজটাও ঠিক নাৎসিদের মতো।'

ডাক্তার গ্রাফেনহেইম আর আমি এক সঙ্গেই ফিরছিলাম, উনি বললেন, 'যদি অসুবিধে না থাকে, চলো আমার বাসাটা একবার দেখে আসবে।'

সানন্দেই আমি ওঁর আমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম, কেননা সেই মুহূর্তে আমার তেমন কিছু করার ছিলো না।

সম্প্রতি উনি নিউ ইয়র্কে বাস করছেন এবং একটা সরকারী হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। এর জন্যে উনি মাসিক ষাট ডলার পারিশ্রমিক পান, বিনা পয়সায় ভালো একটা বাসাও পেয়েছেন।

হাঁটতে হাঁটতেই আমি এক সময়ে জিগেস করলাম, 'বেটির সত্যিকারের খবর কি বলুন তো ?'

গ্রাফেনহেইম ইতস্তত করলেন। ওঁকে বিব্রত বোধ করতে দেখে আমি নিজেই লজ্জা পেলাম। 'অবশ্য যদি তেমন আপত্তি থাকে···'

'না না, আপত্তি ঠিক নয়। অস্ত্রোপচার করার জন্যে আমরা ওকে নিয়ে গিয়েছিলাম এবং করেও ছিলাম, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার সেলাই করে ফেরোত পাঠাতে হয়েছে।'

'আপনার কি মনে হয় আর বেশি দিন বাঁচবে না ?'

'না।'

বেটির জন্যে মনটা সত্যিই খুব খারাপ হয়ে গেলো। সারা পথে আর একটাও কথা বলতে পারলাম না।

হাসপাতাল সুসংলগ্ন ডাক্তার গ্রাফেনহেইমের ঘরখানা ছোট হলেও বেশ ছিমছাম। আসবাবপত্রের কোনো বালাই নেই, কিন্তু সবার আগে যেটা চোখে পড়ে—তা হলো শৌখিন মাছ রাখার বেশ বড় একটা কাঁচের আধার। আমাকে অবাক হয়ে আধারটার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে ডাক্তার হাসতে হাসতে বললেন, 'এটা আমার খুব ছোটবেলাকার শখ। চুপচাপ একা বসে রঙিন মাছগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে আমার সত্যি খুব ভালো লাগে। বার্লিনে আমার বৈঠকখানাতেও বেশ কয়েকটা বড় বড় অ্যাকুইরিয়াম ছিলো।'

'যুদ্ধ শেষ হলে আপনি কি আবার বার্লিনে ফিরে যাবেন ?'

'হ্যাঁ। আমার স্ত্রী এখনও ওখানে রয়েছে।'

ওঁর কাছ থেকে কোনো খবর পেয়েছেন ?'

'না। আমরা অঙ্গীকার করেছিলাম কেউ কাউকে চিঠি লিখবো না। কেননা প্রতিটা চিঠিই ওরা খুলে ছাখে। আমার মনে হয় ও কোনো

রকমে বার্লিনের বাইরে চলে যেতে পেরেছে। নাকি তোমার মনে হয় ওরা ওকে বন্দী করে রেখেছে ?'

'না না, ওরা ওঁকে বন্দী করতে যাবে কেন ?'

'কাউকে বন্দী করে রাখার জন্যে কি কোনো কারণের দরকার হয় ?'

'হ্যাঁ, একদিক থেকে অবশ্য আপনার কথাই ঠিক।'

'এত সুদীর্ঘ দিন অপেক্ষা করে থাকাটা সত্যিই খুব কঠিন।' ডাক্তার গ্রাফেনহেইমের মতো সংযত চরিত্রের মানুষকেও কেমন যেন বিষণ্ণ মনে হলো।' তোমার কি মনে হয় ওরা ওকে গ্রামে যেতে দিয়েছে. মানে এমন কোনো জায়গায় যেখানে বোমাবর্ষণ করবে না ?'

'আমার তো তাই মনে হয়।'

নিয়তির নির্মম পরিহাস আমাদের কাউকেই এত সহজে ছেড়ে দেয়নি। ডাক্তার গ্রাফেনহেইম বেটি স্টেইনের সঙ্গে ছলনা করেছেন, আমি ছলনা করছি ডাক্তার গ্রাফেনহেইমের সঙ্গে।

'এখানে এই হাত-পা বাঁধা অবস্থায় চুপচাপ বসে থাকাটাই আমার জীবনে সবচেয়ে মর্মান্তিক ঘটনা, বুঝতে পারছি সব, অথচ কিছুই করতে পারছি না।'

'হ্যাঁ, অসহায়ের মতো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আমাদের আর কিছুই করার নেই।' সমর্থনের ভঙ্গিতে আমি বললাম। 'এই যে আমরা এখানে কিছু করি না, এর জন্যে অনেকেই আমাদের হিংসে করে। কিন্তু এখানে যে আমাদের কিছু করতে দেওয়া হয় না, সে কথা ওরা একবারও ভেবে দেখে না। এমন কি আমাদের জন্যে যারা লড়াই করছে তারাও চায় না আমরা ওদের সাহায্য করি। এদের কাছে আজ আমরা অবাঞ্ছিত, আমাদের অস্তিত্ব এদের কাছে ছায়ার মতো।'

'ফ্রান্সে ওরা অবশ্য আমাদের বিদেশী সৈন্যবাহিনীকে স্বেচ্ছায় সাহায্য করার সুযোগ দিতো।'

আমি ডাক্তার গ্রাফেনহেইমের দিকে তাকিয়ে হাসলাম। 'সেক্ষেত্রে আপনি কিছুতেই চাইবেন না জার্মান সৈন্যদের গুলি করে মারতে।'

'নিশ্চয়ই না। এবং সত্যি বলতে কি, আমি কাউকেই গুলি করতে চাই না।'

'কিন্তু অনেক সময়েই সবকিছু আমাদের ইচ্ছে অনিচ্ছের ওপরে নির্ভর করে না। তখন আমাদের বাধ্য হয়েই কাউকে না কাউকে গুলি করে মারতে হয়।'

'সত্যিই যদি কাউকে গুলি মারতে হয় তো সে নিজেদেরকে। আমরা এমনই অপদার্থ যে কেউ আমাদের বিশ্বাস করে না, এমন কি আমাদের ঘৃণাকেও না।'

'এই ঘর, আলো, আসবাবপত্র, শয্যা—প্রতিবারেই আমার কেমন যেন নতুন মনে হয়। মনে হয় আমি যেন রবিনসন ক্রুশো, আর যখনই এখানে আসি বালিতে খুঁজে পাই শুক্রবারের পায়ের চিহ্ন। তুমিই আমার সেই শুক্রবারের নারী। আমার প্রথম নারী।'

নাতাশা অবাক চোখে আমার মুখের দিকে তাকালো। 'তুমি কি আজ নতুন কিছু পান করে এসেছো নাকি?'

'না, শুধু এক পেয়ালা কফি আর কিছু বিষণ্ণতা।'

'তুমি বিষণ্ণ, রবার্ট?'

'আমাদের মতো মানুষ জীবনে খুব বেশিক্ষণ বিষণ্ণ থাকতে পারে না, নাতাশা। আমাদের জীবনে বিষণ্ণতা থাকে কুয়াশার ভারি পরদার মতো পেছনে, যার ধূসর পটভূমিতে জীবনের আনন্দকে খুব স্পষ্টই অনুভব করা যায়। কখনও কখনও আমাদের বিষণ্ণতা উপলের মতো ডুবে থাকে হৃদয়ের অতল গহনে, ওপর থেকে যার কোনো চিহ্নই চোখে পড়ে না। আমি হয়তো তোমাকে ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারছি না...'

'আমাকে আর কিচ্ছু বুঝিয়ে বলতে হবে না। তুমি কি ভাবো আমার জীবনটা সোনা দিয়ে বাঁধানো?'

'নিশ্চয়ই না। সেই জন্যেই তো তোমাকে আমার এত ভালো লাগে।'

আমি উঠে গিয়ে খোলা জানলার সামনে দাঁড়ালাম। গ্রীষ্ম যে বিদায় নিয়েছে সেটা স্পষ্টই বোঝা যায়। শহরের ওপার থেকে ঝিরঝিরে মিষ্টি একটা বাতাস বয়ে আসছে। বিদায় সূর্যের শেষ রক্তিম আভাটুকুও মিলিয়ে গেছে দিগন্তের গায়ে।

কখন যে এসে নাতাশা আমার পাশটিতে চুপটি করে দাঁড়িয়েছিলো আমি টের পাইনি। সুদূর অন্ধকারের দিকে আমাকে নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে থাকতে দেখে ও বললো, 'তুমি কি এখানে আমাকে একলা ফেলে রেখে দেশে ফেরার কথা ভাবছো, রবার্ট?'

'এখনও যুদ্ধ থামেনি, সুতরাং দেশে ফেরার কোনো প্রশ্ন ওঠে না, নাতাশা। তাছাড়া এই মুহূর্তে তোমাকে ছেড়ে যাওয়ার কথা আমি ভাবতেই পারছি না।'

'সত্যিই!' দুর্লভ চুনীর মতো নাতাশার চোখের মণিছুটো খুশিতে ঝিকিয়ে উঠলো।

ছুহাতে ওর মুখটাকে আমার দিকে ফিরিয়ে চুমু দিলাম। 'সত্যিই, তুমি বিশ্বাস করো।'

নাতাশা বললো, 'আজকের সন্ধ্যেটা সত্যিই ভারি সুন্দর। চলো, বাইরে থেকে একটু বেড়িয়ে আসি।'

'সেই ভালো।'

আমরা ছুজনে নিচে এলাম। ডানদিকে মোড় নিতেই পত্রিকা স্টলের সেই ছোকরাটি নাতাশাকে দেখে হাত নাড়লো। 'গ্রীষ্ম শেষ হয়ে গেছে, ম্যাডাম।'

'ধন্যবাদ, এডি।' হাসি হাসি মুখে নাতাশা জবাব দিলো।

আমি বললাম, 'ফিরে আসতেও আবার খুব একটা বেশি সময় লাগবে না।'

'কিন্তু ছুঃখ ছাড়া সত্যি করে আর কিছুই ফিরে আসে না, স্যার।'

প্রতিবেশীদের এই ধরণের সরল মন্তব্য আমাকে বরাবরই মুগ্ধ করে, কেননা এদের জীবনে গোপন করার মতো কিছু নেই। তাছাড়া আমাদের

মতো উদ্বাস্তুদের এরা কখনও অশ্রদ্ধার চোখে দেখে না, অন্তত আর কিছু না হোক কখনও শিকারী হায়নার মতো আমাদের পেছনে ছায়ার মতো ঘুরে বেড়ায় না।

পঞ্চম সরণী ধরে সেরি-নেদারল্যাণ্ড অতিক্রম করে আমরা সেণ্ট্রাল পার্কের দিকে এগিয়ে গেলাম। যানবাহনের যান্ত্রিক শব্দের ফাঁকে ফাঁকেই শোনা যাচ্ছে সিংহের জলদমন্দ্রিত গর্জন। হিমেল হাওয়ায় পার্কের দীঘল গাছগুলো ঝরিয়ে দিচ্ছে তাদের শুকনো পাতা। পাতা ঝরার পালার শুরুর অংশটুকু সত্যিই খুব বিষণ্ণ।

ছায়া-ছায়া তরু-বীথির মধ্যে দিয়ে আমরা অনেকক্ষণ ধরে ঘুরে বেড়ালাম।

ফেরার সময় রাজপথের দুধারে সারি সারি আলোকিত দোকানের কাঁচের জানলায় সাজানো গরম পোশাকের দিকে নির্দেশ করে নাতাশা বললো, 'এগুলো আমার কাছে অতীত ইতিহাসের মতো কেমন যেন মৃত মনে হয়। গত জুনে আমরা এইসব পোশাকের মডেলিং করেছিলাম। আগামী কাল থেকে আবার গ্রীষ্মের পোশাকের মডেলিং শুরু হবে। বরাবর এই একটা করে ঋতু এগিয়ে থাকার জন্যেই আমার মনে হয় জীবনটা যেন দ্রুত ছুটে চলেছে। অন্যেরা যখন গ্রীষ্মের উত্তাপ গায়ে মেখে ঘোরে, আমি তখন রক্তে অনুভব করি শীতের শৈত্য।'

'তুমি হচ্ছো ঋতুদের অগ্রদূত!' একপাশ থেকে নাতাশাকে কাছে টেনে নিয়ে চুমু দিলাম। 'সত্যি, এই মুহূর্তে তোমাকে আমার তুর্গেনিভ কিংবা ফ্লবেয়ারের কোনো নায়িকার মতো মনে হচ্ছে, মনে হচ্ছে তোমার ধমনীর প্রতিটা রক্তস্রোতে তুমি বহন করে নিয়ে চলেছো শীতের এক দারুণ তুষার ঝড়।'

নাতাশা বড় বড় চোখ মেলে তাকালো আমার দিকে। 'আর তুমি?'

'আমি? আমি কিছুই না নাতাশা। বড় জোর বলতে পারো চিমনির কালো একটা ধোঁয়ার রেখা, আমেরিকায় অন্যান্য ঋতুদের সম্পর্কে যার সামান্যতমও কোনো ধারণা নেই।'

বিয়াল্লিশতম সরণী থেকে পূবে বাঁক নিয়ে আমরা আবার দ্বিতীয় এভিনিউতে ফিরে এলাম। এখানে লোক চলাচল খুব কম। রাস্তাটাও মনে হচ্ছে যেন ঝিমিয়ে পড়েছে। নিঃসঙ্গ, আলোকিত কাঁচের জানলায় সাজানো পুরাতত্ত্বের নিদর্শনগুলোর দিকে তাকিয়ে আমি বললাম, 'দোকানের ওই মূর্তিগুলো শীত গ্রীষ্ম কি কিছুই জানে না। একটা শতাব্দী ওদের কাছে ঠিক অন্য একটা শতাব্দীরই মতো। উনবিংশ শতাব্দীর বাতিদানগুলো বিংশ শতাব্দীর বিদ্যুতের সঙ্গে ভাব জমিয়ে নিয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর আয়নায় প্রতিফলিত হচ্ছে বর্তমান কালের আলোক। আমরাও যদি ওদের মতো নির্লিপ্ত, উদাসীন থাকতে পারতাম, তাহলে আমাদের জীবনে উদ্বিগ্নতা বলে কিছু থাকতো না।'

'তুমি কি আজ রাত্তিরে আমার ওখানে থাকবে ?' কেন জানি না অধৈর্য হয়েই নাতাশা প্রশ্ন করলো।

'হ্যাঁ, যদি তোমার আপত্তি না থাকে।'

'আজ রাত্তিরে একা থাকতে আমার সত্যিই খুব খারাপ লাগবে।'

'আমারও খারাপ লাগবে, নাতাশা।'

'তাহলে চলো তাড়াতাড়ি। আয়নার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আমরা প্রেম করবো আর ঝড়ের শব্দ শুনবো। তখন তুমি আমাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে ফ্লোরেন্স, পারি, ভেনিস আর সেইসব জায়গায় গল্প বলবে যেখানে আমরা দুজনে কখনও একসঙ্গে যেতে পারবো না।'

'ফ্লোরেন্স বা ভেনিসে আমি কোনোদিনই যাইনি, নাতাশা।'

'তাতে কিছু এসে যায় না। তুমি যা জানো তাই-ই বলবে। হয়তো আমি কাঁদবো, হয়তো তখন আমাকে ভীষণ বিশ্রী দেখাবে। তবু আমি কাঁদবো, কেননা অন্যান্য মেয়েদের মতো আমি একটুও কাঁদতে পারি না। আমার মনের মধ্যে যে কত গ্লানি জমে আছে তুমি ভাবতেও পারবে না। কাঁদতে পারলে হয়তো একটু হালকা হওয়া যাবে। তখন তুমি আমাকে সহ্য করতে পারবে না, রবার্ট ?'

'পারবো, নাতাশা।'

'তাহলে তাড়াতাড়ি চলো, আর একটুও দেরি কোরো না।'

## চোদ্দ

'তোমার জন্যে একটা দারুণ খবর আছে,' আমাকে দেখেই সিলভারস বলে উঠলেন। 'আমরা পশ্চিমে যাচ্ছি—হলিউড অভিযানে। কি, খবরটা তোমার কাছে কেমন মনে হচ্ছে?'

'অভিনেতা হিসেবে?'

'না, ছবি বিক্রেতা হিসেবে। ভেবেছিলাম অনেকদিন আগেই, এখন যাওয়ার ব্যাপারটা এক রকম পাকাই করে ফেলেছি।'

'আমাকেও কি সঙ্গে নিয়ে যেতে চান?'

'হ্যাঁ, তোমাকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই,' ভারিক্কি চালে সিলভারস বললেন। 'ছবির ব্যবসাটা তুমি বেশ ভালোই শিখতে পেরেছো। ওখানে তোমার সাহায্যের আমার বিশেষ প্রয়োজন হবে।'

'কবে যাওয়ার কথা ভেবেছেন?'

'ধরো সপ্তা দুয়েকের মধ্যে। তাতে সবকিছু গোছগাছ করে নেওয়ার খানিকটা সময় পাওয়া যাবে।'

'কতদিনের জন্যে?'

'আপাতত দু সপ্তার কথাই ভেবেছি। অবস্থার পরিপেক্ষিতে হয়তো আরও কয়েকদিন বেড়েও যেতে পারে। আসলে কি জানো, লস অ্যাঞ্জেলসের মাটি এখনও সোনা দিয়ে বাঁধানো।'

সোনা দিয়ে বাঁধানো হোক কিংবা খনি থেকে তাল তাল সোনা উঠুক, তাতে আমার কিছুই এসে যায় না। কেননা লাভের যাকিছু অংশ সিলভারসেরই পকেটে যাবে আর ওখানকার ঠাট বজায় রাখতে গিয়ে আমার অবস্থা হয়ে উঠবে কাহিল। তাছাড়া ক্যালিফোর্নিয়ায় আমি কাউকে চিনি না, নাতাশাকে ফেলে নিউ ইয়র্ক ছেড়ে অন্য কোথাও যাবার ইচ্ছেও আমার নেই।

'কি ব্যাপার', আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে সিলভারস প্রায় ধমকে উঠলেন, 'তোমার যদি যাবার ইচ্ছে না থাকে যেও না। তবে অন্য কেউ হলে নিশ্চয়ই খুশিতে লাফিয়ে উঠতো।'

'আমরা কোথায় থাকবো ?'

'আমি থাকবো বেভারলি হিলস্ হোটেলে, তুমি থাকবে গার্ডেন অফ আল্লায়।'

'বাঃ, নামটা ভারি সুন্দর তো, অনেকটা শুনতে ঠিক রুদলফ ভ্যালেন-তিনোর মতো! কিন্তু আমরা দুজনে তাহলে এক হোটেলে থাকছি না ?'

'না। ওখানকার হোটেলের খরচ বড্ড বেশি। তবে আমি শুনেছি গার্ডেন অফ আল্লা জায়গাটা বেশ ভালো আর বেভারলি হিলস্ হোটেলটা ওখান থেকে খুব কাছেই।'

'কিন্তু হোটেলে আমার থাকা খাওয়ার জন্যে খরচের ব্যাপারটা…'

'ওসব দায়িত্ব আমার, ও নিয়ে তোমায় মাথা ঘামাতে হবে না। তাহলে আমার সঙ্গে যেতে তোমার কোনো আপত্তি নেই তো ?'

'না, তবে তার আগে আমার কয়েকটা জিনিস জানা দরকার।'

'বললাম তো সব দায়িত্ব আমার। এর পর তোমার আবার কি জানার থাকতে পারে ?'

'মাইনে না বাড়লে আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়।'

'কত ?'

'মাসে একশো ডলার।'

'অসম্ভব!' সিলভারস এমন ভাবে লাফিয়ে উঠলেন যেন কোনো বিষাক্ত পোকা ওঁকে কামড়ে দিয়েছে। 'কি ব্যাপার, আজ তোমার কি হয়েছে বলো তো ?'

'কিছু না। মিস্টার সিলভারসের সহকারীর উপযুক্ত পোশাক আমার নেই। তাছাড়া একটা ডিনার জ্যাকেটও কেনা দরকার।'

'হলিউডে এমন কোনো নৈশক্লাবে আমরা যাচ্ছি না যে তোমার ডিনার জ্যাকেটের দরকার।'

'কিন্তু হলিউডে ছবি বিক্রি করতে গেলে আমাদের নৈশক্লাবগুলোতেই হানা দিতে হবে, কেননা কোটিপতিদের হৃদয় গলাতে গেলে ওর চাইতে ভালো জায়গা আর কোথাও নেই।'

'আমাকে আর ব্যবসা শিখিও না, বুঝলে ?' সিলভারস রীতিমতো চটে উঠলেন। 'তোমার যদি জামা-কাপড়ের দরকার থাকে, আমার কাছ থেকে কিছু আগাম নিতে পারো।'

'এখানের জন্যে কোনো দরকার নেই, কিন্তু মাইনে না বাড়ালে ওখানে যাওয়া আমার পক্ষে সত্যিই সম্ভব নয়।'

'খুব বেশি হলে পঁচিশ ডলার বাড়াতে পারি।'

'একশো ডলার।'

'ভুলে যেও না রস, অবৈধ ভাবেই আমি তোমাকে এখানে চাকরি দিয়েছি। এবং এর জন্যে আমাকে যে কত বড় ঝুঁকি নিতে হয়েছে তুমি ভাবতেও পারবে না।'

'ঝুঁকি নেওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না,' মানের আঁকা পপি ফুলের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটির ওপর চোখ রেখে আমি নিরুত্তাপ গলায় বললাম। 'আমার অস্থায়ী ভাবে বসবাসের সময়সীমা ওঁরা তিন মাসের জন্যে বাড়িয়ে দিয়েছেন। এবং স্বাভাবিক ভাবেই ধরে নিচ্ছি পরের বারে সময় সীমা বাড়াতে ওঁদের কোনো অসুবিধে হবে না। সুতরাং বৈধ ভাবে না হলেও, অবৈধ ভাবে কাজ করার আমার কোথাও কোনো অসুবিধে নেই।'

'তার মানে তুমি কি অন্য কোথাও কাজের কথা ভাবছো ?'

'আদৌ না। আপনার এখানে আমি বেশ ভালোই আছি।'

আধ পোড়া চুরুটটা নতুন করে ধরিয়ে নিয়ে সিলভারস কি যেন ভাবলেন। শেষ পর্যন্ত পঁচাত্তর ডলার বাড়াতে রাজি হলেন। আমি স্বপ্নেও ভাবিনি উনি এত সহজে রাজি হয়ে যাবেন।

'তুমি ভুলে যেও না রস, এখানে আমিই তোমাকে প্রথম কাজের সুযোগ দিয়েছিলাম।' জ্বলন্ত চুরুটের শেষ অংশটুকু ছাইদানীর মধ্যে গুঁজে

দিয়ে সিলভারস উঠে দাঁড়ালেন। 'জামা-কাপড়ের জন্যে তুমি কিছু আগাম নিতে পারো, কিন্তু ডিনার জ্যাকেট কেনার কোনো দরকার নেই। প্রয়োজন থাকলে তুমি কয়েক দিনের জন্যে একটা ভাড়া করে নিতে পারো।'

ইতিমধ্যে বেটি স্টেইন জেনে ফেলেছে যে ওর ক্যান্সার হয়েছে। কেউ ওকে বলেনি, বরং সবাই আপ্রাণ চেষ্টা করেছে যাতে ও ঘূর্ণাক্ষরেও কিছু জানতে না পারে। কিন্তু বেটি আভাসে-ইঙ্গিতে ঠিকই বুঝতে পেরেছে। এবং বুঝতে পারার পর থেকে ভেঙে পড়া বা আত্ম-সমর্পণ করা তো দূরের কথা, প্রতিটা দিন বাঁচার জন্যে ও বীরের মতো সংগ্রাম করে চলেছে। মরতে ও চায় না। যতদিন সন্দেহের মধ্যে ছিলো, মৃত্যু ওত পেতে ছিলো ওর শয্যার পাশে। কিন্তু এখন ওর দুর্জয় ইচ্ছাশক্তির জোরে মৃত্যুকে সরে দাঁড়াতে হয়েছে গোপন অন্তরালে। ওর জন্মভূমি বার্লিন, ওর সাধের অলিভার প্লাৎস্-এ ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত বেটি স্টেইন যেমন করে হোক নিজেকে টিকিয়ে রাখবেই।

প্রতিদিন ব্যাকুল আগ্রহ নিয়ে ও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খবরের কাগজ পড়ে, শয্যার পাশের দেওয়ালে টাঙিয়ে রেখেছে জার্মানীর বেশ বড় একটা মানচিত্র। সকালের খবর পড়া শেষ হলেই রঙিন পেনসিল দিয়ে রাঙিয়ে রাখে প্রতিবেশী সৈন্যবাহিনীর অগ্রগতি। তৃতীয় রাইখের অবস্থা যতই মুমূর্ষু হয়ে আসছে, বেটি স্টেইনের বাঁচার দুর্জয় বাসনা ততই তীব্র হয়ে উঠছে।

বরাবরই বেটির হৃদয় আশ্চর্য কোমল। আশেপাশের পরিচিত কোনো মুখই ও যেমন অসুখী দেখতে রাজি নয়, তেমনি জার্মান জনগণের দুঃখ-দুর্দশা, তাদের মৃত্যুও ওর হৃদয়কে জমাট, হিমেল করে তোলে। যখনই শুনতে পায় কচি কচি কিশোরদের উর্দি পরিয়ে যুদ্ধে পাঠানো হচ্ছে, আতংক-বিহ্বল ধূসর চোখদুটো ওর অন্ধকার রাতে মা-পেঁচার সতর্ক চোখের মতো তীব্র জ্বলে ওঠে। প্রায়ই ও আক্ষেপ করে বলে জার্মানরা এখনও কেন আত্মসমর্পণ করছে না। নিজেদের জন্যে যদি নাও হয়, অন্তত ওর জন্যেও তো ওরা আত্মসমর্পণ করতে পারে! তাতে আর

কিছু না হোক, বার্লিনকে বাঁচানো যেতো। কথাটা অবশ্য এক দিক থেকে মিথ্যে নয়—এই মুহূর্তে বার্লিন ছাড়া জার্মানীর আর কোথাও কোনো অস্তিত্ব নেই।

'কতদিনের জন্যে তোমাকে বাইরে যেতে হবে, রবার্ট?' বেটি জিগেস করলো।

'এখনও ঠিক জানি না। তবে সপ্তা দুয়েক, কিংবা তার চাইতে একটু বেশিও হতে পারে।'

'তোমার সঙ্গে হয়তো আমার আর দেখা হবে না।'

'না না, ও কথা বোলো না, বেটি। তুমি আমার শুভ দেবদূত।'

'হ্যাঁ, পেটে ক্যান্সার নিয়ে শুয়ে থাকা এক শুভ দেবদূত।'

'তোমার ক্যান্সার হয়নি, বেটি।'

'হয়েছে আমি জানি,' আমার কানের কাছে মুখ এনে ও ফিসফিসিয়ে বললো। 'রাত্তিরে আমি স্পষ্ট বুঝতে পারি। তুঁতগাছের পাতায় রেশমের গুটির মধ্যে পোকাগুলো যেমন অস্পষ্ট নড়াচড়া করে, আমি তেমনি স্পষ্ট ওদের কুরে কুরে খাওয়ার শব্দ শুনতে পাই। আমি ইচ্ছে করেই দিনে পাঁচ-বার খাই যাতে সহজে দুর্বল না হয়ে পড়ি। তোমার কি মনে আমাকে খুব খারাপ দেখাচ্ছে?'

'একটুও না।'

'তাহলে বার্লিনে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত টিঁকে থাকতে পারবো বলে তোমার মনে হয়?'

'নিশ্চয়ই, কেন নয়?'

অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বেটি কি যেন খোঁজার চেষ্টা করলো। 'তোমার কি মনে হয় ওরা আমাদের ঢুকতে দেবে?'

'কারা? জার্মানরা?'

'হুঁ। গতকাল রাত্তিরেই আমি ভাবছিলাম—সীমান্তে ওরা হয়তো আমাদের গ্রেফতার করে কোনো না কোনো শিবিরে পাঠিয়ে দেবে।'

'অসম্ভব বেটি। ওরা আর কোনো আদেশ দিতে পারবে না। ওখানে

এখন আমেরিকান, বৃটিশ আর রাশিয়ান সৈন্যে একেবারে ছেয়ে গেছে প্রয়োজন হলে হয়তো ওরা কোনো আদেশ দিতে পারে।'

মুহূর্তের জন্যে বেটি চুপ করে রইলো। 'কিন্তু রাশিয়ানদেরও তে শাস্তিশিবির রয়েছে? বলা যায় না, হয়তো বার্লিনেও ওদের ও রকম কোনে শাস্তিশিবির থাকতে পারে, কিংবা আমাদের সাইবেরিয়ায় পাঠিয়ে দিে পারে।'

'ওসব কথা এখনই ভেবে কোনো লাভ নেই, বেটি। যু না থাম পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করা উচিত। তখন হয়তো দেখা যাবে আমরা য ভাবছি, পরিস্থিতি তার চাইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম হয়ে গেছে।'

বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টির ছাঁট আছড়ে পড়লো জানলার সার্সিতে, ঘরট আরও অন্ধকার হয়ে উঠলো। বেটি উদ্বিগ্ন চোখে তাকালো আমার মুখে দিকে।

'আচ্ছা রবার্ট, তোমার কি মনে হয় বার্লিন অধিকার করে নেওয়া পরেও যুদ্ধ চলবে?'

মনে মনে আমি সতর্ক না হয়ে পারলাম না, কেননা আমি জা আমার এই জবাবের সঙ্গে বেটি স্টেইনের জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন জড়ি রয়েছে। আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে বেটি নিজেই ভর্ৎসনার সু বললো, 'তুমিও দেখছি ঠিক কানের মতো। অবশ্য দোষটা আমারই— কারা জিতলো কারা হারলো তার কথা না ভেবে আমি কেবল অলিভা প্লাৎজ্‌ টিঁকে রইলো কিনা তার কথাই চিন্তা করছি।'

'নিশ্চয়ই বেটি, এমনটা ভাবার তোমার যথেষ্ট অধিকার আছে জীবনে তুমি তো আর কম সংগ্রাম করোনি। এখন তুমি যদি কেব অলিভার প্লাৎজের কথা ভাবো, তাতে কোনো অন্যায় হবে না।'

'আমি জানি, কিন্তু সবাই এমন ভাবে···'

'ওদের কারুর কথা শুনো না, বেটি। আমাদের উদ্বাস্তু বন্ধুরা সবা এক একজন বৈঠকখানার জাঁদলের সেনাধ্যক্ষ, যেন ওদেরই সুদক্ষ পরি কল্পনার জোরে অচিরেই যুদ্ধ থেমে যেতে বাধ্য। ওদের চাইতে তোমা

কল্পনাশক্তি, তোমার ভাবনা বরং অনেক বেশি বাস্তব। আমার তো মনে হয় তুমি একজন সত্যিকারের বড় সাহিত্যিক হতে পারতে।'

'সত্যিই কি তোমার তাই মনে হয়, রবার্ট?' বেটির ধূসর চোখদুটো খুশিতে ঝিকিয়ে উঠলো।

'নিশ্চয়ই।'

'তাহলে কি একবার চেষ্টা করে দেখবো?'

'অবশ্যই।'

'কিন্তু কি নিয়ে লিখবো? আমার জীবনে তেমন উল্লেখযোগ্য ঘটনা তো কিছু ঘটেনি?'

'তোমার জীবনটাই ঘটনা বেটি, যে জীবন তুমি উৎসর্গ করেছো আমাদের সবার জন্যে।'

'কিন্তু আমি যদি লিখিও, কে পড়বে, কে ছাপবে বলো? ঠিক এই কারণেই মোলার হতাশ হয়ে আত্মহত্যা করেছিলো। কেননা ও জানতো আমেরিকায় কেউ তার লেখা ছাপবে না।'

'আমার কিন্তু তা মনে হয় না বেটি,' অত্যন্ত সতর্ক ভাবেই আমি প্রতিবাদ করলাম। 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস উনি এখানে কিছু লিখতে পারেননি, অর্থাৎ ওঁর মাথায় লেখার নতুন কোনো পরিকল্পনাই ছিলো না। প্রথম দিকে ঘৃণায় মেশা ক্রোধ যতদিন পর্যন্ত তীব্র ছিলো, প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলো ওঁর লেখনী। এমন কি যতদিন পর্যন্ত বিপদের মধ্যে ছিলেন, তখনও তিনি হাল ছাড়েননি। কিন্তু যখন দেখলেন বিপদ কেটে গেছে, ঘৃণায় মেশা ওঁর সেই তীব্র ক্রোধ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট কোনো রূপ নিতে পারলো না, তখন ওঁর নিঃশব্দ বিদ্রোহ একঘেয়েমির ক্লান্তিতে ডুবে গেলো। আমাদের অধিকাংশ বন্ধুরাই যারা নিজেদের জীবনকে বাঁচাতে পেরেছে বলে যখন খুশি, উনি তখন শুধু তাতেই নিজেকে সন্তুষ্ট রাখতে পারেননি। উনি চেয়েছিলেন আরও বেশি কিছু। সেই বেশি চাওয়ার ব্যর্থতাই ওঁকে আত্মহননের পথকে বেছে নিতে বাধ্য করেছে।'

সেই মুহূর্তে বেটি কোনো জবাব দিতে পারলো না, বালিশের ওপর কনুই রেখে গালে হাত দিয়ে নির্নিমেষ চোখে কি যেন ভাবতে লাগলো। আমি উঠে পড়লাম। 'আজ আমি চলি বেটি। ফিরে এসেই তোমার সঙ্গে দেখা করবো। আশা করি ততদিনে তুমি নিশ্চয়ই কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠতে পারবে।'

'আমার জন্যে তুমি খুব একটা কিছু ভেবো না, রবার্ট।'

অন্ধকার সিঁড়ি ভেঙে আমি নিচে নেমে এলাম। দরজার সামনে ডাক্তার গ্রাফেনহেইমের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। উনি জিগেস করলেন:

'বেটি কেমন আছে?

'তেমন ভালো কিছু নয়। আপনি কি ওকে যন্ত্রণা কমার কোনো ওষুধ দিয়েছিলেন?'

'এখনও দিইনি। মনে হচ্ছে এবার থেকে দিতে হবে।'

বৃষ্টি থেমে গেলেও পাশপথের দুদিকে তখনও জল জমে রয়েছে। আমি সাতান্নতম সরণীর দিকে এগিয়ে চললাম, কিন্তু কয়েকটা বাড়ি পেরুতে না পেরুতেই হঠাৎ মনে হলো কানের সঙ্গে একবার দেখা করে যাওয়া উচিত।

কানকে তার দোকানেই পেলাম। কি যেন একটা বই পড়ছিলো, আমাকে দেখে বইটা সশব্দে মুড়ে রাখলো। 'তুমি কবে হলিউডে যাচ্ছো?'

'পরশু।'

'তাহলে কারমেনের সঙ্গে তোমার হয়তো দেখাও হয়ে যেতে পারে।'

'কারমেনের সঙ্গে!'

আমাকে অবাক হতে দেখে কান হাসলো। 'কে যেন এক সহকারী পরিচালক তিন মাসের জন্যে ওর সঙ্গে চুক্তি করেছে। সপ্তায় একশো ডলার। আমার ধারণা ও অবশ্য তার আগেই ফিরে আসবে। কেননা প্রতিভা বলতে যা বোঝায়, তার ছিটে ফোঁটাও ওর মধ্যে নেই।'

'ও কি নিজে থেকেই যেতে চেয়েছিলো?'

'না। ও এত অসম্ভব কুঁড়ে যে চেয়ার থেকেও নড়ে বসতে চায় না। সত্যি বলতে কি আমিই ওকে জোর করে পাঠিয়েছি।'

'কেন?'

'যাতে পরে ওর কখনও না মনে হয় যে আমারই উৎসাহের অভাবে ও সুন্দর একটা সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। আমি চাই ও কোনো কিছুর মধ্যে নিজেকে খুঁজে পাক।'

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে কান নিজেই অস্বস্তি বোধ করলো।

'তোমার কি মনে হয় আমি কাজটা ঠিক করিনি?'

'আমার কিন্তু তাই-ই মনে হয়, কান। বিশেষ করে কারমেন যে ধরনের রূপসী, আমি হলে ওকে অন্তত হলিউডে পাঠানোর মতো ঝুঁকি নিতাম না।'

আমার কথা শুনে কান হো হো করে হেসে উঠলো, কিন্তু আমার কেনই জানি মনে হলো ওর হাসিটা স্বতঃস্ফূর্ত নয়। 'হলিউডে কারমেনের মতো অমন রূপসী ভুরি ভুরি রয়েছে। ওদের কারো কারো আবার সত্যিকারের প্রতিভাও আছে। আমি জানি হলিউডে কারমেন বিশেষ সুবিধে করতে পারবে না। তাছাড়া ইংরিজি প্রায় জানে না বললেই চলে। তুমি শুধু ওকে একটু চোখে চোখে রেখো।'

'নিশ্চয়ই। সে দিক থেকে তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না।' যদিও হলিউডে টেনেনবাম ছাড়া আমি আর কাউকেই চিনি না, তবু কারমেনকে চোখে চোখে রাখতে আমার কোনো অসুবিধে হবে না।'

'একদিক থেকে কাজটা খুবই সহজ, কেননা অধিকাংশ সময়েই ও ঘুমোবে। তুমি শুধু মাঝে মধ্যে ওকে কোনো হোটেলে নৈশভোজে নিয়ে যেও। তারপর যখন সময় হবে আবার নিউ ইয়র্কে ফিরিয়ে নিয়ে এসো।'

'ঠিক আছে, কান। কারমেনের জন্যে তুমি কিছু ভেবো না।'

'আশা করি তোমার যাত্রা শুভ হোক।'

'তুমি কবে ফিরে আসবে আমি জানি না, তবে একটা কথা আমার জানতে

ইচ্ছে করে,' আয়নার মধ্যে দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে নাতাশা প্রশ্ন করলো, 'তুমি কি সত্যিই অসুখী, রবার্ট ?'

একটু চুপ করে থাকার পর আমি বললাম, 'না।'

'যাক, তবু শুনে খুশি হলাম তুমি বলোনি যে তুমি সুখী। সাধারণত কেউ মিথ্যে বললে আমি প্রতিবাদ করি না, কেননা আমি নিজেও ভীষণ মিথ্যে বলি। কিন্তু কখনও কখনও মিথ্যে কথা আমি একদম সহ্য করতে পারি না।'

'নিজেকে সুখী বলতে পারলে আমি সত্যিই খুশি হতাম নাতাশা।' কেননা সুখ বা অ-সুখ দুটোই সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার। অনেকে যারা মনে করে সুখী নয় বলেই অসুখী, আমি ঠিক তাদের দলে নই।'

'ধন্যবাদ, অধ্যাপক মশাই।'

আয়নার মধ্যে দিয়েই আমি নাতাশাকে হাসতে দেখলাম। ওর টানা টানা দীর্ঘায়ত চোখদুটো উজ্জ্বল আলোয় ঝিকমিক করছে। প্রসঙ্গ পালটাবার জন্যেই আমি প্রশ্ন করলাম, 'তুমি কখনও হলিউডে গেছো ?'

'না, সে সৌভাগ্য আমার কখনও হয়ে ওঠেনি।'

'ইচ্ছে করলে তুমি আমার সঙ্গে যেতে পারো।' কিছু না ভেবেই আমি বললাম।

'তা হয় না, রবার্ট। চুক্তি অনুযায়ী শীতের শুরুতে আমার পক্ষে অন্য কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া আমাদের এখন টাকা-পয়সারও খুব টানাটনি যাচ্ছে।'

'আচ্ছা, আমি চলে গেলে তুমি আমাকে ভুলে যাবে ?'

'খুব স্বাভাবিক।'

এমন অনায়স ভঙ্গিতে নাতাশা কথাটা বললো যেন আমি আর কোনো দিনই ফিরে আসবো না। আমি ওর জবাবের গূঢ় অর্থটা ধরতে না পেরে নাতাশার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম। নাতাশা আয়নার সামনে থেকে সরে এসে অপ্রত্যাশিত ভাবেই আমাকে চুমু দিলো, তারপর হাসতে হাসতে বললো, 'তা নয়তো কি, তুমি কি ভাবো তোমার

বিরহে আমি একেবারে শুকিয়ে যাবো ?'

'না, সে কথা বলছি না···'

'এর মধ্যে অবাক হবার তো কিছু নেই, রবার্ট। ব্যাপারটা খুবই সহজ। এখানে যদি কেউ থাকে, অন্য কাউকে আমার আর দরকার নেই। কিন্তু এখানে যদি কেউ না থাকে, আমি একা হয়ে পড়বো। একা কে থাকতে চায় বলো ? অন্তত আমি পারি না।'

'কিন্তু একজনের পরিবর্তে আর একজনকে কি করে এত তাড়াতাড়ি বদলে নেওয়া সম্ভব আমি সেটাই বুঝতে পারছি না ?'

বাতাসে ঢেউ তুলে নাতাশা খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো। 'না, এটা একজনের পরিবর্তে আর একজনের প্রশ্ন নয়, এটা একা থাকা বা না-থাকার প্রশ্ন। পুরুষ-মানুষরা হয়তো একা থাকার ব্যাপারটা সহ্য করতে পারে, কিন্তু মেয়েরা পারে না। কেউ যদি বলে—পারি, তাহলে হয় তারা তোমাকে মিথ্যে কথা বলবে, নয়তো নিজেরাই নিজেদের সঙ্গে প্রতারণা করবে। সত্যি বলতে কি জানো রবার্ট, মেয়েরা হলো ঠিক আঙুর লতার মতো—অবলম্বন ছাড়া ওরা নিজেদেরকে মেলে ধরতে পারে না।'

'হ্যাঁ, হয়তো তাই। কিন্তু দুসপ্তা খুব একটা বেশি সময় নয় নাতাশা।

'আমি কেমন করে জানবো তুমি কতদিনের জন্যে যাচ্ছো ? সময়ের ব্যাপারে, বিশেষ করে কারুর ফেরার ব্যাপারে আমি তেমন আশাবাদী নই রবার্ট।'

ঠিক সেই মুহূর্তে আমি হাসবো না কাঁদবো, কিছুই বুঝে উঠতে পারলাম না। নিজেকে আমার শীতের দিনে বিলাপ মুখর কোনো নিঃসঙ্গ উইলোর মতো মনে হলো। নাতাশা আমাকে দুহাতে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে চুমু দিলো। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম আমরা দুজনেই তীক্ষ্ণ-ফলা তীর নিয়ে খেলা করছি।'

বিষণ্ণ স্বরে বললাম, 'তুমি বিশ্বাস করো নাতাশা, সম্ভব হলে আমি এখানেই থাকতাম। কিন্তু আমি না গেলে সিলভারস অন্য কোনো লোক জুটিয়ে নিতো। তখন জমানো টাকায় আমার সপ্তা খানেকও চলতো না।

তাছাড়া আমার এমন কিছু দেনা আছে যা অতি অবশ্যই শোধ করা দরকার।'

ভীরু স্বামীর মতো জাঁহাবাজ কোনো স্ত্রীর কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হচ্ছে বলে আমি নিজেই নিজের ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলাম।

'তোমার মাথা সব সময়েই নানান পরিকল্পনায় ঠাসা থাকে, রবার্ট। আমাকে চমকে দেবে বলে আগে থেকে কোনোদিনই কিছু জানাও না।'

'নতুন করে কিছু জানাবার বা গোপন করার আমার কিছুই নেই, নাতাশা। আর চমকের কথা যদি বলো—তুমিই আমার জীবনের প্রথম চমক, যাকে আমি নিতান্ত অভ্যেস বশে গ্রহণ করিনি, যাকে আমার বুকের অজস্র ভালোবাসা দিয়ে নিবিড় করে পেতে চেয়েছি।'

'তুমি কি আজ রাতটা এখানে থাকবে?'

'চলে যাওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তটা পর্যন্ত আমি এখানে থকেতে চাই, নাতাশা।'

সেই রাত্তিরটা আমরা দুজনে খুব কমই ঘুমিয়েছি। জেগে উঠেছি, সহবাস করেছি, পরস্পরের উষ্ণ আলিঙ্গনের মধ্যে আবার ঘুমিয়ে পড়েছি। তারপর আবার জেগে উঠে কথা বলেছি, সহবাস করেছি, চুঁইয়ে চুঁইয়ে উপভোগ করেছি পরস্পরের নিবিড় উষ্ণতা, ক্ষণিক কিংবা চির-বিদায়ের আগের মুহূর্ত পর্যন্ত জেনেছি দুটি দেহের অসীম রহস্য। কখনও মনের সমুদ্রের অতলান্ত থেকে উঠে এসেছে উত্তাল ঊর্মিমালা, কখনও বা থিতিয়ে গেছে। যখন আমাদের সমস্ত কথা ভেসে গেছে অনেক দূরে, আমরা নিশ্চুপ থেকেছি। যখন নীরবতা মনে হয়েছে দুর্বিসহ, আমরা পরস্পরে দূরপাল্লার লরি-চালকদের মতো চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলেছি। নিঃশব্দে আমরা পরস্পরকে ঘৃণা করেছি, পরস্পরকে ভালোবেসেছি, উত্তেজিত হয়েছি, আবার থিতিয়ে গেছি। কখনও প্রবল বৃষ্টিপাতে ছোট ছোট উপলের মতো টুকরো টুকরো হয়ে ছিটকে পড়েছি, কখনও অনুভব করেছি কোমল নিঃশ্বাসের চাইতেও নিবিড় প্রশান্তি। নাতাশা যখন ঘুমের অতলে তলিয়ে গেছে, আমি নির্নিমেষ চোখে ওর আনগ্ন দেহটার দিকে তাকিয়ে

থেকেছি। তাকিয়ে থাকতে থাকতে কখনও মনে হয়েছে ওর দুঃখ বেদনা আনন্দ হতাশাকে আমি চিনি, কখনও মনে হয়েছে ওকে আমি চিনি না—এই মুহূর্তে এ পৃথিবীতে ও আমার সব চাইতে কাছে, অথচ ওই আমার সবচেয়ে অচেনা, সবচেয়ে অজানা। শান্ত স্থির নাতাশার ঘুমন্ত মুখখানার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কখনও মনে হয়েছে এ পৃথিবীতে ও-ই সব চাইতে নিষ্পাপ, কখনও বা মনে হয়েছে জীবনের অপার রহস্যকে ও লুকিয়ে রেখেছে এমন এক যাদুমন্ত্রে, যাকে আমি কখনও ধরতে পারবো না, ছুঁতে পারবো না, ভরতে পারবো না আমার মুঠোর মধ্যে। ঘুমিয়ে পড়ার ভয়ে আমি জেগে জেগে ঝড়ের শব্দ শুনেছি, তারপর নিজেই এক সময়ে কখন গভীর ঘুমিয়ে পড়েছি।

## পনেরো

দি গার্ডেন অফ্ আল্লা বা ঈশ্বরের বাগানে সবার আগে যেটা চোখে পড়ে তা হলো তার দুর্লভ সাঁতার-দীঘিটা। দীঘিটার তিনদিক ঘিরে গড়ে উঠেছে বিশাল আবাসন ভবন। এর কোনোটা এক-ঘর, দু-ঘর কিংবা তিন-ঘর বিশিষ্ট। আমাকে যেটা দেওয়া হয়েছে দু-ঘরের একটা অংশ। শোবার ঘর-দুটো আলাদা, কিন্তু স্নানঘর একটাই। সব মিলিয়ে আবাসন ভবনটাকে আধুনিক রুচিসম্মত একটা জিপসি-তাঁবু বলা যেতে পারে। আমার অন্য শোবার ঘরের সঙ্গী জন স্কট, একজন অভিনেতা, প্রথম দিনেই আমাকে তার ঘরে পানের আমন্ত্রণ জানালো। পানীয় বলতে অবশ্য শুধু হুইস্কি আর ক্যালিফোর্নিয়ান মদিরা। স্কটের সঙ্গে ছিলো তার আরও কয়েকজন সঙ্গী এবং সমস্ত পরিবেশটাই এমন খোলামেলা ছিলো যে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমরা পরস্পরের অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলাম।

প্রথম কয়েকটা দিন আমার কিছুই করার ছিলো না, কেননা যে জাহাজে করে সিলভারসের ছবি নিউ ইয়র্ক থেকে এখানে আসার কথা সে জাহাজটা এখনও এসে পৌছোয়নি। তাই গার্ডেন অফ আল্লার আশে-

পাশে একা একাই ঘুরে বেড়াতাম, জন স্কটের সঙ্গে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যেতাম, হলিউডের জীবন সম্পর্কে নানান প্রশ্ন করতাম। এখানে তো বটেই, নিউ ইয়র্কেও যে জিনিসটা আমাকে সব চাইতে বেশি বিস্মিত করতো—বিশাল একটা দেশ যুদ্ধে জড়িয়ে রয়েছে, অথচ কোথাও তার কোনো চিহ্ন নেই। আর হলিউডে যুদ্ধের চেহারাটা আরও কাব্যিক, যেখানে সত্যিকারের একটা লোকও মরে না।

জন স্কট আর আমি, আমরা দুজনে সান্তা মোনিকার বালুবেলায় বসে রয়েছি। প্রশান্ত মহাসাগরের নীলিম জলরাশির ওপারে সুদূর দিগন্তরেখার দিকে তাকিয়ে স্কট বললো, 'আমরা এখন এই ক্যালিফোর্নিয়ায় বসে রয়েছি, অথচ সমুদ্রের ঠিক ওপারে প্রথম যে ভূখণ্ডটা পড়বে সেটা হলো জাপান।'

সমুদ্রবেলায় আমাদের চারপাশে কলহাস্যমুখর বাচ্চাদের হুড়োহুড়ি। পেছনে ছোট ছোট কাঠের বাংলো থেকে ভেসে আসছে গলদা চিংড়ি রাঁধার লোভনীয় গন্ধ। কাজ-না-পাওয়া উদ্বৃত্ত তারকারা সদর্পে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ভঙ্গিটা এমন যেন তাদের আবিষ্কার না করতে পারাটা চিত্র-পরিচালকদেরই ত্রুটি। রেস্তোরাঁ আর স্ন্যাকস্ বারগুলোতে ক্ষণে ক্ষণেই ভিড় জমে উঠছে, আর রীতিমতো সাজগোজ করা, আঁটসাট পাৎলুন ও খাটো কামিজ-পরা পরিচারিকারা সেই ভিড় সামলাতে সামলাতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। সব মিলিয়ে জায়গাটাকে মনে হচ্ছে কাছে-পিঠে কোথায় যেন বিরাট একটা লটারি খেলা চলছে, কোন্ ভাগ্যবানের কপাল ফিরবে কেউ বলতে পারে না।

আমাদের ঠিক সামনেই খেলাধুলো করার জ্যাকেট-পরা দীর্ঘদেহী একটা মানুষের ছায়া পড়ায় আমি মুখ তুলে তাকালাম। গ্রুপেনফুরারের গাম্ভীর্য নিয়ে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটাকে ঠিক সেই মুহূর্তে আমি চিনতে পারিনি, কিন্তু পরক্ষণেই হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম:

'আরে, টেনেনবাম, তুমি !'

'আপনি গার্ডেন অফ আল্লায় বাস করছেন জেনেই দেখা করতে এলাম।'

'কিন্তু তুমি খবর পেলে কেমন করে ?'

টেনেনবাম নাটকীয় ভঙ্গিতে হাসলো। 'এখানে কেউ কাউকে খবর দেয় না। এখানকার খবর হাওয়ায় উড়ে বেড়ায়। আরে, আপনার সঙ্গে স্কটও রয়েছে দেখছি !'

'কেন, স্কটকে তুমি আগে থেকে চিনতে নাকি ?'

'নিশ্চয়ই। এর আগেও আমি দুবার হলিউডে এসেছি। প্রথমবার শুরু করেছিলাম সারফুরার হিসেবে। দ্বিতীয় বারে আমার পদোন্নতি ঘটেছিলো স্ট্রামফুরারে।'

'এখন তো তুমি গ্রুপেনফুরার ?'

'সত্যি বলতে কি—এখন আমি ওবারগ্রুপেনফুরার।'

'বাঃ, তাহলে তো তোমার দ্রুতই পদোন্নতি ঘটেছে বলতে হবে !'

'আপনারা কি গোলাগুলি ছোঁড়ার দৃশ্যগ্রহণ শুরু করে দিয়েছেন ?' স্কট প্রশ্ন করলো।

'না, এখনও হয়নি। আগামী সপ্তা থেকে শুরু করা যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। আসলে আমাদের যত ফৌজি-উর্দির প্রয়োজন এখনও সব এসে পৌঁছোয়নি।'

একবার ইচ্ছে হলো জিগেস করি—টেনেনবাম, কত সালে তুমি জার্মানী থেকে পালিয়ে এসেছিলে ? তার আগে কতজন আত্মীয়-স্বজনকে হারিয়েছো, খুন হয়েছে কতজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু কিংবা শাস্তিশিবিরে বাস করছে তোমার দেশের কত হাজার মানুষ ? কিন্তু একজন উদ্বাস্তু হয়ে আর একজন উদ্বাস্তুকে আমি কখনই এ প্রশ্ন করতে পারি না। আসলে আমার সত্যিকারের যে প্রশ্নটা করার ইচ্ছে ছিলো, তা হলো—যারা তারই আত্মীয়-স্বজন, ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধব আর অগণন স্বদেশবাসীকে গুলি করে মারছে, তাদেরই একটা চরিত্রে অভিনয় করতে গিয়ে সে বুকের মধ্যে

কোনো যন্ত্রণা বা ঘৃণা অনুভব করছে কিনা। কিন্তু সত্যি বলতে কি, এ ধরনের কোনো প্রশ্নই আমি তাকে করতে পারলাম না।

'আগামী কয়েকটা দিন আমি হাতে অনেক সময় পাবো,' টেনেনবাম দীঘল হাতটা বাড়িয়ে দিলো আমার দিকে। 'আশা করি তখন নিশ্চয়ই পরস্পরে দেখা হবে।'

'অবশ্যই। তোমার সঙ্গে দেখা হলে আমিও খুব খুশি হবো, টেনেনবাম।'

নিউ ইয়র্কে যাঁদের সঙ্গে আলাপ হয়েছিলো, যাঁরা প্রায় চোখের জলেই লস অ্যাঞ্জেলসে আসার জন্যে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছিলেন, সিলভারস সেই-সব প্রখ্যাত চিত্রপরিচালক ও প্রযোজকদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তাঁর চিত্রকলার সংগ্রহ দেখার জন্যে। কিন্তু সচরাচর যা হয়—নিজেদের ছবি নিয়ে ওঁরা সবাই এত ব্যস্ত যে সিলভারসের অস্তিত্ব প্রায় ভুলেই গেছেন।

'এমন জানলে আসতামই না।' ক্ষোভে সিলভারস ফেটে পড়লেন। 'এবং এইভাবে যদি চলে, শিগগিরই আমাদের পাত্তাড়ি গুটিয়ে নিউ ইয়র্কে ফিরে যেতে হবে। গার্ডেন অফ আল্লার লোকজন সব কেমন?'

'বিক্রি-বাটার তেমন কোনো সুযোগ আছে বলে মনে হয় না। আর যদি হয়ও, অল্প দামের ছোট ছোট ছবি কিংবা বড় ছবির লিথোগ্রাফ বিক্রি হতে পারে, তার চাইতে বেশি কিছু আশা করাটা উচিত হবে না।'

'এখন যা অবস্থা দেখছি, ছোট দিয়ে যদি শুরু করা যায় তো সেই ভালো। আমাদের দেগার দুটো ছোট ছবি আর কাঠকয়লায় আঁকা পিকাসোর দুটো রেখাচিত্র আছে। তুমি বরং ওই চারটে ছবি নিয়ে গিয়ে তোমার ঘরের দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখো, তারপর একটা ককটেল পার্টি দাও।'

'ককটেল পার্টিটা কি আমার নিজের খরচে?'

'আমার খরচে। আচ্ছা, তুমি কি টাকা-কড়ির কথা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারো না?'

'আমার নেই তাই, থাকলে হয়তো কোনোদিনই ভাবতাম না।'

সিলভারস অবজ্ঞার ভঙ্গিতেই বললেন, 'ঠিক আছে, ছাখো একবার চেষ্টা করে।'

স্কট, টেনেনবাম এবং তাদের কয়েকজন বন্ধুকে আমি পান করার জন্যে আমন্ত্রণ জানালাম। স্কটের কাছে শুনেছিলাম ঈশ্বরের বাগান ককটেল পার্টির জন্যে বিখ্যাত এবং কখনও কখনও এর স্থায়িত্বকাল পরের দিন ছুপুর পর্যন্তও গড়িয়ে যায়। আমরা শুরু করেছিলাম ঠিক সময়েই, কিন্তু নটার সময় দেখা গেলো আমন্ত্রিত ব্যক্তির সংখ্যার চাইতে আরও দশজন বেশি, দশটার সময় সেই সংখ্যা আরও বেড়ে গেলো। আমার মদের ভাঁড়ার ফুরিয়ে যাওয়ায় আমরা অন্য আর একজনের বাংলোয় গেলাম। বাংলোর যিনি মালিক, পাকা-চুল, লালচে মুখ এক ভদ্রলোক আমাদের সবার জন্যে স্যাণ্ডউইচ আর হ্যামবুর্গারের ফরমাস দিলেন। এগারোটার সময় দেখা গেলো অপরিচিত গোটা দলটার অর্ধেকেই আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হয়ে গেছে। মাঝ রাতে সঙ্গীদের কয়েকজন সাঁতার-দীঘিতে ঝাঁপাইজুড়ি শুরু করে দিলো। যদিও সমস্ত ব্যাপারটাই আমার কাছে কেমন কাকতালীয় মনে হলো, তবু সবুজ-নীল প্লাবিত আলোয় দেখলাম সাঁতার-দীঘিতে তরুণীদের সংখ্যাও খুব একটা কম নয়। ওদের প্রত্যেকেরই পরণে সংক্ষিপ্ততম অন্তর্বাস, প্রত্যেকেই আশ্চর্য রূপসী এবং প্রত্যেককেই মনে হলো অসম্ভব ধরনের নিষ্পাপ। আরও পরে, এক সময়ে দেখলাম খোলা জায়গায় একটা পিয়ানোকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আমরা আবেগ বিধুর রাখালিয়া গান শুনছি।

তারপর একটু একটু করে আমি ঘটনার পারস্পরিক তাৎপর্য হারিয়ে ফেললাম। পৃথিবীটা ঘুরতে লাগলো আমার চোখের সামনে এবং আমি তাকে থামাবার আদৌ কোনো চেষ্টা করলাম না। কি হবে শোভন হয়ে? আমি ঘৃণা করি সেইসব রাতগুলোকে, যখন ঘেমে-নেয়ে অন্ধকারে একা জেগে উঠি, তারপর বুঝতেই পারি না সেই মুহূর্তে আমি কোথায় রয়েছি। স্বপ্নগুলো এমনই গাঢ় হয়ে জড়িয়ে থাকে যে আমি কিছুতেই সেগুলোকে

ঝেড়ে ফেলতে পারি না। অস্বস্তিকর নয় এমন একটা অদ্ভুত বিহ্বলতার মধ্যে বাদামী-হলুদ আলোয় আমরা অনেকক্ষণ ধরে স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো কোথায় কোথায় যেন ঘুরে বেড়িয়েছিলাম। অথচ সবচেয়ে মজার ব্যাপার সকালে ঘুম ভেঙে দেখেছিলাম আমি আমার ঘরেই রয়েছি।

স্কটই স্মরণ করিয়ে দিলো, 'দেওয়ালে টাঙানো যে ছবিদুটো তুমি কাল বিক্রি করে দিলে, ওদুটো কি তোমার নিজের?'

যন্ত্রণায় মাথার শিরা-উপশিরাগুলো তখন যেন ছিঁড়ে পড়তে চাইছিলো। তবু আমি কোনো রকমে দেওয়ালের দিকে মুখ তুলে তাকালাম, স্তব্ধ বিস্ময়ে দেখলাম দেগার দুটো ছবিই উধাও হয়ে গেছে।

'ছবিদুটো কি আমি নিজে বিক্রি করেছি?'

'নিশ্চয়ই।'

'কাকে?'

'আমার যদ্দুর মনে পড়ছে টেনেনবামের ছবির পরিচালক, হল্টকে।'

'হল্টকে! কিন্তু ও রকম নাম তো আমি কখনও শুনিনি। নিশ্চয়ই আমি তখন বেশ মাতাল হয়ে পড়েছিলাম।'

'অল্প-বিস্তর মাতাল আমরা সবাই হয়েছিলাম, বব। জিমি তো মেঝেতেই গড়াগড়ি খেতে খেতে চিৎকার-চেঁচামেচি জুড়ে দিয়েছিলো। তবে তোমার আচরণের-মধ্যে কোথাও কোনো অশোভনতা ছিলো না, এমন কি কোনো অসংলগ্নতাও না। প্রাঞ্জল ভাষায় শিল্পের ওপর তুমি যে চমৎকার বক্তৃতাটা দিয়েছিলে তা আমাদের প্রায় সবাইকেই মুগ্ধ করেছিলো। হল্ট এত বেশি বিচলিত হয়েছিলো যে ও সঙ্গে সঙ্গেই ছবিদুটো কিনে নিয়ে তোমাকে চেক লিখে দিয়েছিলো।'

'চেক! আমাকে?' আমার অবস্থা তখন ঠিক আকাশ থেকে পড়ার মতন।

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই! কেন, তোমার কিছু মনে নেই?' স্কটও কিছুটা বিব্রত বোধ না করে পারলো না।

'না তো!'

'তুমি কিন্তু ধন্যবাদ জানিয়ে চেকটা কোটের পকেটে রেখে দিয়েছিলে।'

উঠে কোটের পকেট হাতড়ে আমি সত্যিই সুন্দর ভাঁজ করা একটা চেক খুঁজে পেলাম। ভাঁজ খুলে চেকটা আলোয় মেলে ধরলাম, তারপর সংখ্যাগুলো পড়তেই আমি হেসে উঠলাম। সিলভারসের নির্ধারিত দামের চাইতে পাঁচশো ডলার বেশি দামে কি করে ছবিদুটোকে বিক্রি করা সম্ভব হলো আমি নিজেই বুঝতে পারলাম না।

স্কটকে বললাম, 'ছবিদুটোকে আমি একদম জলের দামে বিক্রি করে দিয়েছি।'

'তাই নাকি! কিন্তু হল্ট এখন ছবিদুটোকে ফেরোত দিতে চাইবে বলে আমার মনে হয় না।'

'না না, ফেরোত দেওয়ার কোনো প্রশ্নই আসছে না। বিক্রিটা বিক্রিই।'

'দামের তফাতটা কি বড্ড বেশি?'

সান্ত্বনা দেওয়ার ভঙ্গিতে আমি ওকে বললাম, 'যাগ্‌গে, ছেড়ে দাও। এই ধরনের একটা শাস্তি পাওয়া আমার দরকার ছিলো। আমি কি পিকাসোর ছবিদুটোও বিক্রি করে দিয়েছি?'

'কার?'

'অন্য ছবিদুটো, যে দুটো এখনও দেওয়ালে টাঙানো রয়েছে?'

'ঠিক মনে পড়ছে না···বোধ হয় না। চলো একটু সাঁতার কেটে আসি, নেশার ঘোর একদম কেটে যাবে।'

'কিন্তু আমার যে সাঁতারের কোনো পোশাক নেই?'

'দাঁড়াও দেখছি কোথা থেকে আর একটা জোগাড় করা যায় কিনা।'

স্কট ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতেই আমি বাইরের খোলা বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। রোদ্দুরে ঝিকমিক করছে দীঘির স্বচ্ছ জলরাশি! তখনও কয়েকটি মেয়ে মুঠো মুঠো মুক্তোর মতো জল ছিটিয়ে সাঁতার কাটছে। দীঘির চারপাশ ঘিরে সুন্দর পোশাক-পরা কিছু লোক বেতের কুর্সিতে

আয়েস করে গা এলিয়ে দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছে, নয়তো কমলার রস কিংবা হুইস্কি খাচ্ছে। গতকাল রাত্তিরে যাঁর বাংলোতে আমরা হানা দিয়েছিলাম, পাকা-চুল লালচে মুখ সেই ভদ্রলোক আমাকে দেখতে পেয়ে হাত নাড়লেন। তাঁর সঙ্গে আরও যে তিনজন ভদ্রলোক ছিলেন, তাঁরাও হাত নাড়লেন। কিন্তু ওঁদের সঙ্গে আমরে আলাপ হয়েছিলো কিনা কিছুতেই স্মরণ করতে পারলাম না। তবু আমার চারপাশে যে এত অন্তরঙ্গ বন্ধু রয়েছে ভাবতেও বেশ ভালো লাগলো। সেই মুহূর্তে, অন্তত গত কয়েক বছর ধরে সারা ইউরোপ জুড়ে যে ভয়ঙ্কর কালরাত্রি বিভৎস ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে, সেই তুলনায় লস অ্যাঞ্জেলকে আমার মনে হলো যেন সত্যিকারের কোনো মায়া-কানন আর রঙিন প্রজাপতির মতো জল-ছিটিয়ে-সাঁতার-কাটা রূপসী মেয়েগুলো যেন সেই মায়া-কাননের

পরের দিন বেভারলি হিল্‌স্ হোটেলে সিলভারসের সঙ্গে দেখা করে চেকটা আমি ওঁর হাতে দিলাম। নিঃশব্দে ভাঁজ খুলে উনি টাকার অঙ্কটার ওপর একবার দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিলেন। 'তুমি আর এক হাজার ডলার বেশি চাইতে পারতে।'

'আপনি যে দাম বলেছিলেন আমি তার চাইতে আরও পাঁচশো ডলার বেশিতে বিক্রি করেছি। এখন আপনি যদি চান চেকটা ফিরিয়ে দিয়ে ছবিদুটো নিয়ে আসতে পারি।'

'ওটা আমার রীতি নয়। তাতে যদি লোকসানও হয়, তবু বিক্রিটা বিক্রিই।'

সামনের বুল-বারান্দায় নরম গদি আঁটা ফিকে নীল চামড়ায় মোড়া কুর্সিতে অনেকখানি গা এলিয়ে দিয়ে সিলভারস বসে ছিলেন। আমি বললাম, 'পিকাসোর রেখাচিত্রদুটোর জন্যেও আমি একটা প্রতিশ্রুতি পেয়েছি। কিন্তু এখন ভাবছি ও দুটো আপনার নিজের বিক্রি করাই ভালো। দাম সম্পর্কিত ব্যাপারে নিজের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির জন্যে

আমি আপনাকে পথে বসাতে চাই না।'

সহসা চাপা একটা হাসিতে সিলভারসের মুখের চেহারাটাই পালটে গেলো। 'না রবার্ট, তোমার মধ্যে রসবোধ বলতে কোনো জিনিস নেই। তুমি কি বুঝতে পারছো না আমি পেশাগত একটা বিদ্বেষে ভুগছি। আমি যখন নিজে ব্যবসায়ী হয়ে একটাও ছবি বিক্রি করতে পারলাম না, তখন তুমি এক রাতেই দু-দুটো ছবি করে দিলে। শুধু তাই নয়, অন্য দুটো ছবি বিক্রিরও প্রতিশ্রুতি পেয়েছো। এর চাইতে ভালো আমি আর কি আশা করতে পারি বলো ? না না, পিকাসোর ছবিদুটো বরং তুমিই বিক্রি কোরো, আর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ককটেল পার্টির বিলটা পাঠিয়ে দিও।'

ককটেল পার্টির বিলটা তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিতে বলায় আমি যেমন বিস্মিত হইনি, তেমনি উনি যদি আমাকে বলতেন যে ছবি বিক্রির কোনো লভ্যাংশ তোমাকে দেবো না তাতেও আমি বিস্মিত হতাম না। আর আমি তা আশাও করি না।

বিকেলে টেনেনবাম আমার সঙ্গে দেখা করতে এলো। বললো, 'চলুন।'

'কোথায় ?' রীতিমতো অবাক হয়েই আমি প্রশ্ন করলাম।

'হন্টের ষ্টুডিওতে। আপনি ওঁকে কথা দিয়েছিলেন আজ ওখানে যাবেন।'

'আমি !'

এবার অবাক হবার পালা টেনেনবামের ! 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। ছবিদুটো বিক্রি করার সময় আপনি নিজে আমার সামনে ওঁকে বলেছেন যে ষ্টুডিওতে গিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে আসবেন কিভাবে ছবিদুটোকে ফ্রেমে বাঁধাতে হবে।'

'কিন্তু ও দুটো তো ফ্রেমে বাঁধানোই আছে ?'

'তা আছে। তবে আপনি হন্টকে বলেছিলেন ছবিদুটো অষ্টাদশ শতাব্দীর মতো ফ্রেমে বাঁধাতে পারলে ছবির দাম তিনগুণ বেড়ে যাবে।

তাছাড়া আপনি আজ ষ্টুডিওতে যাবেন বলে হল্টকে কথাও দিয়েছিলেন।'

'বেশ, তাহলে চলো।'

বাইরে দাঁড়ানো পুরনো একটা শেভ্রলে দেখিয়ে টেনেনবাম বললো 'এদিকে।' তারপর নিজেই গিয়ে বসলো চালকের আসনে।

আমি জিগেস করলাম, 'তুমি আবার গাড়ি চালানো শিখলে কোথায়?'

'গতবারে এখানেই শিখেছিলাম। রীতিমতো পাকা হাতে টেনেনবাম গাড়িটাকে তখন ঝড়ের বেগে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে। 'এখানে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গার দূরত্ব এত বেশি যে মটরশুটি কিনতে গেলেও গাড়ির দরকার হবে।'

পুলিস-প্রহরী বেষ্টিত একটা মূরিশ ফটক অতিক্রম করে আমরা ভেতরে প্রবেশ করলাম। 'কি ব্যাপার, এটা কি কোনো বন্দীশালা নাকি?' আমি প্রশ্ন করলাম।

টেনেনবাম হাসলো। 'না না, ওরা ষ্টুডিওর পুলিস। ওরা না থাকলে সমস্ত জায়গাটাই দর্শক আর কাজের-খোঁজে-আসা মানুষের ভিড়ে একেবারে উপছে উঠতো।'

আমাদের গাড়িটা তখন ধুলোয় ভরা এমন একটা রাস্তা ধরে এগিয়ে চলেছে, যরে দুপাশে সারি সারি ঘরবাড়ি। অথচ সেইসব ঘরবাড়ির কেবল সামনের দিকের অংশগুলোই রয়েছে, বাকি অংশগুলো নিপুণ বোমার আঘাতে কে বা কারা যেন নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। নীল আকাশের পটভূমিতে সারাটা দৃশ্যালী কেমন যেন অদ্ভুত দেখাচ্ছে।

'যুদ্ধের বহির্দৃশ্যের ছবিগুলো এখান থেকেই তোলা হয়,' টেনেনবাম আমাকে বুঝিয়ে দিলো। 'পাশ্চাত্যের বহু ছবি একই জায়গা থেকে তোলা হয়েছে। কখনও কখনও সৈনিকের ভূমিকায় যারা অভিনয় করে সেইসব চরিত্রগুলোকেও হুবহু এক রেখে দেওয়া হয়। দর্শকরা কিছু বুঝতেই পারে না।'

বেশ কয়েকটা ষ্টুডিওতে ভাগ করা বিশাল একটা ছাউনির সামনে

এসে আমরা দাঁড়ালাম। ষ্টুডিও ৫-এর দরজার ওপর তখন লাল আলো জ্বলছে।

'ভেতরে এখন ছবি তোলার কাজ চলছে। আমাদের একটুখানি অপেক্ষা করতে হবে।' টেনেনবাম বললো। 'তারপর এখানে আপনার কেমন লাগছে বলুন?'

'ভালো। সত্যি বলতে কি খুবই ভালো। সমস্ত জায়গাটাকে আমার মনে হচ্ছে কোনো সার্কাস কিংবা জিপসি তাঁবুর মতো।'

ষ্টুডিও ৪-এর বাইরে দেখলাম কয়েকজন গ্রাম্য ছেলে-মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মেয়েদের পরনে দীর্ঘ ঘাঘরা, ছেলেদের গায়ে ফ্রক কোট, গাল ভর্তি ঝাঁকড়া দাড়ি আর মাথায় কানাওয়ালা চওড়া নরম টুপি। রঙ-চঙ মেখে রীতিমতো সাজগোজ করা অবস্থাতেও ওদের কেমন যেন উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে। ওদের সঙ্গে কয়েকটা ঘোড়া আর একজন সেরিফও রয়েছে, যিনি তখন কোকা-কোলা পান করছিলেন।

স্টুডিও ৫-এর দরজার ওপর থেকে লাল আলোটা কখন নিভে গেছে খেয়াল করিনি, হঠাৎ প্রায় জনা কুড়ি এস. এস.-কে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে দেখে আমার ধমনীর রক্তস্রোত দ্রুত চলকে উঠলো। স্বাভাবিক ভাবেই বিহ্বল আতঙ্কে ছুটতে গিয়ে আমি টেনেনবামের সঙ্গে ধাক্কা খেলাম। টেনেনবাম হাসতে হাসতে বললো, 'যাই বলুন, ওদের কিন্তু দারুণ দেখাচ্ছে, তাই না?'

উত্তেজনার বশে আমি যে এক ঘুঁষিতে ওর কয়েকটা দাঁত ফেলে দিইনি সেই যথেষ্ট। মার্চ করতে করতে এগিয়ে আসা এস. এস. সৈন্যদের ওপারে কাঁটাতারের বেড়া, এমন কি পাহারা দেবার একটা ছোট গুমটিও দেখতে পেলাম। চকিতে আমার বুকের স্পন্দন কখন দ্রুত হয়ে উঠেছে আমি নিজেই বুঝতে পারিনি।

'কি ব্যাপার, আপনি বেশ ভয় পেয়েছেন বলে মনে হচ্ছে?' টেনেনবাম উদ্বিগ্ন চোখে তাকালো আমার মুখের দিকে।

'হ্যাঁ।' অকপটেই স্বীকার করলাম, এবং নিজের শান্ত রাখার আপ্রাণ

চেষ্টা করলাম। 'এটা যে একটা নাৎসিবিরোধী ছবি, আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। আসলে গত রাত্রে পানের পরিমাণটা এত বেশি হয়ে গিয়েছিলো যে এখনও তার রেশ কাটেনি।'

'ভুলটা কিন্তু আমার। আমারই উচিত ছিলো আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া। প্রথম দিনে আমিও ঠিক এই রকম ভয় পেয়েছিলাম।'

'সত্যি ?'

'হ্যাঁ। অবশ্য এখন আমার অভ্যেস হয়ে গেছে। ওই যে হল্ট।'

আমাদের দেখতে পেয়ে হল্ট হাত নাড়লো। ওর পরণেও সামরিক পোশাক, মাথায় শিকারী-টুপি। কাঁধে স্বস্তিকা আর বুকে 'স্টার অফ ডেভিড' থাকলেও আমি খুব একটা অবাক হতাম না।

'এসো বব, এসো।' আমার পিঠ চাপড়ে হল্ট অভ্যর্থনা জানালো। 'কি পান করবে বলো ?'

'এখন আর কিছু পান করবো না। কাল রাত থেকে মাথাটা এখনও ধরে আছে।'

'তাহলে তো এখন অতি অবশ্যই কিছু পান করা উচিত।'

'তাই কি ?'

'নিশ্চয়ই।'

নিজের মধ্যে অনর্গল ইংরিজিতে হাসি-ঠাট্টা করা একদল এস. এস. কে অতিক্রম করে আমরা স্টুডিও ভেতরে প্রবেশ করলাম। একজন সারফুরারকে দেখিয়ে আমি বললাম, 'ওই লোকটার টুপিটা ঠিক হয়নি।'

'তাই কি ?' সন্দিগ্ধ স্বরে হল্ট প্রশ্ন করলো। 'এ ব্যাপারে তুমি কি সুনিশ্চিত ?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু এই ধরনের ত্রুটি থাকা তো আদৌ উচিত নয়!' সবুজ রোদ-চশমাপরা একজন তরুণকে হল্ট জিগেস করলো, 'পোশাক-উপদেষ্টা কোথায় ?'

'আমি দেখছি।'

কথাটা ভাবতেই আমার কেমন যেন অবাক লাগলো—এখনও যারা মানুষ খুন করছে, তাদেরই চরিত্র অভিনয় করছে একদল উদ্বাস্তু, যারা সেইসব খুনীদেরই ভয়ে একদিন দেশ ছেড়ে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিলো।

আমি জিগেস করলাম, 'পোশাক-উপদেষ্টা যিনি, উনি কি সত্যিকারের একজন নাৎসি ?'

'সেটা আমি ঠিক জানি না। তবে এ ব্যাপারে ও একজন বিশেষজ্ঞ বলেই আমার ধারণা। ভাগ্যিস, আমরা এখনও গুলি ছোড়ার দৃশ্যগ্রহণ শুরু করিনি, নইলে সামান্য একটা টুপির জন্যেই সমস্ত ব্যাপারটা মাটি হয়ে যেতো!'

আমাদের ছোট একটা পানশালায় নিয়ে এসে হর্স্ট হুইস্কি আর সোডার ফরমাস দিলো। 'তুমি যদি কিছু মনে না করো, ছবিদুটো সম্পর্কে তোমাকে দু একটা প্রশ্ন করতে চাই, বব।'

'নির্দ্বিধায় করতে পারো। এর মধ্যে মনে করাকরির কোনো প্রশ্নই আসে না।'

'আমার কয়েকজন বিদেশী বন্ধু ছবিদুটোর বিশ্বস্ততা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছে…'

'সন্দেহ প্রকাশ করাটা খুবই স্বাভাবিক। আমি জানি ছবিতে শিল্পীর কোনো স্বাক্ষর নেই, কেবল স্টুডিওর লাল ছাপ মারা আছে। কিন্তু তোমার বিদেশী বন্ধুরা হয়তো জানে না যে ছবিদুটো দেগার মৃত্যুর পর স্টুডিও থেকে বিক্রির জন্যে ছাড়া হয়েছে। আমার মনিব মিস্টার সিল-ভারসের কাছে ছবির ছাপানো তালিকা আছে, যা থেকে মৃত্যু-পরবর্তী ছবির বিশ্বস্ততা প্রমাণ করাটা আদৌ কঠিন হবে না। তাছাড়া উনি তোমার সঙ্গে আলাপ করতে পারলে খুশিই হবেন। তোমার কখন সময় হবে বলো ?'

'ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমার এখানকার কাজ মিটে যাবে। তবে আমি তোমার কথাতেই বিশ্বাস করছি, বব।'

'কিন্তু কখনও কখনও আমি যে নিজেই নিজেকে বিশ্বাস করি না, জো। তুমি বরং ছটার সময় বেভারলি হিলস্ হোটেলে চলে এসো। বিশ্বস্ততা ছাড়াও, মিস্টার সিলভারস তোমাকে ছবি বিক্রির রসিদ আর ও দুটো যে নকল নয় তার লিখিত প্রতিশ্রুতিও দেবেন।'

'ঠিক আছে, তাহলে আমি ছটার সময়েই হোটেলে গিয়ে হাজির হবো।'

'বিশ্বাস করুন, আপনি কিন্তু সত্যিই লাভবান হয়েছেন, মিস্টার হল্ট। আজকালকার দিনে চিত্রকলায় টাকা বিনিয়োগ করার চাইতে ভালো ব্যবসা আর নেই। প্রতি বছরেই ত্রিশ থেকে চল্লিশ শতাংশ দাম বেড়ে যেতে বাধ্য। শুধু তাই নয়, আপনি যদি চান, আপনার কেনা ছবিদুটোর জন্যে আমি এই মুহূর্তে কুড়ি শতাংশ দামও বেশি দিতে রাজি আছি।'

চেকবইয়ের জন্যে সিলভারস পকেট হাতড়ালেন। হল্টের ওপর কি ধরনের প্রতিক্রিয়া হয় দেখার জন্যে আমি ব্যাকুল আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। ইতিমধ্যে হোটেলের পরিচারক এসে কফি আর ব্র্যাণ্ডি দিয়ে গেলো। সিলভারসের প্রত্যাশাই পূর্ণ হলো। হল্ট অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গেই জানালো যে ছবিদুটো তার ভালো লেগেছে বলে কিনেছে। সুতরাং ওদুটো বিক্রির কোনো প্রশ্নই আসে না। শুধু তাই নয়, প্রতিশ্রুতি মতো পিকাসোর ছবিদুটোও সে কিনতে রাজি আছে।

'প্রতিশ্রুতি?' বিস্ময়ভরা চোখে সিলভারস আমার দিকে তাকালেন। 'তুমি কি মিস্টার হল্টকে কোনো কথা দিয়েছিলে নাকি?'

এবার অবাক হবার পালা আমার। কেননা সেই মুহূর্তে আমার মনে পড়লো না সত্যিই হল্টকে কোনো কথা দিয়েছিলাম কিনা। হয়তো এমনও হতে পারে—এটা হল্টেরই একটা চালাকি। তবু আমি দ্রুত মনস্থির করে ফেললাম।

'হ্যাঁ, আমি ওঁকে চব্বিশ ঘণ্টার সময় দিয়েছিলাম।'

'আর দাম?'

'ছ হাজার ডলার।'

'একটার জন্যে?'

'না, দুটোর জন্যে।' আমার হয়ে হল্টই জবাব দিলো।

সিলভারস কটমট করে তাকালেন আমার দিকে। 'দামটা কি ঠিক আছে?'

মুখ নিচু করে আমি কিছু ভাবার ভান করলাম। কেননা আমি ভালো করেই জানি সিলভারসের নির্দ্ধারিত দামের চাইতেও দু হাজার ডলার বেশি ধরা আছে। এক সময়ে মুখ তুলে গম্ভীর গলায় বললাম, 'হ্যাঁ, দামটা ঠিকই আছে।'

'নাঃ, রস; তুমি দেখছি আমাকে সত্যিই ডুবিয়ে ছাড়বে!' মৃদু ভর্ৎসনার সুরে সিলভারস হতাশার একটা ভঙ্গি করলেন।

'আসলে সেদিন আমার পানের মাত্রাটাই একটু অতিরিক্ত হয়েগিয়েছিলো।' কৈফিয়ত দেওয়ার ভঙ্গিতে আমি বললাম।

আমার কথা শুনে হল্ট হো হো করে হেসে উঠলো। 'তবু তো তুমি পিকাসোর ছবিদুটো এখনও আমাকে বিক্রিই করোনি। আর আমি একবার মাতাল অবস্থায় জুয়ার একটা আড্ডায় বারো হাজার ডলার হারিয়ে ফেলেছিলাম। সেই থেকে আমার শিক্ষা হয়ে গেছে।'

'এর থেকে তোমারও একটা শিক্ষা হওয়া উচিত, রস।' কোমল স্বরেই সিলভারস আমাকে ধমক দিলেন। 'ছবির ব্যাপারে তোমার প্রতিভা যতই থাক, ব্যবসার দিকটা তুমি কিছুই বোঝো না। তবে তুমি যখন কথা দিয়ে ফেলেছো, এ ব্যাপারে আমার আর কিছুই করার নেই।'

কোনো কথা না বলে আমি জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলাম। বিদায় গোধূলি বেলায় রাঙা হয়ে রয়েছে সারা আকাশ। সাঁতার-দীঘিটা প্রায় নির্জন বললেই চলে, তবে ছোট ছোট বেতের টেবিল ঘিরে কয়েকজন তখনও পান করছে। দূরের পানশালা থেকে ভেসে আসছে মৃদু সুরমূর্ছনা। হঠাৎ কেন জানি না—নাতাশার জন্যে, আমার শৈশবের জন্যে, আমার দীর্ঘদিন আগে ভুলে যাওয়া স্বপ্নগুলোর জন্যে আমি তীব্র

কামনা অনুভব করলাম, এত তীব্র যে মনে হলো বুঝি সহ্যই করতে পারবো না, অথচ এটাও স্পষ্ট করে জানি যে এই না পাওয়ার হতাশ থেকে আমি কোনোদিন মুক্তিও পাবো না। শুধু এইটুকুই সান্ত্বনা—যুদ্ধে পৃথিবীতে সব কিছুই যখন ধ্বংসলীন আর অন্ধকার, আমেরিকা তখন আমার কাছে শান্তির এক টুকরো ছোট্ট মরুদ্যান, দীর্ঘক্ষণ ধরে যার ছায়া ঘন নিবিড় প্রশান্তি আমি চুঁইয়ে চুঁইয়ে উপভোগ করতে পারি।

'ধন্যবাদ।' দ্বিতীয় চেকটার ওপর সিলভারস দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিলেন. 'এবং এবারেও পিকাসোর ছবিদুটো পাওয়ার জন্যে আমি আপনাকে অভিনন্দন জানাবো মিস্টার হল্ট। বিখ্যাত দুজন শিল্পীর আঁকা চারটে ছবির সংগ্রহ খুব একটা কম কথা নয়। আমার নৈশভোজের একটা নিমন্ত্রণ আছে, এবং ইতিমধ্যেই আমি কিছুটা দেরি করে ফেলেছি··· নইলে আমি আপনাকে দেগা আর পিকাসোর আরও কয়েকটা ভালো সংগ্রহ দেখাতে পারতাম। এখানে থাকাকালীন যদি সেটা সম্ভব নাও হয় আশা করি যখন নিউ ইয়র্কে যাবেন, নিশ্চয়ই আপনাকে তখন অনেক ভালো সংগ্রহ দেখাতে পারবো।'

হল্ট কতটা বুঝতে পেরেছে জানি না, কিন্তু আমি খুব ভালো করেই জানি সিলভারসের কোথাও কোনো নিমন্ত্রণ নেই। পাছে হল্ট কোনো বড় ছবি দেখতে চায়, সেই ভয়েই উনি ওকে এড়াতে চাইছেন। তবে কেন জানি না, হল্টকে দেখে মনে হলো পিকাসোর ছবিদুটো পেয়ে ও বোধহয় খুশিই হয়েছে।

হল্ট উঠে পড়লো। 'নিউ ইয়র্কে গেলে অবশ্যই আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করবো। আজ চলি, বব। কাল এসে ছবিদুটো নিয়ে যাবো।'

'নিশ্চয়ই, জো।'

# ষোলো

প্রায় সপ্তাখানেক পরে টেনেনবাম আমার সঙ্গে দেখা করতে এলো। আমি তখন সাঁতার-দীঘির ধারে বসে খবরের কাগজ পড়ছি। সুখী এই দেশটাতে চিত্র-তারকাদের বিবাহ-বিচ্ছেদের খবর থাকে একেবারে সামনের পাতায় আর যুদ্ধের খবর খুঁজতে গেলে হাতড়াতে হবে ভেতরের পৃষ্ঠায়। লোকে এখানে প্রথমেই যা খোঁজে, তা হলো 'হলিউড সমাচার'-এর কলমে গত রাত্রে কাকে কার সঙ্গে দেখা গেছে, কার সঙ্গে কার প্রণয়ঘটিত ব্যাপার ঘটনার সম্ভাবনা রয়েছে কিংবা কে কোন্ চরিত্রে অভিনয় করছে।

সত্যি বলতে কি, খবরের কাগজের চাইতে আমার মন পড়েছিলো জলে সাঁতার কেটে চলা আশ্চর্য রূপসী দুটো মেয়ের ওপর। বাহারী তাল গাছের ফাঁক দিয়ে প্রায়ই আমার চোখ গিয়ে পড়ছিলো ওদের ওপর। এমন সময় টেনেনবাম হাঁফাতে হাঁফাতে এসে বসলো আমার পাশের চেয়ারটায়।

'আপনার কথাই ঠিক। পোশাকের ব্যাপারটা আমরা অনুসন্ধান করে দেখেছি···শুধু টুপি কেন, অনেক ব্যাপারেই উপদেষ্টার ওপর নির্ভর করা যাচ্ছে না। এমন কি যে ভদ্রলোক চিত্রনাট্য করেছেন, হন্ট তাঁর ওপরেও নির্ভর করতে পারছে না। সবচেয়ে মজার ব্যাপার, চিত্রনাট্যকার জীবনে কোনোদিন জার্মানীতেই যাননি।'

'কিন্তু তার জন্যে তো আর আমি দায়ী নই।'

'নিশ্চয়, দোষ তো আপনারই। আপনি কেন সারফুরারের টুপিটা লক্ষ্য করতে গেলেন? সেই জন্যেই তো একের পর এক খুঁতগুলো হন্টের চোখে পড়েছে।'

'এর জন্যে আমি সত্যিই দুঃখিত, টেনেনবাম।'

'কিন্তু আমাদের উপদেষ্টাকে ইতিমধ্যেই খারিজ করে দেওয়া হয়েছে।'

'আর একটাকে খুঁজে নাও।'

'সেই জন্যেই তো আমি এখানে এসেছি। হল্ট আমাকে পাঠালো। ও আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চায়।'

'কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছো টেনেনবাম, চলচ্চিত্র জগতের আমি কেউ নই।'

'সবাই জানে, বিশেষ করে নিউ ইয়র্কে আপনার পরিচিত যাঁরা, তাঁরা তো বটেই···হলিউডে আপনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি বন্দী শিবিরের ভেতরে ছিলেন।'

'তাতে কিন্তু কিছুই এসে যায় না।'

'শুনুন, মিস্টার রস, হল্ট আপনার সাহায্য চায়। আমিই আপনার কথা ওকে বিশেষ ভাবে বলেছি। উপদেষ্টা হিসেবে আপনাকে পেলে ও সত্যিই খুব খুশি হবে।'

'কিন্তু···'

'এর মধ্যে কিন্তু করার কিছু নেই। প্রথমত হল্ট খুব ভালোই টাকা দেয়, দ্বিতীয়ত নাৎসীবিরোধী একটা ছবিতে উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করতে আপনার আদৌ আপত্তি করা উচিত নয়।'

আমি স্পষ্টই বুঝতে পারলাম যুক্তি দিয়ে টেনেনবামকে বোঝানো আদৌ সম্ভব নয়, কেননা পৃথিবী সম্পর্কে ওর সঙ্গে আমার মৌলিক দৃষ্টি-ভঙ্গির পার্থক্য অনেকখানি। ও অপেক্ষা করছে সেই দিনটার জন্যে, যেদিন জার্মানী কিংবা আমেরিকায় ও আবার শান্তিতে জীবনযাপন করতে পারবে, আর আমি প্রতীক্ষা করছি সেই দিনটার জন্যে, যেদিন এই অপমানের চরম প্রতিশোধ নিতে পারবো। তাই ওকে স্পষ্টই জানিয়ে দিলাম, চল-চ্চিত্রে নাৎসিদের স্বপক্ষে কিংবা বিপক্ষে কাজ করার আমার কোথাও কোনো আগ্রহ নেই। ওঃ, ভালো কথা, তুমি কি কারমেনকে দেখেছো?'

'কে কারমেন? আপনি কি কানেব বান্ধবী, কারমেনের কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ।'

'দেখুন ওর সম্পর্কে মাথা ঘামাবার আমার সত্যিই সময় নেই। যুদ্ধের

ছবিটা নিয়েই আমরা হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি। তাহলে আপনি হন্টের সঙ্গে একবার কথাও বলবেন না?'

'না।'

সেদিনই বিকেলে কানের চিঠি পেলাম। ও লিখেছে, "প্রিয় রবার্ট, প্রথমেই তোমাকে একটা দুঃসংবাদ জানিয়ে রাখি—অত্যন্ত বেশি পরিমাণ ঘুমের বড়ি খেয়ে ডাক্তার গ্রাফেনহেইম আত্মহত্যা করেছেন। সুইজারল্যাণ্ড হয়ে আসা একটা সংবাদে উনি জানতে পারেন যে আমেরিকান বিমান আক্রমণের ফলে ওঁর স্ত্রী বার্লিনে মারা যান, যেটা ওঁর কাছে মনে হয়েছে নৃশংসতম একটা বিদ্রূপ। চরম হতাশাতেই উনি নিজে হাতে নিজের জীবনকে শেষ করে দিয়েছেন। ওর ধারণা আত্মহত্যা করতে পারার সুযোগ মনুষের কাছে ঈশ্বরের এক পরম আশীর্বাদ।

নিউ ইয়র্ক ছেড়ে যাবার পর থেকে কারমেনের আর কোনো খবরই পাইনি। ও এমন অসম্ভব কুঁড়ে যে চিঠি লিখতে গেলেই ঘুমিয়ে পড়ে। নিচে আমি ওর ঠিকানা দিলাম, তুমি ওর সঙ্গে দেখা করে বরং ওকে ফিরে আসতে বলো।

বিদায়, রবার্ট। আমার আন্তরিক ভালোবাসা নিও।"

কানের দেওয়া ঠিকানাটা খুঁজে বার করতে আমার অসুবিধে হলো না। ওয়েস্টউডে অনেকখানি জায়গার ওপর ছোট একটা বাংলো, ফটকের দুপাশে দুটো কমলার গাছ। পেছনের বাগানে একটা ডেক-চেয়ারে শুয়ে কারমেন ঘুমচ্ছে, ওর চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে অগণন মুরগীর ছানা। কারমেনের মতো আশ্চর্য রূপসী আমি জীবনে খুব কমই দেখেছি, কিংবা দেখিনি বললেই চলে। কিন্তু এখন অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পোশাকে আবৃত ওর অনন্য দেহরেখা আমাকে বিস্ময়ে একেবারে স্তম্ভিত করে দিলো।

কারমেন কিন্তু আমাকে দেখে একটুও অবাক হলো না। 'কি ব্যাপার, আপনি তো রবার্ট, তাই না? এখানে কিসের জন্যে এসেছেন?'

'ছবি বিক্রি করতে। আর আপনি?'

'ছবিতে অভিনয় করার জন্যে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমাকে কিছুই করতে হয়নি।'

'এখানে কেমন লাগছে।'

'খুব ভালো।

আমি তখন ওকে বাইরে কোথাও খেতে যাওয়ার জন্যে আমন্ত্রণ জানালাম। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও ও রাজি হলো। ওর ধারণা বাড়িওয়ালি যখন এত ভালো রান্না করে, তখন কষ্ট করে বাইরে কোথাও গিয়ে খাওয়ার কোনো অর্থই হয় না। পোশাক পালটাবার জন্যে কারমেন এমন ভাবে ভেতরে গেলো, যেন মাথায় অদৃশ্য বোঝার ভারে ও ভালোভাবে হাঁটতে পারছে না। ওর গমন পথের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হলো কানের উচিত ছিলো অনেক আগেই ওকে বিয়ে করা।

ব্রাউন ডার্বির বাইরে আমরা যখন ট্যাক্সি থেকে নামলাম, অনেকেই বিহ্বল বিস্ময়ে কারমেনের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলো। ভেতরে রীতি মতো ভিড় থাকা সত্ত্বেও কোণের দিকে একটা ছোট টেবিল খুঁজে পেলাম।

'আচ্ছা, নিউ ইয়র্কের চাইতে হলিউডে আপনার বেশি ক্লান্তকর মনে হয় না?' আসার পথে কারমেন নিজে থেকে একটা কথাও বলেনি, তাই খুঁচিয়ে ওকে জাগাবার জন্যেই আমি প্রশ্ন করলাম।

সমুদ্রঝিনুকের মতো আশ্চর্য সুন্দর দুটো চোখ মেলে কারমেন তাকালো আমার মুখের দিকে। 'এ সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত আমি কিছুই ভাবিইনি।'

'জীবনে এত একঘেয়ে আমার আর কোথাও কখনও লাগেনি।' মিথ্যে করেই আমি বললাম। 'এখন মনে হচ্ছে ফিরে যেতে পারলেই বাঁচি।'

'সেটা অবশ্য ব্যক্তি বিশেষের ওপর নির্ভর করে। নিউ ইয়র্কে আমার সত্যিকারের বন্ধু কেউ ছিলো, এখানে তবু আমার বাড়িউলিকে পেয়েছি। দুজনে আমরা অনেকক্ষণ গল্প করি। তাছাড়া নিউ ইয়র্কে এমন সুন্দর

মুরগীর ছানা আপনি কোথাও দেখতে পাবেন না। আমি ওদের প্রত্যেকটার নাম জানি এবং ডাকলেই ওরা আমার কাছে আসে। তাছাড়া কমলার বাগানটা দেখেছেন। যখন খুশি আপনি হাত বাড়িয়ে পেড়ে নিতে পারেন।'

হঠাৎই মনে হলো কারমেনের জন্যে কানের উদ্বিগ্ন হবার কারণটা যেন আমি বুঝতে পেরেছি। বয়েসের তুলনায় কারমেন অসম্ভব ধরনের ছেলেমানুষ। রূপের চাইতে ওর অপরিণত, নিষ্পাপ সরলতাই কানকে মুগ্ধ করেছে সব চাইতে বেশি এবং এরই জন্যে তার উদ্বিগ্নতার অন্ত নেই।

ঝলসানো মুরগীর মাংসের একটা টুকরো মুখে তুলে আস্তে আস্তে চিবুতে চিবুতে কারমেন জিগেস করলো, 'আপনি আমার ঠিকানাটা কোথায় পেলেন?'

'কানের চিঠি থেকে। ও আপনাকে কোনো চিঠি লেখেনি?'

'ওঃ, হ্যাঁ। ও আমাকে প্রায়ই চিঠি লেখে। কিন্তু আমি ওকে চিঠিতে কি লিখবো কিছুই বুঝতে পারি না।'

'যা হোক কিছু···ইচ্ছে করলে আপনি ওকে মুরগীর ছানাগুলোর কথাও লিখতে পারেন।'

'ও বুঝতে পারবে না।'

'তবু একবার চেষ্টা করে দেখতে পারেন, কিংবা অন্য কিছুও লিখতে পারেন। আপনার কাছ থেকে চিঠি পেলে ও কিন্তু সত্যিই খুব খুশি হবে।'

কারমেন মাথা নাড়লো। 'বাড়ি উলি হলে বুঝতে পারতো, কান পারবে না। সত্যি বলতে কি, কানকে আমি বুঝতেই পারি না।'

'ইচ্ছে করলে আপনি চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে আপনার আশা-আকাঙ্ক্ষা কিংবা ভবিষ্যৎ জীবনের কথা ওকে জানাতে পারেন।'

'দেখুন, আমার কাউকেই কিছু জানানোর নেই। এখানে সপ্তায় ওরা একশো ডলার মাইনে দেয়, অথচ আমাকে কিছুই করতে হয় না। ফ্রিয়েসল্যাণ্ডারের ওখানে আমি সপ্তায় ষাট ডলার পেতাম, কিন্তু আমাকে সারা-

দিন খাটতে হতো। তার ওপর কখনও কিছু ভুল করলে উনি আমাকে যাচ্ছেতাই করে বকাবকি করতেন। মিসেস ফ্রিয়েসল্যাণ্ডারও আমাকে দু চক্ষে দেখতে পারতেন না। সেই তুলনায় আমি এখানে বেশ ভালোই আছি।'

'কিন্তু কানের কি হবে?' কোনো লাভ হবে না জেনেও আমি প্রশ্ন করলাম।

'কানের? আমাকে ওর কোনো প্রয়োজন নেই।'

'কেমন করে জানলেন? থাকতেও তো পারে।'

'আমি জানি নেই।'

'কিন্তু আমি জানি ও আন্তরিকভাবেই আপনাকে চায়।

ডাগর চোখদুটো কারমেন মেলে দিলো আমার দিকে। 'আপনি কিন্তু আমাকে সত্যিই অবাক করলেন।'

এর পরে আমার আর কি বলার থাকতে পারে আমি নিজেই বুঝতে পারলাম না। তবু প্রশ্ন করলাম, 'নিউ ইয়র্কে আপনি আর ফিরে যেতে চান না?'

'ফিরে যাওয়ার আর কোনো সুযোগ আছে বলে আমার মনে হয় না,' কারমেনের ঘন চোখের পল্লব ঘিরে ঘনিয়ে উঠলো ম্লান একটা ছায়া। 'ফ্রিয়েন্সল্যাণ্ডার নতুন একজন সচিব খুঁজে নিয়েছেন। স্টুডিও যতদিন পর্যন্ত মাইনে দেবে আমার এখানেই থাকার ইচ্ছে আছে। তারপরে কি হবে আমি এখনও পর্যন্ত কিছু ভাবিনি।'

সেই দিনই প্রথম আমি কানের জন্যে সত্যিই বেদনা অনুভব না করে পারলাম না।

পরের দিন খুব ভোরে ঘুম ভাঙালা, পায়জামা পরেই সাঁতার-দীঘির চার পাশে কয়েকবার চক্কর দিলাম। বাতাসে ভেসে আসছে তালপাতার মর্মর। একটু পরে পূবের আকাশ রাঙিয়ে সূর্য উঠলো।

বাইরে বেতের কুর্সিতে বসে সবে গরম কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে

যাবো, টেনেনবাম এলো। আমি জিগেস করলাম, 'কি ব্যাপার, এই সাত সকালে ?'

টেনেনবাম ঘড়ি দেখলো। 'হল্টেরও আসার কথা আছে। কাল ও মিস্টার সিলভারসের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছিলেন। উনি জানিয়েছেন আপনার অন্য কোনো কাজ করাতে ওর কোনো আপত্তি নেই, তবে সকাল আর দুপুরগুলোর জন্যে। বিকেল আর সন্ধ্যেগুলোয় উনি আপনাকে ছাড়তে পারবেন না।'

'তার মানে তুমি বলতে চাও উনি আমাকে ইতিমধ্যেই হল্টের কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন ?'

'না, ঠিক তা নয়। হল্ট প্রথমে আপনাকেই খুঁজেছিলো, কিন্তু না পেয়ে তখন মিস্টার সিলভারসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বাধ্য হয়েছিলো। আসলে আপনাকে ওর সত্যিই বিশেষ প্রয়োজন। আমি তো আগেই বলেছি—এ অঞ্চলে এমন কেউ নেই যে সত্যিকারের বন্দীশিবির দেখেছে।'

'হল্ট সিলভারসের কাছ থেকে কোনো ছবি কিনেছেন কিনা জানো?'

'কিনেছে কিনা ঠিক জানি না, তবে দেখেছিলো জানি!'

নিশ্চয়ই রেনেয়ার আঁকা কয়েকটা বানমাছের মাঝে মৃতদেহের সেই ছোট ছবিটা, যেটা সিলভারস গত তিন বছর ধরে তাঁর ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করছিলেন। ছবিটা উনি নিশ্চয়ই হল্টকে গছিয়েছেন। অথচ আমি ওঁকে কথা দিয়েছিলাম ছবিটা আমি যেভাবেই হোক বিক্রি করে দেবো।

হঠাৎ দেখলাম সাঁতার-দীঘির পাড় ঘুরে হল্ট আমাদেরই দিকে এগিয়ে আসছে—পরণে সবুজ পাজামা, গায়ে দক্ষিণ সমুদ্রের দৃশ্যাবলী আঁকা হাওয়াইন সার্ট। দূর থেকেই আমাকে দেখতে পেয়ে ও হাত নাড়লো।

'এই যে, বব।'

'আরে, জো যে! তারপর, কি ব্যাপার ?'

'আজকাল তোমার তো আর পাত্তাই পাওয়া যায় না।' সম্ভবত

অভ্যেস বশেই হল্ট আমার পিঠে এক থাপ্পড় কষিয়ে দিলো, যেটা আমার বরাবরই অপছন্দ। 'পিকাশোর ছবির দামের জন্যে তোমাকে আর দুঃখ করতে হবে না। আমি তোমার মনিবের কাছ থেকে একটা ছবি কিনেছি, যেটার দামের সঙ্গে উনি সেই লোকসানটা পুষিয়ে নিয়েছেন।'

'বানমাছ সমেত একটা মৃতদেহ?'

'হ্যাঁ, তুমি ঠিক বলেছো! কিন্তু এর মধ্যে উনি আবার তোমাকে কখন বললেন?'

'না, উনি আমাকে কিছু বলেননি। আমি অনুমানেই বুঝতে পেরেছি। তবে আমার ব্যক্তিগত ধারণা তুমি ওঁর সংগ্রহের সব চাইতে ভালো ছবিটাই কিনতে পেরেছো।'

'তাই কি!'

'হ্যাঁ।'

'শুনে সত্যিই খুশি হলাম।'

একথা সেকথার পর হল্ট কাজের কথায় এলো। ও চায় চিত্রনাট্যটা পড়ে যে ভুল-ত্রুটিগুলো আছে তা আমি যেন শুধরে দিই এবং শুধু পোশাক নয়, নাৎসি পটভূমিকায় সমস্ত ছবিটারই যেন উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করি।

'দুটো কাজ কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন,' আমি স্পষ্টই আপত্তি জানালাম। 'চিত্রনাট্যে যদি দেখা যায় অজস্র ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে, তখন কি হবে?'

'নতুন করে লিখতে হবে। কিন্তু তার আগে তুমি একবার চোখ বুলিয়ে ন্যাখো। আমাদের খুব দ্রুত কাজ শুরু করতে হবে···গোলাগুলি ছোঁড়ার বড় দৃশ্যটা কালই তুলতে পারলে ভালো হয়। আচ্ছা, পাণ্ডুলিপিটা তুমি আজই একবার চোখ বুলিয়ে নিতে পারো না?'

সেই মুহূর্তে আমি কোনো জবাব দিলাম না। হল্ট অ্যাটাচি কেস খুলে উজ্জ্বল হলুদ রঙের বাঁধানো একটা খাতা বের করলো।

'মোট একশো সত্তর পৃষ্ঠা। আমার মনে হয় তোমার দু-তিন ঘণ্টার বেশি সময় লাগবে না।'

বাঁধানো খাতাটার দিকে আমি নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে রয়েছি। কাজটা হাতে নেবো, না নেবো না, তখনও পর্যন্ত কিছু ঠিক করতে পারিনি। সম্ভবত আমাকে ইতস্তত করতে দেখেই হল্ট আগ বাড়িয়ে বললো, 'চিত্রনাট্যটা দেখে দেওয়ার জন্যে আমি তোমাকে পাঁচশো ডলার দেবো।'

'দু হাজার ডলার।' ভেবে চিন্তেই আমি দর হাঁকলাম, কেননা নিজেকে যদি বিক্রিই করতে হয়, তাহলে যাতে পুরনো দেনাটা শোধ করা যায় তার চেষ্টা করা উচিত।

'অসম্ভব, বব।'

'তাহলে থাক।' আমি অনীহা দেখলাম। 'তাছাড়া আমি হয়তো এ ব্যাপারে তোমার খুব একটা কাজেও আসবো না।'

'এক হাজার ডলার বব। শুধু তুমি বলেই আমি রাজি হলাম।'

'দু হাজারের কমে আমি রাজি নই, জো। ইমপ্রেসনিস্ট শিল্পীদের আঁকা অমন সুন্দর ছবির সংগ্রহ যার, তার কাছে দু হাজার ডলার কিছুই নয়।'

'তুমি ভুল করছো, বব। টাকাটা আমার নয়···স্টুডিওর।'

'তাহলে তো তোমার আপত্তি করার কোনো প্রশ্নই আসে না।'

'ঠিক আছে, দেড় হাজার ডলার। তুমি আর না কোরো না, বব। এ ছাড়াও উপদেষ্টা হিসেবে তুমি সপ্তায় তিনশো করে ডলার পাবে।'

'বেশ, আমি রাজি। কিন্তু আমার দুটো শর্ত আছে। প্রথমত আমার একটা গাড়ি চাই, দ্বিতীয়ত সন্ধ্যেবেলায় আমার পক্ষে কাজ করা সম্ভব নয়।'

'ও দুটো আমি তোমাকে নিজেই বলতাম। পাণ্ডুলিপিটা আমি রেখে গেলাম। তুমি বরং এখনই শুরু করে দাও, আমাদের সত্যিই খুব তাড়া আছে।

'হাজার ডলার অগ্রিম না পাওয়া পর্যন্ত আমি ওতে হাতই দেবো না।'

হল্ট সন্দিগ্ধ চোখে তাকালো আমার মুখের দিকে। 'তুমি আমাকে বিশ্বাস করো না, বব?'

'বিশ্বাস অবিশ্বাস কোনো প্রশ্নই আসছে না, জো। আমি জানি এটা এখানকার সাধারণ রীতি।'

'ঠিক আছে, চেকটা তুমি বিকেলেই পেয়ে যাবে।'

## সতেরো

চিত্রনাট্যটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তে গিয়ে আমার বেশ কয়েক ঘণ্টা সময় চলে গেলো। যখন শেষ করলাম তখন রাত প্রায় একটা। সমগ্র পাণ্ডুলিপিটার একের তৃতীয়াংশ মনে হলো অসম্ভব, বাকিটা কোনো রকমে খাড়া করা যাবে। চিত্রনাট্যকার নিঃসন্দেহে একজন দক্ষ এবং অভিজ্ঞ লেখক। অজস্র ভালো ভালো দৃশ্য এবং নিষ্ঠুরতম সব ঘটনা পশ্চিমী সিনেমা থেকে ধার করে চালিয়েছেন, কিন্তু জার্মানীতে প্রকৃতপক্ষে যা ঘটেছে বা ঘটছে, সেই তুলনায় একে বলা যায় আনন্দ-উৎসবে পোড়ানো কোনো আতসবাজির মতো। তৃতীয় রাইখের বাস্তবতা এবং নৃশংসতা সম্পর্কে লেখকের সামান্যতমও কোনো ধারণা নেই।

সেদিন রাত্তিরে স্কট একটা ককটেল পার্টি দিয়েছিলো এবং স্বাভাবিক ভাবেই সেই পার্টি স্থানান্তরিত হয়ে গিয়েছিলো সাঁতার-দীঘির ধারে। রাত একটার পর ঘর থেকে বেরিয়ে আমি যখন ওদের সঙ্গে যোগ দিলাম, অধিকাংশ বন্ধুরাই তখন সাঁতার-দীঘিতে ঝাঁপাই জুড়ি শুরু করে দিয়েছে।

আমাকে দেখে স্কট খুশিতে চলকে উঠলো। 'কাজ মিটলো?'

'হ্যাঁ, আজকের মতো। কিন্তু আমার যে কিছু পানীয় চাই, স্কট।'

'রাশিয়ান ভদকা আর কিছু ভালো হুইস্কি রয়েছে। তোমার যা খুশি নিতে পারো।'

'আমি খুব অল্পই একটু হুইস্কি নেবো। আসলে আমি ঠিক মাতাল হতে চাই না।'

স্কট হাসলো। 'কেন, আজ কি তোমাকে কোনো ছবি বিক্রি করতে হবে নাকি?'

'না, আমার অন্য একটা কাজ আছে।'

'বিক্রির মতো তোমার কাছে আর কোনো ভালো ছবি নেই?'

'রেনোয়ার সত্যিই দুটো ভালো ছবি আছে।'

'রেনোয়ার আসল ছবি?'

'নিশ্চয়ই। এত ভালো ছবি হলিউডে আর কারুর কাছে আছে কিনা সন্দেহ।'

স্কট আমার গেলাসটা ভর্তি করে দিলো।

'আচ্ছা বব, তোমার কি মনে হয় ছবিতে টাকা বিনিয়োগ করা ভালো।'

'নিশ্চয়ই।'

'সংভারের চাইতেও?'

স্কটের বলার ভঙ্গিতে আমি না হেসে পারলাম না। 'সিলভারস বরাবরই বলেন ছবিতে বিনিয়োগ করার চাইতে ভালো ব্যবসা নাকি পৃথিবীতে আর নেই। যদিও উনি নিজে তা বিশ্বাস করেন না, তবু সব চাইতে মজার ব্যাপার কি জানো—কথা সত্যিই। যেসব ধোঁকাবাজ লোকেরা এক সময়ে মাটির নিচে তেল আছে বলে ফ্লোরিডার পোড়ো জমি বেশি দামে বিক্রি করেছিলো, কয়েক বছর পরে মাটির নিচে যখন সত্যি সত্যিই তেল পাওয়া গিয়েছিলো, ওরাই হাত কামড়িয়েছিলো, আর ঠকছি জেনেও যারা সেই জমি কিনেছিলো তারাই হয়েছিলো কোটিপতি।'

'আজ রাতে তোমার কাছ থেকে আমার নিজের একটা ছবি কেনার ইচ্ছে আছে। একটু আগেই আমি একটা চেক পেয়েছি।'

'তাহলে রেনোয়ার গাঢ় লাল রঙে আঁকা ছবিটাই তুমি নিও।'

'এ ব্যাপারটা আমি সম্পূর্ণ তোমার হাতেই ছেড়ে দিলাম, বব। আমার মনে হয় তোমার এখন একটা বড় মাপের ভদকা নেওয়া উচিত।'

'বেশ, তাই দাও।'

ডেক চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে আমি গেলাসটা মাটিতে নামিয়ে রাখলাম, চোখ বন্ধ করে শুনতে লাগলাম স্কটেরই কোনো বন্ধুর সঙ্গে করে আনা ছোট রেডিও থেকে ভেসে আসা আশ্চর্য মিষ্টি একটা সুরমূর্ছনা। এক সময়ে যখন চোখ মেললাম, মাথার ওপরে দেখতে পেলাম একরাশ নক্ষত্রখচিত ক্যালিফোনিয়ার উজ্জ্বল আকাশ। মুহূর্তের জন্যে মনে হলো আমি যেন দিগন্তহীন কোনো সমুদ্রে সাঁতার কাটছি। একটু পরেই কাঁধের কাছে শুনতে পেলাম হন্টের কণ্ঠস্বর :

'এই যে, বব!'

'আরে, জো! তুমিও কি স্কটের নৈশ-উৎসবে ছিলে নাকি?'

'না, আমি ছিলাম একটা অন্য উৎসবে। দেখতে এলাম তুমি কি করছো। পাণ্ডুলিপিটা পড়েছো?'

সেই মুহূর্তে আমার আলোচনা করার কোনো ইচ্ছে ছিলো না, তাই বললাম, 'এখনও পর্যন্ত আমাদের চুক্তি শুরুই হয়নি। যা বলার আমি তোমাকে কাল বলবো।'

'এখনই বা বলতে তোমার অসুবিধেটা কোথায়? তুমি ঠিক বুঝতে পারছো না বব, আমাদের সত্যিই খুব তাড়া আছে। এখন জানতে পারলে হয়তো অর্ধেকটা দিন বাঁচতে পারবো।'

হন্টের উদ্বিগ্ন-ব্যাকুল মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম ও সহজে ছাড়বে না। তাছাড়া ঘুমের বড়ি খেয়ে বাকি রাতটুকু বিছানায় ছটফট করার চাইতে বরং মদিরার এই মিষ্টি আমেজ নিয়ে—জল, রূপসী মেয়ে আর এই প্রশান্ত আকাশের নিচে জেগে থাকা ঢের ভালো।

'ঠিক আছে জো, তুমি বরং ওই চেয়ারটা টেনে নাও।'

ঘণ্টাখানেক ধরে আমি পাণ্ডুলিপির যা কিছু ত্রুটি হন্টকে বুঝিয়ে বললাম। 'উর্দি বা আনুসঙ্গিক জিনিসগুলো নিয়ে আমি তেমন মাথা ঘামাচ্ছি না, কেননা ওগুলো সহজেই ঠিক করে নেওয়া যায়। কিন্তু যেটা আমাকে সবচেয়ে অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে ফেলেছে, তা হলো এর পারিপার্শ্বিকতা।

পাশ্চাত্যের অন্যান্য ছবির মতো এটাকেও অতি নাটকীয় রোমাঞ্চকর একটা ছবিতে পরিণত করা উচিত হয়নি। বর্তমানে জার্মানীতে প্রকৃতপক্ষে যা ঘটছে বা ঘটেছে, তা তোমাদের মেলো-ড্রামার চাইতে অনেক বেশি মর্মান্তিক, জো।'

কিছুক্ষণের জন্যে হল্ট এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে কি যেন ভাবলো, তারপর বললো, 'তুমি ভুলে যেও না বব, চলচ্চিত্র একটা ব্যবসা।'

'তার মানে?'

'ইতিমধ্যেই স্টুডিওর দশ লক্ষ ডলার খরচ হয়ে গেছে। আরও বিশ লক্ষ ডলার খরচ হবে। আমরা যদি দর্শকের কথা না ভাবি, টাকাটা একেবারে জলে চলে যাবে।'

'আমি জানি। কিন্তু...'

'তুমি যেভাবে বলছো, ঘটনাগুলো কি সত্যি?'

'নির্মমভাবে সত্যি।'

'কিন্তু কেউ বিশ্বাস করবে না. বব।'

আমি উঠে দাঁড়ালাম। মাথাটা অনেকক্ষণ ধরেই টিপটিপ করছিলো, তার ওপর এত কথা বলার পর তখন আমার আর সত্যিই কিছু ভালো লাগছিলো না। 'ঠিক আছে, যেমন আছে ওই রকমই রেখে দাও।'

'তুমি কিন্তু রাগ করছো, বব।'

'রাগের কোনো প্রশ্নই আসে না, জো। তবে একটা জিনিস ভাবতে আমার সত্যিই অবাক লাগছে—আজও আমেরিকা জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে রয়েছে, তবু তুমি বলবে কোনো আমেরিকানই বিশ্বাস করবে না জার্মানীতে সত্যিকারের কি ঘটছে।'

'আমি তোমাকে অবিশ্বাস করছি না, বব। কিন্তু তুমি যা বলছো স্টুডিও বা দর্শক কেউই বিশ্বাস করবে না, কেননা এই ধরনের ছবি দেখতে তারা ঠিক অভ্যস্ত নয়। ছবির বিষয়বস্তু নির্বাচনের দিক থেকে আমি এমনিতেই যথেষ্ট ঝুঁকি নিয়েছি, তার ওপর তোমার ভাষায় আমি যদি ছবিটাকে আরও বেশি বাস্তব করতে যাই, তাহলে সেটা তথ্যচিত্র ছাড়া

আর কিছুই হবে না। তুমি জানো না বব, স্টুডিও বাস্তবতার চাইতে অতি নাটকীয়তাই বেশি পছন্দ করে।'

'তোমার অসুবিধেটা আমি বুঝতে পারছি, জো। কিন্তু কিভাবে সাহায্য করবো ঠিক বুঝতে পারছি না।'

হুইস্কির বোতল থেকে ঢেলে আমি দুটো গেলাস ভর্তি করলাম, তারপর একটা এগিয়ে দিলাম হল্টের দিকে। কয়েকটা মুহূর্ত নিঃশব্দে কেটে গেলো। আমি স্পষ্টই উপলব্ধি করতে পারলাম—হল্ট হলিউডের আর পাঁচজন চিত্র-পরিচালকের মতো নয়, মনে মনে ভালো কিছু করার ইচ্ছে থাকলেও ওর সত্যিই কোনো উপায় নেই।

'যেভাবেই হোক, সাহায্য তোমাকে করতেই হবে, বব।' হল্ট কাতর মিনতি জানালো। 'আমাদের বাস্তব ভাবনাগুলো হঠাৎ একেবারে চাপিয়ে না দিয়ে আমরা তো একটু একটু করেও এগুতে পারি?'

'ঠিক আছে, আমি আর একটু ভেবে দেখি। তারপর তোমাকে জানাবো।'

বাকি রাতটুকু আর কিছুতেই ঘুমতে পারলাম না। ভোরের দিকে একটু ঝিমুনি এসেছিলো বটে, কিন্তু ঘুম ভেঙে যেতেই হঠাৎ নাতাশার কথা মনে পড়ে গেলো। প্রথম দিকে ওকে পর পর দুটো খুব ছোট চিঠি লিখেছিলাম, কিন্তু ও তার কোনোটারই জবাব দেয়নি। জবাব যে দেবে তেমনটা আশাও করিনি। যতদিন ও আমার কাছে ছিলো, জীবন ছিলো কাণায় কাণায় ভরা। আর আজ ওর স্মৃতি যেন সুদূর নক্ষত্রমালারই মতো নিঃসঙ্গ, বিধুর। মনে মনে ঠিক করলাম ওকে ফোন করবো।

নম্বর চাওয়ার পর অবাক হয়েই আবিষ্কার করলাম ভেতরে ভেতরে আমি উত্তেজিত হয়ে উঠেছি। যেন অনেক অনেক দূর থেকে শুনতে পেলাম ওর কণ্ঠস্বর। বললাম, 'নাতাশা, আমি।'

'কে?'

'আমি, রবার্ট।'

'ও, রবার্ট! তুমি কোথায়? নিউ ইয়র্কে?'

'না, হলিউডে।'

'হলিউডে?'

'হ্যাঁ নাতাশা। কেন, তুমি ভুলে গেছো? কি ব্যাপার, তোমার কি কিছু হয়েছে?'

'না, আমি ঘুমিয়েছিলাম।'

'ঘুমিয়ে ছিলে! এখন?'

'বারে, এখন তো প্রায় মাঝ রাত্তির। তোমার ফোনের শব্দেই আমার ঘুম ভেঙে গেলো।'

তাই তো! ক্যালিফোর্নিয়া আর নিউ ইয়র্কের মধ্যে যে সময়ের পার্থক্য থাকতে পারে, সেটা আমার মাথায়ই ঢোকেনি। 'ঠিক আছে নাতাশা, তুমি শুয়ে পড়ো। আমি বরং তোমাকে কাল ফোন করবো।'

'আচ্ছা। তুমি কি ফিরে আসছো?'

'কয়েকদিনের মধ্যে না। আমি তোমাকে কাল সব বলবো। এখন শুয়ে পড়ো।'

'আচ্ছা।'

মনে মনে ভাবলাম দিনটা আজ শুভ যাবে না। সময়ের ব্যাপারটা আমার খেয়াল করা উচিত ছিলো এবং মাঝ রাতে নাতাশাকে এভাবে ঘুম থেকে টেনে তোলাটা ঠিক হয়নি। শুধু এটা নয়, অনেক কিছুই করা আমার ঠিক হয়নি। হল্টের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ারও আমার কোনো প্রয়োজন ছিলো না। যদিও এর জন্যে আমার কি ক্ষতি হতে পারে, বুঝতে না পারলেও, মনে মনে আমি নিজেই নিজের ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলাম। সিগারেট ধরিয়ে বেশ খানিকক্ষণ অপেক্ষা করার পর কানকে ফোন করলাম। আমি জানি কানের ঘুম খুব পাতলা এবং মোটামুটি ও বেশ ভোরেই ওঠে।

এবার আমার আর হিসেবে ভুল হয়নি। সঙ্গে সঙ্গেই দূরভাষের ওপার থেকে কানের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। 'কে, রবার্ট?'

'হ্যাঁ।'

'কি ব্যাপার? কারমেনের কি কিছু হয়েছে?'

'না না, কিছু হয়নি। আমি ওর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। কথাবার্তা শুনে মনে হলো ও ঠিক এখনই ফিরতে চায় না।'

মুহূর্তের জন্যে অপর প্রান্ত থেকে কানের কোনো সাড়াশব্দ পেলাম না।

'শোনো রবার্ট, ও তো খুব বেশিদিন হলিউডে যায়নি···পরে হয়তো ওর মত বদলাতেও পারে। তোমার কি মনে হয় কারুর সঙ্গে ওর আলাপ হয়েছে?'

'আমার তা মনে হয় না। আমি যতটুকু জানি, বাড়িউলি ছাড়া ও আর কাউকেই চেনে না।'

কান হাসলো। 'তারপর তোমার খবর কি? কবে ফিরছো?'

'খবর মোটামুটি ভালোই। কবে ফিরবো এখনও ঠিক বলতে পারছি না।'

এখানে আসার পর থেকে ফোন করার আগে পর্যন্ত সমস্ত ঘটনাই ওকে সংক্ষেপে বললাম, বিশেষ করে হন্টের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার ব্যাপারটা।

'শোনো রবার্ট, আমি জানি বরাবরই তুমি খুব সতর্ক। তোমাকে নতুন করে সাবধান করে দেওয়ার কিছু নেই। তাছাড়া এর মধ্যে তোমার এত দ্বিধার কি কারণ থাকতে পারে আমি বুঝতে পারছি না। আজ না হোক কাল, কাউকে না কাউকে এ কাজ করতেই হতো। নাৎসিদের মুখোস খুলে দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের সবারই। তবে তুমি যদি হলিউডের নোংরামির কথা বলো, তাহলে অবশ্য আলাদা কথা। সেক্ষেত্রে বলবো গ্রাফেনহেইমের কথা স্মরণ রেখে চোখ-কান খোলা রাখবে। কেননা আমি বিশ্বাস করি ছোট্ট একটা দুর্বলতার মুহূর্তেই উনি আত্মহত্যা করেছিলেন। উনি ভালো করেই জানতেন যে স্ত্রীর সঙ্গে আর কোনোদিনই একত্রে বাস করতে পারবেন না।'

'ওঃ, ভালো কথা,' হঠাৎ মনে পড়ায় আমি জিগেস করলাম, 'বেটি

কেমন আছে ?'

'এখনও সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ও কিছুতেই মরবে না। ওর মানসিক শক্তিতে ডাক্তাররাও অবাক হয়ে গেছে। যাই হোক, এবার ছেড়ে দাও। নইলে একটা টেলিফোনের জন্যেই তোমার অনেক খরচ পড়ে যাবে।'

আমি দ্রুত বাধা দিলাম। 'না না, ও জন্যে তুমি কিছু ভেবো না।'

'কেন, এরই মধ্যে তুমি খুব বড়লোক হয়ে গেছো নাকি ?'

'না, এখনও হইনি।'

রাত্তিরে স্কট আমাকে ওর ঘরে পানের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলো। আমি নিজে হাতে ওর ঘরে রেনোয়ার ছবিটা টাঙিয়ে দিলাম। টেবিলের ওপর ছাইদানা থেকে উপছে পড়া পোড়া সিগারেটের টুকরোগুলো একপাশে সরিয়ে স্কট চেক লিখে দিলো।

'তুমি জানো না বব, আজ আমি রেনোয়ার একটা ছবির জন্যে নিজে হাতে তোমাকে চেক লিখে দিচ্ছি, অথচ ছোটবেলায় একদিন খবরের কগজ বিক্রি করে, হোটেলের ডিস ধুয়ে আমার জীবন শুরু করেছিলাম।'

ইওয়ার একটা নিঃস্ব পরিবারে জন্ম থেকে শুরু করে ওর বহু বিচিত্র জীবনের অভিজ্ঞতার কথা শুনতে শুনতে আমার নিজের জীবনেরই নানান ঘটনার কথা মনে পড়ে যাচ্ছিলো।

নেশাটা রীতিমতো জমে ওঠার পর আমি নিজের ঘরে ফিরে এলাম। উজ্জ্বল বিজলী-বাতিটাকে ঘিরে উড়ছে স্বচ্ছ, সবুজ পাখা একটা পতঙ্গ। নির্নিমেষ চোখে আমি কিছুক্ষণ পতঙ্গটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। পাখায় দুর্লভ কারুকার্য করা পতঙ্গটা চঞ্চল প্রাণের আবেগে মুহূর্তের জন্যে কোথাও স্থির থাকতে পারছে না, নিজেকে আত্মাহুতি দেবে বলে আলোর চারপাশে অন্ধের মতো কেবলই ঘুরছে। পতঙ্গটাকে ধরে আমি বাইরের অন্ধকারে ছেড়ে দিলাম। মিনিটখানেক পরে ওটা আবার ফিরে এলো। বুঝতে পারলাম যার দুর্নিবার আকর্ষণে পতঙ্গটা ফিরে এসেছে, সেই

আলোটাকে নিভিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত ওটাকে কিছুতেই বাঁচানো যাবে না। স্কটের দেওয়া চেকটা একটা বইয়ের মধ্যে গুঁজে রেখে আলো নিভিয়ে আমি শুয়ে পড়লাম।

রঙিন স্বপ্নের মতো মিষ্টি একটা আমেজে সবে চোখের পাতাদুটো জুড়ে আসছে, হঠাৎ অস্পষ্টতম একটা শব্দে ঘুম ভেঙে গেলো। অন্ধকার দরজার পটভূমিতে দেখলাম একটা ছায়ামূর্তি। অজানা-অচেনা জায়গায় আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই আমি হাত বাড়িয়ে আলোটা জ্বেলে দিলাম। ছায়ামূর্তিটা অল্পবয়েসী একটা মেয়ের, পরণে অবিন্যস্ত পোশাক।

বিহ্বল চোখে আমাকে তাকিয়ে থাকতে দেখে মেয়েটিই আগ বাড়িয়ে বললো, 'ক্ষমা করবেন, আমি কি ভেতরে আসতে পারি ?'

'কিন্তু আপনি কি সুনিশ্চিত যে আপনি ঘর ভুল করেননি ?'

কয়েক পা এগিয়ে এসে মেয়েটি হাসতে হাসতে জবাব দিলো, 'না, এত রাতে এখন আর ভুল বা ঠিক ঘরের কোনো প্রশ্নই আসে না। একটা পার্টিতে যোগ দেওয়ার জন্যে আমাকে কয়েকজন নিয়ে এসেছিলো। অসম্ভব ক্লান্ত ছিলাম বলে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু ঘুম ভাঙার পর ওদের কাউকেই আর দেখতে পেলাম না। ভোরে বাস ধরতে না পারা পর্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করতেই হবে। বাইরে যা ঠাণ্ডা, শুধু রাতটুকু আপনার এখানে বসে কাটিয়ে দিতে চাই।'

'আপনি তো আমেরিকান নন, তাই না ?'

'না, মেক্সিকান। আমার জন্মভূমি গুয়াদালাজারা।'

'নরম গদি আঁটা সোফাটা বেশ বড়। ওখানে আপনার শুতে কোনো অসুবিধে হবে না। আমি একটা পায়জামা আর কম্বল দিচ্ছি। স্নানঘরে গিয়ে ভিজে পোশাকটা ছেড়ে ফেলুন। তেমন ঠাণ্ডা লাগলে গরম জলে স্নানও করতে পারেন।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি আপনাকে আর একটুও বিরক্ত করবো না।'

মেয়েটার মুখখানা ভারি মিষ্টি। সবার আগে যা চোখে পড়ে ওর একরাশ কোঁকড়ানো ঘন কালো চুল। মেয়েটাকে দেখে আমার কেনই

যেন স্বচ্ছ পাখা সেই সবুজ পতঙ্গটার কথা মনে পড়ে গেলো। পায়জামা আর কম্বল নিয়ে মেয়েটা স্নানঘরে চলে গেলো। আমি কিন্তু পতঙ্গটাকে আর কোথাও দেখতে পেলাম না। কলতলায় অনেকক্ষণ ধরে জলের শব্দ আর বিচিত্র সব আওয়াজ শুনতে শুনতে এক সময়ে গভীর ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরের দিন ঘুম ভাঙলো বেশ বেলায়। মেয়েটি তখন চলে গেছে। তাড়াতাড়ি বই হাতড়ে দেখলাম চেকটা ঠিকই আছে। শুধু তাই নয়, অন্য কিছুও খোয়া যায়নি। তোয়ালেতে লেগে রয়েছে ঠোঁট রাঙানিয়ার দাগ—বেপুথ একটা রাতের স্মৃতিচিহ্ন। মেয়েটির সঙ্গে সংগম করেছিলাম নাকি ঠিক মনে নেই, শুধু এইটুকু মনে আছে—কোনো এক সময়ে শয্যায় অনুভব করেছিলাম ওর কোমল নগ্ন দেহের স্নিগ্ধ মাধুরিমা।

বিকেলে সিলভারসের হোটেলে গিয়ে স্কটের চেকটা ওঁর হাতে দিলাম। উপেক্ষা ভরেই চেকটা উনি টেবিলের ওপর ফেলে রাখলেন। 'আর অন্য ছবিটা? ওটা তুমি এখনও বিক্রি করোনি?'

'সেটা তো আপনি নিজে চোখেই দেখতে পাচ্ছেন!' রেগে যাওয়া সত্ত্বেও আমি নিজেকে সামলে রাখলাম। 'অন্য ছবিটা বিক্রি করলে টাকার অঙ্ক এর দ্বিগুণ হতো।'

'কিন্তু দুটো ছবি তুমি একই সঙ্গে বিক্রি করতে পারতে।'

'আগে জানা থাকলে আমি আলাদা করে কোনো ছবি বিক্রি করতাম না।'

'আর করলেও অন্য ছবিটা তোমার আগে বিক্রি করা উচিত ছিলো! কেননা রেনোয়ার দুটো ছবির মধ্যে যেটা তুমি বিক্রি করেছো, তুলনামূলক ভাবে ওটাই অনেক ভালো ছিলো।'

কোনো কথা না বলে আমি জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলাম। এক সময়ে উনি বললেন, 'আজ রাতে একটা উৎসবে আমাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।'

'কখন?'

'দশটায়।'

'আমন্ত্রণটা কি নৈশ ভোজের?'

'না, নৈশভোজের পরে। আসলে অন্য একটা কাজ থাকায় নৈশ-ভোজের ঠিক সময় করে উঠতে পারবো না।'

'উৎসবটা কোথায়?'

'ভিলা ওয়েলারে।'

'ওখানে কি আমার নির্দিষ্ট কোনো ভূমিকা আছে?'

'হ্যাঁ, গর্গার একটা ছবি তোমাকে নিয়ে যেতে হবে। আগে থেকে বেশ ভালো একটা জায়গায় ছবিটাকে টাঙিয়ে রেখে দিও, যাতে সবার নজরে পড়ে। টাঙানো ছবি বিক্রি করা অনেক সহজ। ছবিটা এখনই নিয়ে যেতে পারলে ভালো হয়। তুমি বরং একটা ট্যাক্সি নিয়ে যাও।'

'কোনো দরকার নেই। আমার গাড়ি আছে।'

'কি বললে!'

'স্টুডিও থেকে আমাকে একটা গাড়ি দেওয়া হয়েছে। আমি যখন খুশি ওটাকে ব্যবহার করতে পারি।'

সিলভারস এমন ভাবে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন যেন আমি ওঁর অচেনা কেউ। অন্তত সেই মুহূর্তের জন্যে আমার নিজেকে কেউ-কেটা মনে হলো, অবশ্য আমি ওঁকে আর বললাম না যে ওটা একটা পুরনো ফোর্ড।

'ঠিক আছে, তাহলে ছবিটা এখনই নিয়ে যাও, আর সাড়ে নটায় এখান থেকে আমাকে তুলে নিও।'

ছায়াছবি দেখানোর একটা ঘরোয়া উৎসবের মাঝামাঝি সময়ে আমরা ভিলা ওয়েলারে এসে পৌঁছলাম। হলিউডে প্রযোজক এবং পরিচালকদের মধ্যে এটা অত্যন্ত প্রচলিত একটা রীতি—চিত্রতারকা আর বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের নৈশভোজের আসরে আমন্ত্রণ জানিয়ে তাঁদের সাম্প্রতিক ছবি

দেখানো। সিলভারসের পরণে ছিলো নৈশভোজের উপোযোগী দামী রেশমী জাকেট আর আমার পরণের শুধু নীল স্যুট। স্বল্প আলো-আঁধারেই অনেকে আমাকে চিনতে পেরে যখন আন্তরিক অভ্যর্থনা জানালো, সিল-ভারস তখন গাম্ভীর্যের মুখোশ এঁটে চুপচাপ বসে রইলেন।

বেশ কিছুক্ষণ পর ছবি শেষ হতেই আলো জ্বলে উঠলো, আর ঠিক তখনই বিপুল বিস্ময়ে আবিষ্কার করলাম অতিথিদের মধ্যে হল্ট আর টেনেনবামও রয়েছে। আমাকে দেখেই হল্ট পিঠে এক থাপ্পড় বসিয়ে দিলো। 'আরে জো, তুমি!'

'কি ব্যাপার, যখনই যেখানে যাই, দেখি আমরা এক জায়গায় রয়েছি। এটাও কি হলিউডের একটা রীতি নাকি?'

'একটা জিনিস তুমি ভুল করছো, বব,' হল্ট ভর্ৎসনার চোখে তাকালো। 'ওয়েলার আমাদের প্রযোজক। ওঁনার স্টুডিওই তো আমাদের ছবিটা করছে।'

'ওমা, তাই নাকি!'

হল্ট অবাক হলো। 'কেন, তুমি জানতে না?'

'বারে, আমি কেমন করে জানবো?'

'দাঁড়াও, আমি ওঁকে খবর দিচ্ছি। তোমাকে দেখলে উনি সত্যিই খুব খুশি হবেন।'

'আমি মিস্টার সিলভারসের সঙ্গে এসেছি। আসলে আমাদের এখানে আসার অন্য একটা উদ্দেশ্য আছে।'

'সেটা আমি বুড়ো ভামটাকে দেখেই বুঝতে পেরেছি। কিন্তু তুমি আমাদের নৈশভোজের আসরে এলে না কেন? বিশ্বাস করো, রীতিমতো ভুরিভোজের আয়োজন করা হয়েছিলো।'

মিস্টার সিলভারস নৈশভোজের জন্যে ঠিক সময় করে উঠতে পারেননি।'

'মিস্টার সিলভারসকে নৈশভোজে নিমন্ত্রণ করা হয়নি। কিন্তু তুমি আসতে পারতে। তোমাকে পেলে মিস্টার ওয়েলার অসম্ভব খুশি হতেন,

কেননা তোমার সম্পর্কে উনি সবই জানেন।'

অল্পক্ষণের মধ্যেই উপলব্ধি করতে পারলাম আমি ওদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু আর সিলভারস নিতান্তই একজন বাইরের লোক। অতিথিদের অধিকাংশই দেখলাম বয়েসে তরুণ আর আশ্চর্য সুন্দর দেখতে। এদের মধ্যে কয়েকজন আবার অত্যন্ত জনপ্রিয় চিত্রতারকা। মনে মনে ভাবলাম যাকে যত সুন্দর দেখতে হলিউডে নিশ্চয়ই তার কদর তত বেশি!

গোলগাল বিটকেল চেহারার একজন বয়স্ক লোকের সঙ্গে হল্ট আমার পরিচয় করিয়ে দিলো। উনিই মিস্টার ওয়েলার। ভদ্রলোকের চেহারা যেমনই হোক না কেন, ব্যবহার অত্যন্ত অমায়িক। আমার ধারণা ছিলো—স্টুডিওর মালিক যখন, নিশ্চয়ই নাক উঁচু ধরণের অসম্ভব দেমাকি মানুষ হবেন। কিন্তু ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতোই উনি সবার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করলেন আমিই সেই মানুষ যে এক সময়ে বন্দীশিবিরের ভেতরে ছিলো এবং অসাম সাহসের সঙ্গে সশস্ত্র প্রহরীদের চোখে ধুলো দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলো। ফলে অনেকেই আমার সঙ্গে আলাপ করার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠলো। এদের মধ্যে কয়েকজন ছিলো আবার চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়ার মতো আশ্চর্য রূপসা—যাদের উষ্ণ সান্নিধ্যে আমি হয়ে উঠলাম দুর্ধর্ষ এক প্রবাদপুরুষ। যদিও হল্টকে দোষ দেওয়ার মতো কিছুই ছিলো না, তবু মনে মনে আমি ওর ওপর খাপ্পা হয়ে উঠছিলাম আর ধমণীর প্রতিটা শিরা-উপশিরায় অনুভব করছিলাম রোমাঞ্চকর একটা শিহরণ।

## আঠারো

সপ্তা দুয়েক পরে সিলভারস হলিউড ছেড়ে চলে গেলেন। এখানে ওঁর প্রসার তেমন জমেনি। স্বাভাবিক ভাবেই ওঁর মনে হয়েছে নিউ ইয়র্কের চাইতে এখানে ব্যবসা করা কঠিন। এখানে প্রাচুর্য আর প্রচার একই সঙ্গে হাত ধরাধরি করে চলে। সেই তুলনায় নিউ ইয়র্কের বন্ধু-মহলে ওঁর পরিচিত

অনেক বেশি। আসলে হলিউডে কেউ ওঁকে তেমন পাত্তা দেয়নি। এখনকার যাকিছু ধ্যান-ধারণা, আনন্দ-বেদনা সবই চলচ্চিত্রকে কেন্দ্র করে, চিত্রকলা-সংগ্রহকারীর ওপর নজর দেবার কেউ কোনো প্রয়োজনই বোধ করেনি।

যদিও গর্গার ছবিটা শেষ পর্যন্ত উনি মিস্টার ওয়েলারকে গছাতে পেরেছিলেন, তবু এর জন্যে নিতান্ত অনাস্থা সত্ত্বেও ওঁকে আমারই ওপর নির্ভর করতে হয়েছিলো। কেননা মিস্টার ওয়েলারের চোখে অন্তত ফ্যাসি-বিরোধী ছবিটার প্রয়োজনে, সিলভারসের চেয়ে আমার ভূমিকা ছিলো অনেক গুরুত্বপূর্ণ, যেটা সিলভারসের অহমিকায় আঘাত হেনেছিলো সব চাইতে বেশি। যাবার তুদিন আগে উনি আমাকে স্পষ্টই বলেছিলেন, 'ঠিক আছে, তোমার যদি ইচ্ছে হয় থাকো; আমি কিন্তু আর এইসব অসভ্য লোকদের মধ্যে থাকছি না।' যাবার সময় আমাকে অবাক করে দিয়েই আমার বিক্রি করা ছবির ওপর উনি সামান্য কিছু লভ্যাংশ দিয়েছিলেন, যা আমি স্বপ্নেও ওঁর কাছ থেকে আশা করিনি। 'নিজের ছেলের মতো আমি তোমাকে সবকিছু শিখিয়েছি। আর কেউ হলে অর্ধেক দিন অন্য কোথাও কাজ করার অনুমতিই দিতো না, কিংবা তোমার মাইনে অর্ধেক কেটে নিতো। কিন্তু আমি তা চাই না।' আমি আর ওঁনার মুখের ওপর স্পষ্ট বলতে পারিনি যে অন্য কেউ হলে আমার প্রাপ্য লভ্যাংশ থেকেও বঞ্চিত করতো না।

স্কটের ক্যাডিলাকে করে আমি ওঁকে ইস্টিশনে পৌঁছে দিয়েছিলাম। মিথ্যে করেই বলেছিলাম যে আমার কাজে খুশি হয়ে স্টুডিও পুরনো ফোর্ডের পরিবর্তে এই নতুন ক্যাডিলাকটা দিয়েছে। আমি জানি সিল-ভারস এতে আরও বেশি মর্মাহত হবেন, কেননা মনিব হয়েও নিউ ইয়র্কে উনি নিতান্তই সাধারণ একটা ক্রাইসলারে চড়েন।

যথারীতি সেদিনও সকালে আমি স্টুডিওতে গিয়ে হাজির হলাম। উপদেষ্টা হিসেবে আমার কাজ খুব সহজ, কিন্তু আবেগবিধুর অতি

নাটকীয়তার কবল থেকে পাণ্ডুলিপিটাকে উদ্ধার করার কাজ ছিলে সত্যিই খুব কঠিন। কেননা হল্টকে আমি কিছুতেই বোঝাতে পারিনি বন্দীশিবিরের পরিচালক যারা, ক্ষমতাসীন সেইসব আমলাদের নিরপরাধ অসহায় মানুষদের হত্যার লিপ্সা কি ভয়ঙ্কর। দেশের সুনাগরিক, তৃতীয় রাইখের বিশ্বস্ত বন্ধু যারা, পবিত্র 'কর্তব্য'-এর খাতিরে ঠাণ্ডা মাথায় মানুষ খুন করাটা তাদের কাছে যেন খেলনা তৈরি কিংবা জলের কল লাগানোরই মতো সহজ ব্যাপার। এমনই সহজ ব্যাপার যে সবকিছু মিটে যাবার পর ওরা আবার যার যার কাজে ফিরে যাবে—কেউ কেরানি, কেউ মুদি, কেউ বা আবার সরাইওয়ালা। অনুতপ্ত হওয়া তো দূরের কথা, অতীতে যে সামান্যতমও কোনো অন্যায় করেছে, সেকথা ওদের একবারও মনে হবে না। দায়িত্বজ্ঞানহীন, এমন কি অপরাধবোধবিহীন ভাবে ওরা এই যে দিনের পর দিন মানুষ খুন করে চলেছে—এই নৃশংস অমানবিকতাটা চিত্র-নাট্যে কোথাও ধরা পড়েনি।

'কিন্তু তুমি যা বললে সেসব কথা কেউ বিশ্বাস করবে না, বব। যত অমানবিকই হোক, এর পেছনে যে একটা মানবিক উদ্দেশ্য আছে সেটা তোমাকে দেখাতেই হবে।'

'কেমন করে সেটা সম্ভব? জার্মানীতে যত অপরাধ সংঘঠিত হয়েছে তা ঘটিয়েছে জার্মানীরই মানুষ, মঙ্গলগ্রহ থেকে আসা মানুষেরা নয়। জার্মান শিল্পসংস্থায় আরও বেশি মুনাফা লোটার জন্যে মানবিক উদ্দেশ্য-বিহীনভাবেই দাসবন্দীশিবিরগুলোকে খোলা হয়েছে। দাস-শিবিরের সঙ্গে চুক্তি অনুসারে প্রতিনিধিস্থানীয় শিল্পসংস্থাগুলোতে বন্দীদের পাঠানো হয় দিনে ষোলো ঘণ্টা করে খাটার জন্যে। এমনি ভাবে দিনের পর দিন অনাহারে ষোলো ঘণ্টা করে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করতে করতে যেদিন শরীরের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়, ওদের পাঠিয়ে দেওয়া হয় বৈদ্যুতিক চুল্লিতে।'

'কথাটা সত্যি হতে পারে না।' অবিশ্বাসের সুরেই হল্ট প্রতিবাদ জানালো।

'কথাটা সম্পূর্ণ সত্যি। শুধু তাই নয়, যানবাহনের খরচ বাঁচানোর জন্যে বড় বড় কয়েকটা শিল্পসংস্থা গড়ে তোলা হয়েছে বন্দীশিবিরগুলোর ঠিক পাশেই।'

'আমরা এসব ব্যবহার করতে পারি না। কেউ বিশ্বাস করবে না বব।'

'কিন্তু যে দেশ জার্মানীর বিরুদ্ধে লড়ছে, যে দেশের শত্রু জার্মানী—সে দেশের মানুষও কি একথা বিশ্বাস করবে না?'

'অন্তত চলচ্চিত্রে নয়।'

আমি স্পষ্টই বুঝতে পারলাম হল্টের সঙ্গে মিছিমিছি তর্ক করে কোনো লাভ হবে না। আমি যাই বলি না কেন ও বিশ্বাস করবে না, ওর ধারণা এসবই আমার কপোলকল্পিত। তাছাড়া ছবিটা সম্পর্কে হয়তো ও আগে থেকেই একটা মনগড়া ধারণা গড়ে নিয়েছে. যা থেকে এখন আর ফিরে যাওয়া ওর পক্ষে সম্ভব নয়।

তিক্ত একটা হতাশা নিয়েই আমি স্টুডিও থেকে ফিরে এলাম। আমেরিকায়, এই শত্রুর দেশেও, জার্মানীতে যা ঘটেছে, এমন কি এখনও পর্যন্ত যা ঘটেছে, তা যদি কেউ বিশ্বাস না করে তাহলে যখন ফিরে যাবো তখন তার চেহারাটা কি দাঁড়াবে ভাবতেও আমি মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠলাম।

পরে মাসে আমি বেশ কয়েকটা ছবি বিক্রি করলাম। এর মধ্যে ছিলো তেল রঙে আঁকা দেগার বেশ বড় একটা ছবি 'নাচের মহড়া'। ছবিটা আমি মিস্টার ওয়েলারকে বিক্রি করেছিলাম। সিলভারসকে জানানোর সঙ্গে সঙ্গেই উনি 'নাচের মহড়ার' ছবিটার জন্যে আমার লভ্যাংশ কেটে দিয়েছিলেন, কারণ হিসেবে জানিয়েছিলেন ছবির ক্রেতা ওঁনার খদ্দের।

হল্ট আমার কাছ থেকে প্যাস্টেলে আঁকা রেনোয়ার একটা ছবি কিনেছিলো, যেটা সে পরের সপ্তায় এক হাজার ডলার লাভে বিক্রি করে দিয়েছিলো। উৎসাহ পেয়ে হল্ট আর একটা ছবি কিনেছিলো, সেটাতেও তার লাভ হয়েছিলো তুহাজার ডলার।

'আচ্ছা, আমরা তুজনে মিলে ছবি বিক্রির একটা ব্যবসা করতে পারি না?' হল্ট আমাকে জিগেস করেছিলো।

'ছবি বিক্রির ব্যবসায় সুপ্রচুর মূলধন লাগে।'

'প্রথমে আমরা ছোট করে শুরু করতে পারি। ব্যাঙ্কে আমার কিছু টাকা আছে।'

আমি রাজি হইনি। সিলভারসের প্রতি বিশ্বস্ততার জন্যে নয়, ক্যালিফোর্নিয়ার প্রতি আমি তেমন আকৃষ্ট হতে পারিনি বলে। সাময়িক উত্তেজনার কথা বাদ দিলে, ক্যালিফোর্নিয়া আমার কাছে মনে হয় জাপান আর ইউরোপের মাঝে বায়ুশূন্য অদ্ভুত একটা জায়গা, যেখানে আমার অস্তিত্বের কোথাও কোনো মূল্য নেই। তাছাড়া, এটাও বুঝতে পেরেছি, আমেরিকায় আমি চিরকাল বাস করতে পারবো না। এখানে যত দিন থাকা সম্ভব, নিউ ইয়র্কে থাকতে পারলেই আমি সব চাইতে খুশি হবো।

শেষের কটা সপ্তাহ আমি হল্টের ছবিটার খুটিনাটি বিষয়ের উপদেষ্টা হিসেবেই বহাল ছিলাম, কিন্তু চিত্রনাট্যের ব্যাপারে ওরা আমার কোনো সহযোগিতা চায় না দেখে আমিও আর কিছু উচ্চবাচ্য করিনি। আসলে হল্ট, এমন কি মিস্টার ওয়েলারেরও ধারণা ওঁরা এ ব্যাপারে আমার চাইতে অনেক ভালো বোঝেন। ছবিটা শেষ হয়ে যাবার পরেও, আর কয়েকটা দিন এখানে থেকে যাবো বলে মনস্থ করলাম। সিলভারসের রেখে যাওয়া ছবির তখনও যেকটা অবশিষ্ট ছিলো, বিক্রি করতে পারলে আর কিছু না হোক হাতে হাতে কিছু টাকা পাওয়া যাবে।

কান লিখেছে, 'এখানে তুষার পড়ছে। তুমি কবে ফিরছো? পথে একদিন নাতাশার সঙ্গে দেখা হয়েছিলো। পশুলোমের টুপি আর হাতাবিহীন কোটে ওকে ঠিক আনা কারেনিনার মতো দেখাচ্ছিলো। তোমার খবর জিগেস করায় ও বেশি কিছু বলতে পারলো না। ওর ধারণা তুমি আর কোনো দিনই নিউ ইয়র্কে ফিরে আসবে না। কারমেনের খবর কিছু জানো? আমি আজ পর্যন্ত ওর কোনো চিঠিই পাইনি।'

চিঠিটা যখন এলো আমি সাঁতার দীঘির ধারে বসেছিলাম। পৃথিবী-টাকে মনে হচ্ছিলো, সত্যিই গোল, কেননা আমার দিগন্ত ক্ষণে ক্ষণে কেবলই বদলে যাচ্ছিলো। এক সময়ে জার্মান ছিলো আমার আবাসভূমি তারপর অস্ট্রিয়া, তারপর ফ্রান্স, তারপর প্রায় সারা ইউরোপ, তারপর আফ্রিকা। এবং প্রতিটা জায়গাই, যখন আমি সেখানে ছিলাম তখনই আমার আবাসভূমিতে পরিণত হয়নি, পরিণত হয়েছে পরে, যখন আমি সেখান থেকে চলে এসেছি : আর আমার সেই আবাসভূমি স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে দিগন্তরেখার গায়ে, ঠিক এখন যেখানে নিউ ইয়র্ককে দেখতে পাচ্ছি। হয়তো আবার একদিন যখন নিউ ইয়র্কে ফিরে যাবো, ক্যালিফোর্নিয়াকে দেখতে পাবো আমার নতুন দিগন্তরেখায়।

পোশাক পালটে আমি কারমেনের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। ও সেই একই বাংলোতে রয়েছে। কোথাও কিছু পালটেছে বলে মনে হলো না। সাধারণ কুশল বিনিময়ের পর আমি সরাসরিই প্রস্তাব রাখলাম।

'আর কয়েকদিনের মধ্যে নিউ ইয়র্কে ফিরে যাচ্ছি। আপনিও তো আমার সঙ্গে যেতে পারেন?'

'আপাতত সম্ভব নয়। আমার চুক্তির মেয়াদ আরও পাঁচ সপ্তার জন্যে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।'

'আপনি কি কোনো ছবিতে অভিনয় করছেন?'

'এখনও পর্যন্ত নয়। তবে আগামী একটা ছবিতে আমাকে সুযোগ দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে।'

'ওরা কিন্তু বরাবরই তাই বলে। আচ্ছা, সত্যি করে বলুন তো আপনি কি নিজেকে একজন অভিনেত্রী হিসেবে মনে করেন?'

'আদৌ না।' কারমেন ঢেউ খেলিয়ে হাসলো। 'শুধু আমি কেন, কেউই তা মনে করে না। কিন্তু আজ আপনাকে এত সুন্দর দেখাচ্ছে কেন, সেই কথাটা আগে বলুন তো?'

'জানি না, হয়তো এই নতুন স্যুটটার জন্যে হতে পারে।'

'উঁহু, সে জন্যে নয়। নিশ্চয়ই ক্যালিফোর্নিয়ার জল হাওয়া আপনার

পায়ে লেগেছে।'

'বলা যায় না, হয়তো তাও হতে পরে। আমি কিন্তু আপনাকে মধ্যাহ্নভোজে নিয়ে যাবার জন্যে এসেছি। যদি চান আমরা রোমানফে যেতে পারি।'

'ও মা, তাই নাকি!' আমাকে অবাক করে দিয়ে কারমেন এক কথাতেই রাজি হয়ে গেলো। 'চলুন।'

রোমানফে নামকরা চিত্রতারকারাও কারমেনের কৌতূহলকে জাগিয়ে তুলতে পারলো না। এমন কি কারমেন পোশাক পালটে আসারও কোনো প্রয়োজন বোধ করেনি। আট-সাঁট সাদা স্ল্যাক্সে ওর অনন্য দেহরেখা যেন আরও দুর্নিবার হয়ে উঠেছে, দীর্ঘ পল্লব-ঘেরা অনিন্দ্য-সুন্দর মুখখানা হয়ে উঠেছে আরও কোমল।

আমি জিগেস করলাম, 'কানের কোনো খবর পেয়েছেন?'

'ও আমাকে প্রায়ই ফোন করে। কিন্তু আপনি ওর কাছ থেকে নিশ্চয়ই কোনো চিঠি পেয়েছেন, নইলে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন না।'

'না না, ও আমাকে কোনো চিঠি দেয়নি,' মিথ্যে করেই বললাম। 'আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি যেহেতু আমি শিগগিরই চলে যাচ্ছি।'

'এত তাড়াতাড়ি ফিরে যাচ্ছেন কেন? এখানে আপনার ভালো লাগে না?'

'না।'

অবাক চোখে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কারমেন কথাটা সত্যি কিনা যাচাই করার চেষ্টা করলো। সেই মুহূর্তে ওকে ঠিক অল্প বয়েসী লেডি ম্যাকবেথের মতো দেখাচ্ছিলো। ঠোঁটের কোণে দুষ্টুমির একটা হাসি ফুটিয়ে ও বললো, 'বুঝতে পেরেছি, আসলে বান্ধবীর জন্যে আপনার মন কেমন করছে। কিন্তু এখানে তো অজস্র মেয়ে রয়েছে···বিশেষ করে

হলিউডের মেয়েরা কেউ কারুর চেয়ে কম রূপসী নয়।'

'কথাটা কিন্তু সত্যিই অর্থহীন।'

কারমেন আবার ঢেউ খেলিয়ে হেসে উঠলো। 'তাই কি ?'

আজ দেখা হওয়ার মুহূর্তে মনে হয়েছিলো, এখন আরও বেশি করে মনে হলো—কারমেন যেন একটু পালটেছে। ইচ্ছে করেই ওকে খোঁচা দেবার জন্যে বললাম, 'নাঃ, পুরুষদেব সম্পর্কে দেখছি আপনার আদৌ কোনো ধারণা নেই।'

'সত্যিই কিন্তু তাই। সব পুরুষকে আমার কেমন যেন একই রকম মনে হয়।'

'কানের সঙ্গে আলাপ হবার পরেও আপনি একথা বলছেন !'

ওর সম্পর্কেই বিশেষভাবে বলছি। ওকে আমার সত্যিই ভীষণ বিরক্তিকর মনে হয়।'

'কি বল্লেন !'

'বিরক্তিকর।' নির্মল হাসিতে ঢেউ তুলে কারমেন পুনরাবৃত্তি করলো। 'প্রথমে ও চেয়েছিলো আমি হলিউডে আসি, এখন চাইছে আমি আবার ফিরে যাই। আমি কিন্তু আর যাচ্ছি না। নিউ ইয়র্কে এখন তুষার পড়ছে। সেই তুলনায় এখানে অনেক বেশি গরম।'

'এটাই কি একমাত্র কারণ ?'

কারমেন মাথা নাড়লো। 'নিশ্চয়ই না। ওখানে গেলে আমি সত্যিই পাগল হয়ে যাবো। আমি খুব সাধারণ। কিন্তু কান যখনই কিছু বলে, আমার মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করে। আমি ওর কথা কিচ্ছু বুঝতে পারি না।'

'আপনি হয়তো ঠিক জানেন না, কথা বলতে পারা বা না-পারার চাইতে ওর অনেক বড় গুণ আছে। ও সত্যিকারের একজন কর্মী, ও বিপ্লবী। আমাদের চোখে ও বীর।'

'বীরেদের বেঁচে থাকার কোনো প্রয়োজন নেই, ওদের মরাই উচিত। ওরা যদি এখন এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্যে ফিরে আসে, পৃথিবীটা

তাহলে বিরক্তিকর সব মানুষের ভিড়ে ভরে যাবে।'

'একথা আপনাকে আবার কে বললো?'

'এসব কথা কারুর বলার দরকার হয় না। আপনি ভাবেন আমি অসম্ভব বোকা, তাই না? কানও তাই ভাবে।'

'আমি কোনো দিনই আপনাকে বোকা ভাবিনি, কানও নয়। বরং কান আপনাকে রীতিমতো শ্রদ্ধা করে।'

'ওতে আমার আরও বেশি মাথা ধরে যায়। আচ্ছা, আপনারা কেন স্বাভাবিক হতে পারেন না বলতে পারেন?'

'তার মানে?'

'তার মানে আর পাঁচজন যেমন, সেই রকম। এই আমার বাড়িউলির কথাই ধরুন কেন, কত স্বাভাবিক। অথচ আপনাদের সব কিছুই বিশ্রী রকমের জটিল।'

পরিচারক আমাদের শেষ পর্বের খাবার দিয়ে গেলো— ম্যাসিদোইন দ্য ফ্রুটস! কারমেন হাসতে হাসতে বললো, 'অনেকটা এই খাবারের গালভরা নামের মতো। সামান্য একটু সুরায় ভেজানো ফলের এই টুকরোগুলোর জন্যে এমন উদ্ভট নাম দেবার কোনো প্রয়োজন ছিলো না।'

'কিন্তু এমনও তো হতে পারে,' আমি প্রতিবাদ না করে পারলাম না, 'যে আপনারা সব কিছুকে সহজ করে গ্রহণ করতে পারেন না। সহজ কিছুকে অহেতুক জটিল করে দেখাটাই আপনাদের স্বভাব।'

'হুঁ, তাও হতে পারে।' গভীর ভাবে কি যেন ভাবতে ভাবতেই কারমেন বললো। 'তবে আমেরিকান পুরুষরা অনেক শোভন। ওরা ইউরোপীয়ানদের মতো অমন গোঁয়াড় নয়।'

এতক্ষণে আমার মনে হলো আমি যেন কারমেনকে কিছুটা বুঝতে পেরেছি। ফেরার পথে সম্ভবত প্রসঙ্গ পালটাবার জন্যেই ও বললো, 'আপনার বান্ধবীর খবর কি?'

'ঠিক জানি না। অনেকদিন ওর কোনো খবর পাইনি।'

'চিঠি লেখেন না?'

'চিঠি লেখার ব্যাপারে আমরা দুজনেই অসম্ভব কুঁড়ে।'

কারমেন হাসলো। 'আসলে কি জানেন, চোখের আড়াল হলে সবাই সবাইকেই ভুলে যায়।'

'হ্যাঁ, নির্মম হলেও কথাটা সত্যি। আমি কি কানের জন্যে কোনো সংবাদ নিয়ে যাবো?'

মুহূর্তের জন্যে চুপ করে থেকে কারমেন কি যেন ভাবলো। 'না থাক, মিছিমিছি ওকে আর বিব্রত করার কোনো মানেই হয় না।'

আমি ওকে ওর লালচে-চুল বাড়িওয়ালি আর ছোট ছোট মুরগী ছানাদের কাছে ফিরিয়ে দিলাম। চোখের পলক পড়ার আগেই হঠাৎ বাগান থেকে দুটো মুরগীছানা কুরকুর করতে করতে ছুটে এসে কারমেনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো! কারমেন চকিতে যেন সজীব হয়ে উঠলো। 'এমিলি! প্যাটরিস! চুঁ! চুঁ! হা ভগবান! দেখলেন কাণ্ডটা একবার, আমার সাদা প্যান্টটা একদম নষ্ট করে দিলো!'

পুরনো ফোর্ডটার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললাম, 'ও নিয়ে একটুও মন খারাপ করবেন না, সাবান দিয়ে ধুলেই সব দাগ উঠে যাবে।'

বিদায় জানাবার জন্যে স্কটের ঘরে গেলাম। ও বললো, 'গাঢ় লাল রঙে আঁকা ওরকম কোনো ছবি পেলে আমি আর একটা কিনতাম। জানি না তোমার সঙ্গে আর কোনো দিন দেখা হবে কিনা। ফরাসী শিল্পীর আঁকা তোমার কাছে আর অন্য কোনো ছবি নেই?'

'স্যাংগুইন নেই! তবে কাঠ-কয়লায় আঁকা একটা দুর্লভ ছবি আছে। ওটাও রেনোয়ার আঁকা।'

'দারুণ! রেনোয়ার দু দুটো ছবি আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহে থাকবে আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারছি না!'

সুটকেস থেকে ছবিটা বার করে স্কটের হাতে দিলাম। 'আমার সংগ্রহের এই শেষ ছবিটা অন্য কারুর চাইতে তুমি পেলেই সব চাইতে খুশি হবো, জন।'

'কেন জো? তুমি তো জানো, শিল্পের আমি কিছুই বুঝি না।'

'কিন্তু শিল্পকে তুমি ভালোবাসো, তাকে শ্রদ্ধা করো—আমার সেটাই সবচাইতে ভালো লাগে। বিদায় জন। আশা করি আমাদের এই বন্ধুত্ব চিরকালের জন্যে টিঁকে থাকবে।'

আমেরিকান বন্ধুত্বে অদ্ভুত ধরনের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। কয়েক ঘণ্টা, কখনও কখনও বা কয়েক মিনিটের পরিচয়ে এখানে পরস্পরকে নাম ধরে ডাকে। তার চাইতেও বড় কথা, নিজেদের মধ্যে প্রচলিত নামে পরস্পরকে সম্বোধন করে। হয়তো এ বন্ধুত্বে স্থায়ীত্বের তেমন গভীরতা নেই, তবু সাধারণত এর মধ্যে আন্তরিকতারও কোথাও কোনো ত্রুটি চোখে পড়ে না। ইউরোপের তুলনায় আমেরিকায় বন্ধুত্ব পাতানো অনেক সহজ। হয়তো ইউরোপের তুলনায় এই মহাদেশটা অনেক বেশি তরুণ বলেই সেটা সম্ভব হয়েছে। মনে মনে ভাবলাম বিদায় নেবার মুহূর্তেই সত্যিকারের বোঝা যায় আমাদের বেঁচে থাকার মূল্য।

টেনেনবাম আমাকে ইস্টিশনে পৌঁছে দিলো। নতুন একটা ছবিতে ছোটখাটো অভিনয়ের জন্যে সে ইতিমধ্যেই আর একটা আমন্ত্রণ পেয়েছে। আমি তাকে জিগেস করলাম, 'এবারে তোমার ভূমিকাটা কি?'

'বৃটিশ একটা জাহাজে রাঁধুনির ভূমিকা, যে জাহাজটাকে জার্মান ডুবো-জাহাজ থেকে টর্পেডো ছুঁড়ে বিধ্বস্ত করা হবে।'

'অর্থাৎ অদূর ভবিষ্যতে তোমাকে ডুবে মরতে হবে?'

'না, অচেনা কয়েকজন নাবিক আমাকে পরে উদ্ধার করবে। আসলে ওটা একটা হাস্যকর চরিত্র।'

ঠাট্টা করেই বললাম, 'বুঝতে পেরেছি, আসলে তোমার ভবিষ্যতও অন্ধকার।'

'না না, দেখবেন, একদিন অভিনেতা হিসেবে ঠিক নাম করবো।'

'নিশ্চয়, আমিও তাই চাই।'

'বেটি স্টেইনকে আমার শ্রদ্ধা জানাবেন। কোলার বোনদের বলবেন যত শিগ্‌গির সম্ভব আমি ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করবো।'

যদিও সেই মুহূর্তে মনে পড়লো না যমজ দুই বোনের মধ্যে ঠিক কার সঙ্গে টেনেনবামের পিরিত, তবু বললাম, 'নিশ্চয়ই বলবো!'

'বিদায়, মিস্টার রস।

'বিদায়, টেনেনবাম।'

নিগ্রো পরিচারক ঝকঝকে একটা ট্রেনের কামরায় আমার জিনিস-পত্তর সব গুছিয়ে দিলো। ছোট হলেও কামরাটা সত্যিই ভারি সুন্দর—নরম গদি-আঁটা চওড়া শয্যা, আলাদা প্রক্ষালন কক্ষ। রুমাল উড়িয়ে টেনেনবাম বিদায় জানালো, আমিও জানলা দিয়ে হাত নেড়ে তার প্রত্যুত্তর দিলাম। জীবনে সেই প্রথম আমার মনে হলো কোথা থেকে, ফারুর কাছ থেকে সত্যিকারের বিদায় নিচ্ছি।

## উনিশ

'আরে রবার্ট, তুমি!' খুশির সুরে মেলিকভ বলে উঠলো। 'আমি তো ভেবেছিলাম তুমি বোধহয় আর ফিরবে না।'

'শুধু তুমি একা নও ভ্‌লাদিমির, আরও অনেকেই তাই ভেবেছিলো। কিন্তু কি ব্যাপার, তোমাকে এত রোগা আর ক্লান্ত দেখাচ্ছে কেন? তুমি কি অসুস্থ, ভ্‌লাদিমির?'

'না না, আমি ঠিকই আছি। মেলিকভ হাসলো। 'ক্যালিফোর্নিয়ার চড়া রোদ আর মুক্ত বায়ু থেকে ফিরে আসার পর নিউ ইয়র্কের সবাইকেই মনে হবে বুঝি এইমাত্র হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছে। কিন্তু হঠাৎ ফিরে এলে কেন?'।

'প্রথমত আমি বরাবর ওখানে থাকবো বলে যাইনি, দ্বিতীয়ত প্রেমের ব্যাপারে সত্যিই খুব বিমর্ষ হয়ে পড়েছিলাম। এটাকে তুমি আমার এক ধরনের মর্ষকামীতাও বলতে পারো।'

'কিন্তু নাতাশা তো তোমার কথা একদম ভুলেই গেছে।'

'সত্যিই?'

'ওর ধারণা তুমি কোনো স্টুডিওতে চাকরি পেয়েছো।'

আমার আর কোনো প্রশ্ন করতে সাহস হলো না। ফিরে আসার পর সবকিছুই কেমন যেন বিষণ্ণ মনে হচ্ছে। ঝুলবারান্দায় মখমলের ঢাকনা দেওয়া গদিগুলোয় আরও বেশি ধুলো জমেছে। রাস্তাগুলো নোংরা, অঝরে হিমেল বৃষ্টি ঝরছে। হঠাৎ অবাক হয়ে আমিও ভাবতে শুরু করলাম—সত্যিই তো, কেন ফিরে এলাম!

মেলিকভকে বললাম, 'আমাকে একটা ওভারকোট কিনতে হবে।'

'তুমি এখানেই থাকবে তো?' মেলিকভ জিগেস করলো।

'হ্যাঁ। তবে আলাদা একটা ঘর পেলে ভালো হতো। তোমার এখানে কোনো ঘর খালি নেই?'

'হ্যাঁ, একটাই মাত্র ঘর খালি আছে—লিসা তিরুয়েলের ঘরটা। সপ্তাখানেক আগে ও ঘুমের বড়ি খেয়ে আত্মহত্যা করেছে। ইচ্ছে করলে তুমি ওই ঘরটা নিতে পারো। আশা করি তোমার নিশ্চয়ই ভূতের ভয় করবে না?'

'না না, ওটা কেনো ব্যাপারই নয়। কিন্তু লিসাকে দেখে তো কোনোদিন মনে হয়নি ও নিজে থেকে আত্মহত্যা করতে পারে।'

'ও খুব শান্তিতেই মরেছে। ওকে তখন ঠিক কোনো তরুণীর মতো দেখাচ্ছিলো।'

'কত বয়েস হয়েছিলো ওর?'

'বিয়াল্লিশ।'

'ওর অত বয়েস হয়েছিলো মনেই হতো না। ঠিক আছে, আমি ওই ঘরটাই নেবো।'

'চলো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। হোটেলের মধ্যে ওটাই কিন্তু সবচাইতে ভালো ঘর। যেমন পরিষ্কার, তেমনি আলো-বাতাস আসে। জীবাণুনাশক ওষুধ দেওয়া রয়েছে বলে হয়তো দু-একটা দিন তোমার একটু অসুবিধে হবে…'

'ও নিয়ে তোমাকে কিচ্ছু ভাবতে হবে না, ভ্লাদিমির।'

ঘরটা তেতলায়। সত্যিই বেশ বড়, খোলামেলা আর নির্জন। বাইরে থেকে যাওয়া-আসা সময় চট করে নজরে পড়বে না। ঘরটা আমার এত পছন্দ হয়ে গেলো যে তখনই জিনিসপত্র খোলাখুলি শুরু করে দিলাম। আসার সময় লস অ্যাঞ্জেলসের প্ল্যাটফর্ম থেকে বড় বড় কয়েকটা সামুদ্রিক ঝিনুক আর শঙ্খ কিনেছিলাম, গভীর সমুদ্রের জাদুকরী ছন্দ হারিয়ে ওগুলোকে এখন কেমন যেন নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছে।

'বৃষ্টির জন্যেই ঘরটা এমন বিষণ্ন মনে হচ্ছে, নইলে পরে দেখো তোমার খুব একটা খারাপ লাগবে না।' মেলিকভ বললো। 'তোমার কি এখন একটু ভদকা লাগবে?'

'না, ধন্যবাদ ভ্লাদিমির। এখন আমি ঘণ্টা দুয়েকের জন্যে একটু ঘুমতে চাই।'

'আমাকেও একটু ঘুমতে হবে। এখন আমার রাত-কাজ চলছে। এই বয়েসে আর তেমন জাগতে পারি না। তার ওপর শীতকালে আমার শ্লেষ্মার কষ্টটা আরও বাড়ে।'

সেদিনই বিকেলে সিলভারসের সঙ্গে দেখা করলাম। বিক্রিত ছবির মোটা-মুটি একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলাম। সিলভারস আমার সঙ্গে আশাতিরিক্ত ভালো ব্যবহার করলেন। আমি বললাম, 'কাঠকয়লায় আঁকা রেনোয়ার শেষ ছবিটাও পাঁচ হাজার ডলারে বিক্রি করে দিয়েছি।'

আমাকে বিস্ময়ে প্রায় স্তম্ভিত করে দিয়ে সিলভারস বলে উঠলেন, 'ভালোই করেছো।'

আমি না বলে পারলাম না, 'সেকি! আমি যখনই কোনো ছবি বিক্রি করি, দাম শুনে তো আপনার চোখ ফেটে জল আসে?'

'হ্যাঁ, কথাটা অবশ্য সত্যি। তখন আমি সবকিছুকে আঁকড়ে রাখার চেষ্টা করতাম। কিন্তু এখন যা মনে হচ্ছে, খুব শিগগিরই যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে। কেননা জার্মানী প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এর অর্থ কি তুমি বুঝতে পারছো?'

'না।' আমি অকপটেই স্বীকার করলাম, কেননা যুদ্ধ শেষ হওয়া কিংবা জার্মানী নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া আমার কাছে যত অর্থবহই হোক না কেন, ওঁর তাতে কিছুই এসে যায় না।

'যুদ্ধ শেষ হলে কিছুদিনের মধ্যেই সবাই ইউরোপে যেতে পারবে। ইউরোপের আর্থিক অবস্থা এখন সঙ্গীন। সামান্য কয়েকশো ডলারের বিনিময়ে তখন যে কেউ ভালো ভালো ছবি কিনতে পারবে। আমেরিকান ছবি-ব্যবসায়ীদের অবস্থা কি দাঁড়াবে একবার কল্পনা করতে পারছো?' নিভে যাওয়া চুরুটটা নতুন করে ধরিয়ে নিয়ে সিলভারস গলগল করে ধোঁয়া ছাড়লেন। 'প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ঠিক এই রকমটা ঘটেছিলো। আমি তখন এ ব্যবসায় নতুন। প্রথমবারের ভুলটা আমি আর এবার করতে রাজি নই। সুতরাং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের সমস্ত ছবি বিক্রি করে দিতে হবে। দরকার হলে লাভ কম রেখেও বিক্রি করতে হবে। খদ্দেরদের বলতে হবে যে আমরা একটা বিরাট সংগ্রহ কিনছি, যার জন্যে আমাদের অর্থের বিশেষ প্রয়োজন।'

ঠাণ্ডা মাথায় দিনরাত লাভ-লোকসান খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা মানুষটার এ হেন খোলাখুলি স্বীকারুক্তি তবু আমার ভালো লাগলো। অবশ্য পর-ক্ষণেই উনি যোগ করলেন, 'আমি কিন্তু আগে থেকেই জানিয়ে রাখছি, এর জন্যে তোমার লাভের অংশও কিছু কমে যাবে।'

খুব স্বাভাবিক। বরং উনি এমনটা না বললেই আমি বোধহয় বেশি অবাক হতাম। তাই ইচ্ছে করেই উৎসাহ দেখিয়ে বললাম, 'নিশ্চয়ই।'

নাতাশাকে ফোনে ডাকতে দ্বিধা বোধ করলাম। কিছুতেই ঠিক করতে পারলাম না অপর প্রান্ত থেকে ওর সাড়া পেলে কি বলবো। কয়েক সপ্তার ব্যবধানে আমাদের সম্পর্ক কেমন যেন অবাস্তব হয়ে গেছে। আমরা যখন একসঙ্গে ছিলাম না, আমাদের কিছুই বলার ছিলো না। এমন কি আমি যে ফিরে আসছি, সে খবরটাও ওকে জানানোর প্রয়োজন বোধ করিনি। অথচ শোভনতার খাতিরে জানানো উচিত ছিলো। আসলে

ক্যালিফোর্নিয়ার দিনগুলোতে আমার কাছে নাতাশার অস্তিত্ব ছিলো অস্পষ্ট একটা স্বপ্নের মতো, যেন আমাদের দুজনের মধ্যে কোনোকালেই কোনো সম্পর্ক ছিলো না, আর যদিও বা থেকে থাকে সেটা ছিলো নিতান্তই আকস্মিক।

হঠাৎ মনে পড়ায় বেটি স্টেইনের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম এবং ওকে দেখে আমি প্রায় আঁতকে উঠলাম। শুকিয়ে অর্ধেক হয়ে গেছে, কোটরে ঢুকে যাওয়া উজ্জ্বল চোখদুটো ছাড়া প্রাণের আর কোথাও কোনো চিহ্ন নেই।

'তোমাকে কিন্তু বেশ ভালোই দেখাচ্ছে, বেটি।' আমি বললাম।

'খুব রোগা মনে হচ্ছে না?'

'তোমার বয়েস আর আজকালকার ফ্যাশনের তুলনায় তেমন কিন্তু রোগা মনে হচ্ছে না।'

'রোদে পুড়ে একটু তামাটে হলেও তোমার স্বাস্থ্য কিন্তু অনেক ভালো হয়েছে, রবার্ট।'

দ্রুত ঘরের চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম, মনে হলো যেন মৃত্যুর গন্ধ পাচ্ছি।

বেটি অনুযোগ করলো, 'এখন এত তাড়াতাড়ি সন্ধ্যে যায়, রাতটা যেন আর কিছুতেই ফুরতে চায় না।'

'আলোটা জ্বালিয়ে রেখো, তাহলে আর সময়ের কথাটা বিশেষ ভাবে মনে পড়বে না।'

'আলো আমি সব সময়েই জ্বালিয়ে রাখি। অন্ধকারে আমার ভয় করে। কিন্তু বার্লিনে আমার কখনও ভয় করতো না।'

'সে অনেকদিন আগেকার কথা, বেটি। এখন আমরা সবাই বদলে গেছি। শুনলে হয়তো তুমি অবাক হবে, আজও আমি অন্ধকারে জেগে উঠতে ভয় পাই।'

বেটি চোখ পাকিয়ে ধমকালো, 'একা বলে তাই, নইলে তোমার আবার ভয় কিসের? যার স্বাস্থ্য আছে তার কোনো কিছুরই ভয় থাকা

উচিত নয়। এই অসুস্থতার মধ্যে আমি একটা জিনিস আবিষ্কার করেছি, জেনেছি সুখ কাকে বলে।'

'এ তুমি কি বলছো, বেটি!'

'ঠিকই বলছি, রবার্ট। যার স্বাস্থ্য ভাঙেনি, যে কখনও জানেনি অসুস্থতা কি—সেই সুখী। যদি তুমি কখনও ভগ্নস্বাস্থ্য হয়ে একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ো, তখন দেখবে সুখ-অসুখ, প্রেম-ভালোবাসা, নির্জনতা সবই তোমার কাছে অর্থহীন হয়ে গেছে। অতীত দিনের যে স্মৃতিগুলো তোমার কাছে ছিলো রঙিন ফানুসের মতো, সেগুলো তখন মনে হবে একেবারে চুপসে গেছে।'

'আমি বিশ্বাস করি না, বেটি। অন্তত তোমার ক্ষেত্রে এর কোনোটাই সত্যি নয়। এখনও তুমি নিঃসঙ্গ নও, এখনও তোমার ভালোবাসা নিঃশেষ হয়ে যায়নি, এখনও পর্যন্ত কোনো স্মৃতিই তোমার ম্লান হয়ে যায়নি। আজ পর্যন্ত তুমি যত মানুষকে সাহায্য করেছো, কেউই তোমাকে ভোলে-নি, বেটি।'

একটু চুপ করে থেকে বেটি কি যেন ভাবলো, তারপর আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিসিয়ে বললো, 'এখন আমি আর কিচ্ছু ভাবি না, রবার্ট। তুমি বিশ্বাস করো, এখন আমি আর কোনো কিছুতে ভয়ও পাই না।'

কোলার যমজ দুই বোনের একজন ভেতরের ঘর থেকে কয়েকটা ছবি এনে বেটির হাতে দিলো। 'এইগুলো কি?'

'কই, দেখি!' বেটি যেন সহসা জীবন্ত হয়ে উঠলো। 'নাৎসিদের আগেকার অলিভার প্লাৎজ্ তো?'

'আমার তো তাই মনে হচ্ছে।'

'দেখি লিসি, আমার আতস কাঁচটা দাও।'

বালিসের নিচে থেকে লিসি আতস কাঁচটা বের করে বেটির হাতে দিলো।

'হ্যাঁ, অলিভার প্লাৎজেরই ছবি। কিন্তু আমাদের বাড়িটা এতে নেই।

ছবিটা অন্য পাশ থেকে তোলা হয়েছে। এইটা ডাক্তার শেচলসিঙ্গারদের বাড়ি। নামটা এখনও পড়া যাচ্ছে। নাৎসিদের আগেকার তোলা ছবি না হলে নাম ফলকটাও থাকতো না।'

আমি উঠে পড়লাম। 'এবার কিন্তু আমাকে যেতে হবে, বেটি।'

'আর একটু থাকতে পারো না?'

'একটু আগেই আমি নিউ ইয়র্কে পৌছেছি। এখনও জিনিসপত্র কিছু খোলা হয়নি।'

'আচ্ছা, পরে আবার এসো। লিসি, রবার্টকে একটু পৌঁছে দাও।'

কোলার যমজ দুই বোনের একজনের নাম যে লিসি, এই প্রথম শুনলাম। বলা যায় না, টেনেনবাম হয়তো একেই ভালোবাসে। পাছে ভুলে যাই, তাই বললাম, 'টেনেনবাম আপনাদের দু বোনকেই তার প্রীতি জানিয়েছে।'

'ও কবে ফিরবে কিছু বলেছে?'

'আশা করছে দু এক মাসের মধ্যেই ফিরে আসবে।'

'উঃ, এখানে আর কিছুদিন থাকলে সত্যিই পাগল হয়ে যাবো!' দরজার পর্যন্ত পৌঁছে দেবার পর লিসি চাপা স্বরে বললো। 'প্রতিদিনই ভাবছি মরবে, অথচ প্রতিদিনই দেখছি এখনও টিঁকে রয়েছে। ডাক্তার রাভিক ওকে হাসপাতালে ভর্তি করে দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বেটি কিছুতেই যেতে চায়নি। ও মরবে, তবু কিছুতেই হাসপাতালে ভর্তি হবে না।'

বেটির বাড়ি থেকে বেরিয়ে ভাবলাম কানের সঙ্গে দেখা করবো। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হলো বাড়ি বয়ে দুঃসংবাদটা দিতে যাওয়ার কোনো অর্থ হয় না। পক্ষান্তরে বরং নাতাশার কথাই আমার বেশি করে মনে পড়লো। অথচ আশ্চর্য, ক্যালিফোর্নিয়ায় ওর কথা আমার কখনও এমন করে মনে পড়েনি। অবশ্য একথাও ঠিক, যদিও আমরা পরস্পরকে চিঠি লিখিনি বা ঘনঘন ফোনও করিনি, তবু আমাদের কারুরই তেমন ভাবপ্রবণ বা অসুখী

হবার কোনো কারণ ছিলো না এবং এখনও পরস্পরের প্রতি বাধ্যবাধকতা বা ভর্ৎসনা করার যুক্তিসঙ্গত কোনো কারণ আছে বলেও মনে হয় না। সুতরাং ওকে একবার ফোন করে দেখতে অসুবিধেটা কোথায়? তাতে আর কিছু না হোক, আমাদের পায়ের নিচের মাটি কতটা শক্ত অন্তত সেটুকু বোঝা যাবে। তাছাড়া আদৌ ফোন না করাটা আমার দিক থেকেই উদাসীনতাকে আরও বেশি করে প্রশ্রয় দেওয়া হবে।

মনস্থির করার পরমুহূর্তেই আমি এমনভাবে দূরভাষ-কুঠরিটার দিকে ছুটে গেলাম যেন অদৃশ্য আততায়ীর হাতে আমার জীবন বিপন্ন হয়ে উঠেছে। অপর প্রান্তে বেজে চলা সংকেতধ্বনিতে বুঝতে পারলাম ঘরে কেউ নেই। আমি জানি নাতাশার বেশির ভাগ সময়েই সন্ধ্যের দিকে ছবি তোলার কাজ থাকে, তাছাড়া অন্য কোনো প্রয়োজনেও বেরুতে পারে। তবু প্রতি দশ মিনিট ছাড়া ছাড়াই আমি ফোন করে যেতে লাগলাম আর অলস সেই মুহূর্তগুলোতে মনে পড়ে যেতে লাগলো—কানের কথা, কারমেনের কথা, কিভাবে মুরগির ছানাত্নটো নখের দাগে ওর সাদা প্যাণ্টটা নষ্ট করে দিয়েছিলো, তার কথা। মনে পড়লো স্কট, হণ্ট আর বেটির কথা। সত্যিকারের অসুস্থ হয়ে পড়লে আশ্চর্য সুন্দর একটা মানুষও যে কত অসহায় হয়ে উঠতে পারে, বেটিকে না দেখলে আমি কোনোদিন তা বিশ্বাসই করতে পারতাম না। কেন জানি, ক্ষণিকের জন্যে দেখা আমার সেই মেক্সিকান মেয়েটারও কথা মনে পড়ে গেলো। দীর্ঘক্ষণ ধরে চেষ্টা করার পর মনে মনে স্থির করলাম—শেষ আর তুবারের মতো চেষ্টা করবো, না পেলে ছেড়ে দেবো। কিন্তু তুবারটা দাঁড়ালো তিনবারে, তিনবারটা চারবারে।

তারপর হঠাৎই এক সময় পেয়ে গেলাম। গ্রাহযন্ত্রটা তখনও আমার কানে ঠেকায়নি, অপর প্রান্ত থেকে শুনতে পেলাম, 'রবার্ট, তুমি! কোথা থেকে ফোন করছো?'

'নিউ ইয়র্ক।'

'কোথা থেকে বললে?'

'নিউ ইয়র্ক। আজই আমি এখানে এসে পৌঁছেছি।'

সামান্য একটু নীরবতার পর ও জিগেস করলো, 'আর কিছু বলবে?'

'হ্যাঁ, নাতাশা। কখন, কোথায় তোমার সঙ্গে দেখা হবে? আমি প্রায় কুড়িবার তোমাকে ফোন করেছি···জীবনে কখনও এমন হতাশ হইনি।'

নাতাশা অস্ফুটে হাসলো, 'আমি এই সবে এসে পৌঁছলাম।'

'এসো, আমার সঙ্গে খেতে যাবে। তোমার যেখানে খুশি। লক্ষ্মীটি, যেন আবার না বোলো না।'

দুরুদুরু বুকে ওর জবাবের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। কেননা, স্বাভাবিকভাবেই কেন আমি ওকে এতদিন চিঠি লিখিনি বা আসার খবর আগে থেকে জানাইনি ইত্যাদি প্রশ্নগুলো এসে পড়তে পারে, কিন্তু ওর সঙ্গে দেখা হওয়ার আগেই ভর্ৎসনাসূচক কোনো ব্যাপার ঘটুক সেটা আমার সত্যিই কাম্য ছিলো না।

'ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি।'

'শুধু এই কথা শোনার জন্যেই আমি ছটফট করছিলাম নাতাশা, তুমি বিশ্বাস করো।'

নাতাশা কোনো জবাব দিলো না, অন্য প্রান্ত থেকে শুধু শুনতে পেলাম গ্রাহযন্ত্রটা নামিয়ে রাখার শব্দ। সেই মুহূর্তে মনে মনে যতটা স্বস্তি পেলাম, হতাশ হলাম তার চাইতে কম নয়। কেননা ওর হিমেল নৈঃশব্দের মধ্যে দূরাভিসন্ধিমূলক এমন একটা রহস্যময়তা জড়িয়েছিলো, যার তুলনায় মনে হলো ও ঝগড়া করলেই বুঝি ভালো ছিলো।

পোশাক পালটাবার জন্যে হোটেল রুবেনে লিসা তিরুয়েলের ঘরটায় ফিরে এলাম। সকালের চাইতে সন্ধ্যেবেলায় গন্ধক আর লাইজলের গন্ধ আরও তীব্র হয়ে উঠেছে। আশা এবং আশঙ্কার মাঝামাঝি একটা মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্যেই আমি পোশাক পালটাতে শুরু করলাম, ওভার-কোটটা গায়ে চড়াতে চড়াতে ভাবলাম নাতাশার মুখোমুখি হওয়ার আগে

পর্যন্ত যেভাবেই হোক নিজেকে স্থির রাখতে হবে।

সিঁড়ি ভেঙে সবে রাস্তায় পা বাড়াতে যাবো, প্রবেশ পথের বাতির নিচে ওকে দেখতে পেলাম। 'আরে, নাতাশা ; তুমি!'

দুহাতে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে ওকে চুমু দিলাম। নিজেকে ছাড়িয়ে নিলো না বটে, কিন্তু আলিঙ্গনের মধ্যেই বুঝতে পারলাম নাতাশা নিজেকে শক্ত করে ধরে রেখেছে এবং আলিঙ্গনে শিথিল করে দেওয়ার মুহূর্তেই ও নিজেকে ছাড়িয়ে নিলো।

জিগেস করলাম, 'কেমন আছো, বলো ?'

'ভালো।'

'তোমার ঠাণ্ডা লাগছে না তো ?'

'না না, লোমের কোট রয়েছে, ঠাণ্ডা লাগবে কেন ?'

'তারপর, কোথায় যাবে বলো ?'

'তোমার যেখানে খুশি।'

আগে থেকেই মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলাম নামকরা কোনো রেস্তোরাঁয় যাবো, তাই বললাম, 'বিস্ত্রোয় গেলে কেমন হয় ?'

'বিস্ত্রো বন্ধ হয়ে গেছে। ওর যে মালিক রেস্তোরাঁ বিক্রি করে দিয়ে ফ্রান্সে ফিরে গেছে।'

'সেকি ! ওরা ওকে যেতে দিলো ?'

'শুধু ও কেন, ফ্রান্সের অনেক উদ্বাস্তুই ইতিমধ্যে ফিরে যেতে শুরু করেছে। তবে ইচ্ছে করলে আমরা কক্ দ'অর-এ যেতে পারি। ওটাও বিস্ত্রোর মতোই ভালো।'

'ওটাও তো ফরাসী রেস্তোরাঁ, তাই না ?'

'হ্যাঁ।'

'আশা করি ওর মালিক নিশ্চয় এখনও দেশে ফিরে যায়নি।'

'না, উনি এখানেই থাকবেন বলে ঠিক করেছেন।'

'বেশ, তাহলে ওখানেই চলো।'

মনে মনে ভাবলাম নিউ ইয়র্কে হেন রেস্তোরাঁ নেই যার খবর নাতাশা

রাখে না।

রেস্তোরাঁর যিনি মালিক—বয়েস চল্লিশের কাছাকাছি, লালচে মুখ, ঘন কুচকুচে কালো গোঁফ, ভারি সুন্দর দেখতে—নিজেই আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। ইচ্ছে হলো একবার জিগেস করি—কি মশাই, আপনারও ফিরে যাওয়ার কোনো পরিকল্পনা আছে নাকি। কিন্তু আমি জানি অপরিচিত কাউকে হঠাৎ এ ধরনের প্রশ্ন করাটা শোভন নয়। তা-ছাড়া দেখলাম নাতাশা ওঁর খুবই পরিচিত।

ভদ্রলোক নিজেই আমাদের খাবার নির্বাচন করে দিলেন। 'আশা করি রোস্ দ্য আঞ্জুতে কোনো অসুবিধে হবে না?'

'দারুণ হবে।' নাতাশাই প্রথম সউল্লাসে বলে উঠলো।

ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে আমি মনে মনে হিংসে না করে পারলাম না। উনিও উদ্বাস্তু, তবে আমার মতো নন। উনি ইচ্ছে করলে দেশে ফিরে যেতে পারেন। ওঁর দেশ অধিকৃত হয়েছিলো, আবার স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু আমার দেশ এখনও স্বাধীন হয়নি।

'ক্যালিফোর্নিয়ার রোদে পুড়ে তোমার রঙটা তামাটে হয়ে গেছে। কি করছিলে ওখানে?'

নাতাশা শুধু এইটুকুই জানতো ছবি বিক্রির ব্যাপারে আমি সিল-ভারসের সঙ্গে কয়েক দিনের জন্যে লস অ্যাঞ্জেলসে যাচ্ছি, হল্টের চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে ওকে আমি কিছুই জানাইনি। তাই সংক্ষেপেই মোটামুটি সমস্ত ব্যাপারটা ওকে আমি বুঝিয়ে বললাম, যাতে বিরক্তিকর প্রশ্নগুলো কিছুটা এড়ানো যায়।

'তোমাকে কি আবার ফিরে যেতে হবে?'

'না না।'

'নিউ ইয়র্কে শীতকালটা আমার জঘন্য লাগে।'

'সুইজারল্যাণ্ড ছাড়া সব জায়গাতেই শীতকালটা জঘন্য, নাতাশা।'

'সুইজারল্যাণ্ডে তুমি কোথায় ছিলে, পাহাড়ে?'

'উঁহু, জেলখানায়।'

'কেন ?'

'আমার কাছে কোনো ছাড়পত্র ছিলো না বলে। কিন্তু পৃথিবীতে অমন সুন্দর জেলখানা আমি আর কোথাও দেখিনি। যেমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, তেমনি সুন্দর তার ঘরগুলোকে গরম রাখার ব্যবস্থা। শীতকালে আমাদের ঠাণ্ডায় হি হি করে কাঁপতে হতো না, বরং জানলা দিয়ে দূরের পাহাড়ী চূড়ায় দেখতে পেতাম বরফঝরা। সত্যি, ওখানকার প্রতিটা মুহূর্ত আমাদের বিপুল আনন্দে কেটে যেতো।'

নাতাশা হাসলো। 'এখন কি তোমার তার জন্যে দুঃখ হচ্ছে ?'

'তখন হয়েছিলো. কিন্তু এখন নয় নাতাশা। বিশেষ করে এই মুহূর্তে আমি যখন তোমার পাশে বসে রয়েছি।'

'আশা করি ক্যালিফোর্নিয়াতে তুমি অনেক মেয়ে পেয়েছিলে ?'

'একটাও না।'

'সেকি, একটাও না !' নাতাশা খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো। 'আহা, বেচারি রবার্ট !'

নাতাশার ব্যঙ্গোক্তিতে খুশি হতে পারলাম না। কেননা কেউ আমাকে বেচারি রবার্ট বলবে, সেটা আমার আদৌ পছন্দ নয়। তাছাড়া আমাদের আলোচনা তখন নিঃসন্দেহে খারাপের দিকে মোড় নিচ্ছিলো। আমার উচিত ছিলো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওকে বিছানায় নিয়ে যাওয়া। সবচেয়ে ভালো হতো হোটেলে সিঁড়ি নিচে দেখা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি যদি ওকে লিসা তিরুয়েলের ঘরে নিয়ে যেতাম। কেননা পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষের বিষে মেশা বিদ্রূপ বেঁধানো উক্তিগুলো নিঃসন্দেহে বিপজ্জনক আমি জানি নাতাশা মনে মনে আশা করছে আমিও যেন ওকে এই ধরনের প্রশ্ন করি।

'তুমি বিশ্বাস করবে কিনা জানি না,' কৈফিয়ত দেওয়ার ভঙ্গিতে আমি বললাম। 'হলিউডের পরিবেশ আমার সত্যিই ভালো লাগেনি।'

'সেই জন্যে বুঝি একটা চিঠি লেখারও সময় হয়ে ওঠেনি ?'

'যে ধরনের কাজের মধ্যে আমাদের থাকতে হতো, সত্যিই চিঠি লেখা

সম্ভব ছিলো না, নাতাশা। প্রতিদিন, এমন কি প্রতি ঘণ্টাতেই আমাদের ঠিকানা বদলে যেতো। তাছাড়া আমি ভেবেছিলাম চিঠি লিখলেও তুমি বোধহয় তার জবাব দেবে না।'

'তুমি কেমন করে জানলে যে আমি জবাব দিতাম না?'

'তখন আমার তাই-ই মনে হয়েছিলো, নাতাশা।' কিছুতেই আর বলতে পারলাম না যে আগে তুটো চিঠি দিয়েছিলাম, তুমি তার কোনো জবাব দাওনি। তাই একটু চুপ করে থাকার পর বললাম, 'যাগগে, আবার আমাদের তুজনের দেখা হয়ে গেছে এবং এখন আমার সেই আগের মতোই মনে হচ্ছে।'

'অর্থাৎ এটা তুমি ইচ্ছে করেই চেয়েছিলে, তাই না?'

ফাঁদটা আমি চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পেলাম। তাই শুধরে নেবার জন্যে বললাম, 'না, সত্যিই আমি তা চাইনি নাতাশা।'

'কিন্তু তুমি একটু আগেই বলেছো—তখন তোমার তাই মনে হয়েছিলো।'

'এখন আমার অন্য রকম মনে হচ্ছে, নাতাশা। তখন ঠিক বুঝতে পারিনি।'

আমার সমস্ত ভাবনাগুলোই কেমন যেন বিশৃঙ্খল হয়ে গেছে, সেগুলোকে কিছুতেই গুছিয়ে এক জায়গায় জড়ো করতে পারছি না। নাতাশার সঙ্গে দেখা হওয়ার আগেই আমার উচিত ছিলো অন্য কোনো মেয়েকে বিছানায় নিয়ে যাওয়া, তাহলে হয়তো মাথাটা পরিষ্কার হয়ে যেতো। নাতাশার প্রতি আমার আকর্ষণ যে এত তীব্র, সেকথা আগে আর কখনও মনে হয়নি কিংবা ভুলেই গিয়েছিলাম। আমাদের তুজনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কটা গড়ে ওঠার প্রথম দিকে এ অনুভূতি এত তীব্র ছিলো না, এমন কি হলিউডে আমার নিঃসঙ্গতার দিনগুলোতেও আমি অনুভব করতে পারিনি। এখন আমি যেন তা হঠাৎই উপলব্ধি করলাম এবং কোনো কিছু উদ্ঘাটিত হয়ে যাবার ভয়ে নাতাশার মুখের দিকে তাকাতে পারলাম না। সেই 'কোনো কিছু'টা যে কি তা আমি জানি না,

তবে মনে হলো নাতাশা যদি তা একবার আবিষ্কার করতে পারে তাহলে আমি চিরকালের মতো ওর কাছে হেরে যাবো। অথচ আমি ভালো করে জানি নাতাশা কোনোদিনই তার সবকটা তাস নিয়ে খেলেনি এবং আজও ও অপেক্ষা করছে কখন আমি অনুযোগ করবো যে অন্য কারুর সঙ্গে ওর একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, অন্তত আর কিছু না হোক অন্য কারুর সঙ্গে ও শুয়েছে। কিন্তু আমি এ প্রসঙ্গের ছায়াও মাড়াতে চাই না। কেননা আর যাই হোক, অন্তত এ সম্পর্কে ওকে অনুযোগ করার আমার কিছু নেই, দ্বিতীয় আমি প্রায় সুনিশ্চিত, এ প্রসঙ্গে নাতাশা যাই বলুক না কেন, সম্ভবত সত্যি কথাটা ও কোনোদিনই বলবে না।

'আমি তোমাকে ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারছি না, নাতাশা। সমস্ত ব্যাপারটাই এমন গুরুত্বপূর্ণ আর অপ্রত্যাশিত যে আমার পক্ষে সবকিছু ব্যাখ্যা করে বোঝানো সত্যিই খুব কঠিন। আমরা যে আবার একসঙ্গে মিলিত হতে পেরেছি এর জন্যে আমি খুশি। মাঝের সময়টুকু ধোঁয়ার রেখার মতো আকাশে মিলিয়ে গেছে।'

'তুমি তাই ভাবো বুঝি?'

'হ্যাঁ, নাতাশা।'

নাতাশা চাপা ঠোঁটে অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাসলো। 'তোমার পক্ষে ভাবাটা অবশ্য অনেক সহজ। আমাকে এবার ফিরতে হবে, রবার্ট। ভীষণ ক্লান্ত লাগছে। আমাদের আবার বসন্তের পোশাক সংগ্রহের কাজ শুরু হয়ে গেছে।'

'আমি জানি তুমি বরাবরই একটা করে ঋতু এগিয়ে থাকো।'

বসন্তে যুদ্ধোত্তর ইউরোপের চেহারাটা কি দাঁড়াবে আমি সত্যি ভাবতে পারছিলাম না, কেননা তখন আমার মনে হচ্ছিলো যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে। এই সুদীর্ঘ কয়েকটা বছর আমি যার জন্যে ব্যাকুল উৎকণ্ঠায় প্রতীক্ষা করেছিলাম, আর কয়েক দিনের মধ্যে তারই একটা চরম কেন্দ্রে পৌঁছতে পারবো জেনেও নিজেকে আমার গিলোটিনে প্রাণদণ্ডাদেশ থেকে কয়েক মুহূর্তের জন্যে বিরতি পাওয়া মানুষের মতো মনে হচ্ছে

নাতাশার দিকে তাকিয়ে দেখলাম ও ধীরে সুস্থে হাতে দস্তানা পরছে। ওকে দেখে মনে হলো যেন অনেক দূরের অচেনা কেউ। আমি জানি এখন ওকে যদি কিছু বলতে যাই, আমাদের ভুল বোঝা-বুঝির পালা বেড়ে উঠবে। তাছাড়া সেই মুহূর্তে আমি কিছু ভাবতেও পারছিলাম না। কোনো কথা না বলে আমি নিঃশব্দে ওর পাশাপাশি হেঁটে চললাম। বাইরে অসম্ভব ঠাণ্ডা, মাঝে মাঝে তুষার-ঝরা দমকা বাতাস বইছে। রাস্তার মোড়েই একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেলাম। সংক্ষেপে গন্তব্য স্থানটা চালককে জানিয়ে দিলাম। ট্যাক্সি-চালকের ধারণা ভোরের দিকে রীতিমতো তুষার পড়বে।

'ব্যাস, এইখানে।' নিটোল নীরবতা ভেঙে নাতাশাই প্রথম বলে উঠলো। 'শুভরাত্রি, রবার্ট।'

'শুভরাত্রি, নাতাশা।'

নিরাশার মধ্যেও মনে মনে শুধু এইটুকু সান্ত্বনা পেলাম—আমি যখন ফিরবো, মেলিকভ তখনও জেগে থাকবে। ভদকার জন্যে নয়, যার সঙ্গে আমি একটু গল্প করতে পারবো, অথচ যে নিজে থেকে আমাকে কোনো প্রশ্ন করবে না।

## কুড়ি

সকালে মনে হলো গরমের কিছু পোশাক কেনা প্রয়োজন। প্রথমেই মোরগ-ডাকা ঘড়ি-ওয়ালা সেই ঘরটায় গিয়ে উকিলের বাকি টাকাটা মিটিয়ে দিয়ে এলাম, তারপর গেলাম পুরনো একটা ইহুদি পোশাক বিক্রেতার দোকানে। কেনাকাটা সেরে বেরিয়ে আসার সময় হঠাৎ নজরে পড়লো পেছনের তাকে প্রায় পরিত্যক্ত অবস্থায় সাজানো রয়েছে কয়েকটা প্রাচীন মূর্তি। নানা রঙের পাথর বসানো দুর্লভ কারুকার্য করা মূর্তিগুলোর দিকে আমি স্তব্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম। ব্রুসেলস্ যাদুঘরের অভিজ্ঞতা আমাকে এক ঝলকেই বলে দিলো—এগুলো শুধু যে আসল তাই নয়,

প্রাচীনও বটে। মুগ্ধ চোখে আমাকে স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে দোকানের বৃদ্ধ মালিক সম্ভবত কিছু আঁচ করতে পেরেছিলেন। নিঃশব্দে উনি কখন আমার পাশটিতে এসে দাঁড়িয়েছেন আমি টেরও পাইনি, চমক ভাঙলো ওঁর হঠাৎ-কণ্ঠস্বরে :

'এগুলো আমাদের অনেক দিনের পুরনো সংগ্রহ। আসলে পোশাকের আগে এটা এইসব পুরনো জিনিস বিক্রিরই দোকান ছিলো।'

'এই মূর্তিগুলো কি এখনও বিক্রির জন্যে?' দ্বিধাভরেই আমি প্রশ্ন করলাম।

'যদি নিজের জন্যে নেন, আমি অনেক সস্তায় করে দেবো।'

'নিজের জন্যেই নেবো।'

'কোনটা নামাবো বলুন?'

'টাকা থাকলে আমি সবকটাই নামাতে বলতাম। আপাতত আমাকে ...' একটা বেড়াল এবং মিশরীয় একটা দেবীর মূর্তি দেখিয়ে বললাম, 'ওইদুটো দিন।'

'যারা চেনে তাদের কাছে এর দাম অনেক। আমি আপনাকে পঞ্চাশ বছর আগেকার কেনা দামেই দেবো।' বেড়ালটা দেখিয়ে উনি বললেন, 'এটার জন্যে আমি পাঁচশো ডলার নেবো।'

মনে মনে আমি চমকে উঠলাম। কেননা জিনিসগুলো যে আমি শুধু চিনি তাই নয়, জানি। পাঁচশোর বদলে উনি যদি পাঁচ হাজার বলতেন, তাতেও আমি বিস্মিত হতাম না।

'আর ওই মূর্তিটার জন্যে?'

'একশো পঁচিশ ডলার।'

'বেড়ালটার জন্যে আমি সাড়ে তিনশো দেবো।'

'বিশ্বাস করুণ, এতে আমার একটা কানা-কড়িও লাভ থাকবে না। শুধু আপনার ভালো লেগেছে বলেই...ঠিক আছে, আপনি বরং সাড়ে চারশোই দিন।'

'আমি কিন্তু আপনার কথা একটুও অবিশ্বাস করছি না। সামর্থ থাকলে

আমি আপনাকে তাই-ই দিতাম। কিন্তু চারশোর বেশি আমি সত্যিই দিতে পারবো না।'

শেষ পর্যন্ত উনি বেড়ালটা চারশো পঁচিশ আর দেবীমূর্তিটা ষাট থেকে দর করতে করতে নব্বুই ডলারে দিতে রাজি হলেন।

দেবীমূর্তিটা দেখিয়ে বললাম, 'এটা আমার এক বান্ধবীকে উপহার দিতে চাই, অনুগ্রহ করে যদি একটু পৌঁছে দিতে পারেন খুব ভালো হয়।'

বৃদ্ধ প্রতিশ্রুতি দিলেন দুপুরে খেতে যাওয়ার আগে উনি নিজে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসবেন। আমি ওঁকে নাতাশার ঠিকানাটা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। মনে মনে হিসেব করে দেখলাম আমি যদি জলের দামেও বেড়ালটাকে বিক্রি করে দিই পাঁচশো থেকে হাজার ডলার লাভ থাকবে।

সেই দিনই বিকেলে নাতাশা আমাকে ফোন করলো। 'দুপুরে তুমি যে দেবীর মূর্তিটা পাঠিয়েছিলে, কি নাম ওর?'

'নিথ।'

'কোথাকার?'

'মিশরের। মূর্তিটা প্রায় দু হাজার বছর আগেকার পুরনো।'

নাতাশা হাসলো। 'মেয়েদের তুলনায় বড্ড বেশি পুরনো। তোমার কি মনে হয় এই দেবীমূর্তিটা আমার ভাগ্যকে ফেরাতে পারবে?'

এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমি আদৌ ভেবে দেখিনি। অন্যদিকে আবার নাতাশাকে হতাশ করতেও মন চাইলো না। তাই বললাম, 'বিশ্বাস রাখলে নিশ্চয়ই ফেরাতে পারবে, নাতাশা। তাছাড়া মূর্তিটাকে দেখতে ঠিক তোমার মতন।'

'আমার মতন কি না জানি না, তবে দেখতে সত্যিই সুন্দর। আমি ভেবেছি যেখানেই যাবো হাত ব্যাগে মূর্তিটাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবো। অমন সুন্দর একটা উপহারের জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ, রবার্ট। কাল সন্ধ্যে-বেলায় তুমি কি থাকছো? তাহলে দুজনে একসঙ্গে নৈশভোজে যেতাম।'

চকিতে একরাশ ভাবনা মাথার মধ্যে ভিড় করে এলো। আগামীকাল

সন্ধ্যে পর্যন্ত আমাকে এভাবে ঠেলে দেওয়ার জন্যে মনে মনে সত্যিই খুব রাগ হলো, ইচ্ছে হলো একবার বলি ওদিন সন্ধ্যেবেলায় আমি ব্যস্ত থাকবো। কিন্তু পরক্ষণেই মত পালটে বললাম, 'গেলে সত্যিই খুব খুশি হবো। সন্ধ্যে সাতটা থেকেই আমি হোটেলে থাকবো। তুমি যখন খুশি আসতে পারো।'

'আজ সন্ধ্যেবেলায় সময় করতে পারছি না বলে আমি দুঃখিত রবার্ট। আমি জানতাম না যে তুমি আসবে, তাই আগে থেকে একটা মিলনের ব্যবস্থা করে ফেলেছি। আসলে কি জানো, সন্ধ্যেগুলোতে আমি কিছুতেই একা থাকতে পারি না।'

'এটা খুবই স্বাভাবিক, নাতাশা। তাছাড়া আজ আমিও সময় দিতে পারতাম না। আমার একটা নেমতন্ন আছে।'

'ভালোই হলো, রবার্ট। কাল দেখা হবে। আটটা নাগাদ আমি তোমার হোটেলে যাবো।'

'ধন্যবাদ, নাতাশা।'

গ্রাহযন্ত্রটা আমি নামিয়ে রাখলাম। নাতাশার সঙ্গে আজ দেখা হবে না, অতল গহ্বরের মতো সুদীর্ঘ রাতটা একা একা কাটাতে হবে ভাবতেই মনটা বিষণ্ণতায় ভরে উঠলো। অথচ নাতাশাকে আমি যখন দিনের পর দিন, মাসের পর মাস দূরে সরিয়ে রেখেছিলাম, তখন ওর কথা আমার একবারও মনে পড়েনি। এখন একটা রাত্রির ব্যবধানই মনে হচ্ছে যেন অন্তহীন। তবু অচিরে নাতাশার সঙ্গে যে আবার আমার দেখা হবে, এই অপ্রত্যাশিত সম্ভাবনার জন্যে আমি অদৃশ্য মিশরীয় দেবীমূর্তিটার প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ না করে পারলাম না।

সেদিস ফ্রিয়েসল্যাণ্ডারের বাড়িতে আমার সত্যিই রাতের নিমন্ত্রণ ছিলো এবং সেই প্রথম ঋণমুক্ত মানুষের মতো মাথা উঁচু করে আমি কারুর বাড়িতে প্রবেশ করতে পেরেছিলাম। পরণে ছিলো জমকালো নতুন স্যুট আর দামী ওভারকোট। শুধু তাই নয়, নিতান্ত প্রয়োজনের দিনে বিনা

শর্তে ধার দেওয়ার জন্যে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ শ্রীমতী ফ্রিয়েসল্যাণ্ডারের জন্যে গাঢ় লাল রঙের চমৎকার একগুচ্ছ গ্যাডিওলিও নিয়ে যেতে পেরেছিলাম। রাস্তার মোড়ে ইতালিয়ান ফুলওয়ালি সদ্য ফোটা কুঁড়িগুলো আমাকে বলতে গেলে এক রকম সস্তা দরেই বিক্রি করেছিলো।

উপহার পেয়ে শ্রীমতী ফ্রিয়েসল্যাণ্ডার খুশিই হলেন। 'তারপর, হলিউডের দিনগুলো কেমন কাটলো বলো?'

'বেশ ভালোই।'

অতিথিদের মধ্যে লিসিকে দেখতে পেয়ে জিগেস করলাম, 'বেটি কেমন আছে?'

'এখন তেমন যন্ত্রণা নেই। ডাক্তার রাভিক ওকে ইনজেকশন দিয়ে-দিলেন। এখন ঘুমচ্ছে, কিন্তু মাঝ রাত্তিরে জেগে উঠে নানান বায়নাক্কা জুড়ে দেবে। সত্যি মাঝে মাঝে এমন বিরক্তি লাগে, ইচ্ছে করে গলায় দড়ি দিই কিংবা সব কিছু ভেঙে চুরমার করে দিই। আপনি হয়তো মনে মনে হাসছেন···'

'একটুও হাসছি না, লিসি। তোমার মতো সুস্থ স্বাভাবিক একটা মেয়ের পক্ষে তেমন ভাবটাই তো স্বাভাবিক। এখন ওর কাছে কে আছে?'

'ডাক্তার রাভিক।'

'আচ্ছা লিসি, তোমার কোনো বন্ধু নেই?'

'না। সত্যি বলতে কি বেটিই আমার একমাত্র বন্ধু।'

মনে মনে ভাবলাম টেনেনবামের প্রণয়িনী তাহলে অন্যজন কিংবা ও নিজেই মনে মনে ভাবে যমজ কোলার বোনেদের একজন ওর প্রণয়িনী।

লিসি জিগেস করলো, 'আচ্ছা আপনার কি মনে হয় যুদ্ধ শিগগিরই শেষ হয়ে যাবে?'

'তাই তো মনে হচ্ছে।'

'তারপর কি হবে?'

'সেটা এখুনি বলা সম্ভব নয়, লিসি।'

'আরে, এই যে তরুণ পুঁজিপতি!' হঠাৎ আমাকে দেখতে পেয়ে ফ্রিয়েসল্যাণ্ডার সউল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলেন, পরক্ষণেই লিসির দিকে ফিরে জিগেস করলেন, 'বাদাম দেওয়া কেকটা খেয়ে দেখেছো ?'

'না।'

'দিন দিন যা রোগা হোচ্ছো! যাও যাও, গিয়ে একবার খেয়ে দেখে এসো।' লিসি চলে যাবার পর উনি আমাকে নিয়ে পড়লেন। 'শোনো রস, তোমাকে একটা কথা বলি···টাকা পয়সা যদি কিছু জমিয়ে থাকো, বিনিয়োগ করার এর চাইতে বড় সুযোগ আর কখনও পাবে না। এই মুহূর্তের জার্মান মার্কে কোনো মূল্য নেই ঠিকই, কিন্তু জার্মানীর মানুষকে কেউ কোনোদিনই দমিয়ে রাখতে পারবে না। ওরা শিগগিরই আবার নিজেদের দেশকে গড়ে তুলতে শুরু করবে। তুমি জানো কারা ওদের সাহায্য করবে ?'

'না।' নির্দ্বিধায় স্বীকার করলাম।

'আমরা, এই আমেরিকানরা।'

'সেকি!'

'নাৎসিরা বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা জার্মানীকে সমর্থন করবো। জার্মানীকে সমর্থন করবো রাশিয়ার বিরুদ্ধে। রাশিয়ার সঙ্গে আমাদের মৈত্রীচুক্তি অনেকটা দুজন সমকামীর সন্তান উৎপাদনের চেষ্টার মতো। কেননা দুজনের রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের! উচ্চ পদস্থ একজন সরকারী বন্ধুর কাছ থেকেই আমার এসব শোনা, তুমি যেন আবার কাউকে বলতে যেও না।'

'না না, এ ব্যাপারে আপনি সুনিশ্চিত থাকতে পারেন।'

'আমি জানি, নইলে তোমাকে বলতাম না। তুমি যে শুধু আমার দেনা শোধ করে দিয়েছো, তাই নয় ; তোমাকে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। তাই বলছিলাম, বিনিয়োগ করার এর চাইতে ভালো সুযোগ তুমি আর কখনও পাবে না।'

'কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমার সত্যিই টাকা নেই।'

ফ্রিয়েসল্যাণ্ডার আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্রয় দেওয়ার ভঙ্গিতে হাসলেন। 'নেই, সংগ্রহ করতে কতক্ষণ? এখনও অনেক সময় আছে। আমি শুনেছি তুমি একজন প্রথম শ্রেণীর বিক্রেতা। যদি নিজে থেকে কোনো ব্যবসা শুরু করতে চাও আমাকে বোলো। আমি টাকা দেবো, তুমি সময় দেবে। আমাদের দুজনের আধা-আধি ভাগ থাকবে।'

'ধন্যবাদ। আমি আপনাকে নিশ্চয়ই জানাবো।'

ফ্রিয়েসল্যাণ্ডার উঠে পড়লেন। 'ভুলো না কিন্তু।'

'না না, ভুলবো না।'

বিদায় জানিয়ে ফেরার সময় হাঙ্গেরিয়ান রাঁধুনী গুল্যাশের একটা পাত্র আমার দিকে এগিয়ে দিলো। লিসিকে বললাম, 'চলো, তোমাকে বাড়িতে পৌঁছে দিচ্ছি।'

ট্যাক্সিতে লিসির বাড়ি পৌঁছতে খুব একটা বেশি সময় লাগলো না।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে লিসি বললো, 'ওপরে যাবেন না?'

আমি বললাম, 'আজ থাক, লিসি।'

'ওমা, তা কি হয়। এতদূর এলেনই যখন কষ্ট করে…'

'আর একদিন ঠিক আসবো, তুমি দেখো।'

লিসি খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো। 'ভয় নেই, আমি আপনাকে আমার সঙ্গে প্রেম করতে বলবো না বা দেরিও করিয়ে দেবো না। শুধু এক পেয়ালা কফি বানিয়ে দেবো।'

শীতে কাঁপা নিঃসঙ্গ মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে আমি না করতে পারলাম না। চালককে ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে আমি ওর সঙ্গে ওপরে গেলাম। দরজা খুলে লিসি বিজলি বাতিটা জ্বালিয়ে দিলো। ঘরটা কেমন যেন বিষণ্ণ ধরণের। দেওয়াল জুড়ে চিত্রতারকাদের অজস্র ছবি টাঙানো। ওর নিজস্ব সম্পত্তি বলতে কেবল পশমের তৈরি একটা ভল্লুক আর কয়েকটা পুতুল।

'আপনি এক মিনিট বসুন, আমি এক্ষুণি আসছি।'

ব্যস্ত তৎপরতায় লিসিকে আর আদৌ নিষ্প্রাণ মনে হচ্ছে না। কফি

বানানোর পর আমার মুখোমুখি বসে লিসি নিজের জীবনের অনেক কথাই বলে গেলো আর আমি গভীর মনোযোগ দিয়ে তা শোনার ভান করলাম। এক সময়ে কফির পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে আমি উঠে পড়লাম। 'আজ আমি চলি, লিসি। দেখো, আজেবাজে স্বপ্ন দেখে রাতের ঘুমটা আবার মাটি কোরো না যেন।'

পরের দিন রীতিমতো তুষার পড়তে শুরু করলো। সন্ধ্যের সময় দেখলাম রাস্তাগুলো একেবারে সাদা হয়ে রয়েছে। আলো আর তুষারছাওয়া গগনচুম্বী বাড়িগুলোকে বিশাল বিশাল সব মধুচক্রের মতো মনে হচ্ছে। যানবাহনের শব্দ ভেসে আসছে যেন অনেক দূর থেকে। তখনও সমানে তুষার ঝরছে।

নাতাশা যখন এলো, আমি তখন মেলিকভের সঙ্গে দাবা খেলছিলাম। মাথা আর গা থেকে তুষারকণাগুলোকে ঝরিয়ে দিতে দিতে ও হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়লো। আমি ওকে জিগেস করলাম, 'তুমি গাড়ি নিয়ে এসেছো নাকি?'

'না। আমি একটা ট্যাক্সি নিয়েছিলাম।'

'ভালোই করেছিলে।' তুষারকণাগুলোকে ঝেড়ে ফেলার ব্যাপারে ওকে সাহায্য করতে করতে জিগেস করলাম, 'কোথায় যাবে বলো?'

'তুমি যেখানে বলবে।'

দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বাইরেটা একবার দেখে নিলাম। 'এখনও কিন্তু বেশ ভালোই তুষার পড়ছে। এই অবস্থায় বেরুলে তোমার লোমের কোটটাই নষ্ট হয়ে যাবে। আমার মনে হয় না থামা পর্যন্ত এখানেই অপেক্ষা করা ভালো।'

'ঘরে খাবার কিছু থাকলে এ রকম আবহাওয়ায় বাইরে বেরুবারই কোনো দরকার হতো না।'

হঠাৎ ক্রিয়েসল্যাণ্ডারের গুল্যাশের কথা মনে পড়ে যাওয়ায় বললাম, 'তোমার প্রিয় খাবারই আছে। শুধু যা একটু গরম করে নিতে হবে।'

'কিন্তু…'

'এসো। কোনো অসুবিধে হবে না। আমার নতুন ঘরটায় দরজা বন্ধ করে দিলে কেউ কিচ্ছু জানতে পারবে না।'

আলো জ্বাললে দিনের চাইতে রাতেই ঘরখানাকে বেশি সুন্দর দেখায়, বিশেষ করে লিসা তিরুয়েলের সুন্দর কারুকার্য করা বাতির ঢাকনাটার জন্যে। ওর রেখে যাওয়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বাসনগুলো আমাদের রাতের খাওয়ার জন্যে ব্যবহার করলাম। বৈদ্যুতিক-পাত্রে গুল্যাশটা গরম করে রাতের আহার-পর্ব সেরে নিতে খুব একটা সময় লাগলো না।

নাতাশা বললো, 'ঘরটা তেমন বড় না হলেও বেশ সুন্দর।'

যদিও বুঝতে পারছিলাম এত তাড়াহুড়ো করা উচিত নয়, তবু খাওয়া দাওয়ার পর আমার আর কিছুতেই তর সইছিলো না। এমনিতেই মনে হচ্ছিলো আমি যেন সুদীর্ঘকাল কোনো মহিলার সংস্পর্শে আসিনি, তার ওপর নাতাশার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আমার বরাবরই মনে হয় ওর পোশাকের নিচে পরণে বুঝি কিছু নেই। কেন জানি না বোকার মতোই বলে ফেললাম, 'বিছানাটা ছোট হলেও আমাদের দুজনের খুব একটা অসুবিধে হবে না।'

নাতাশা হাসলো। 'তোমার তাই মনে হয় বুঝি?'

'হ্যাঁ, নাতাশা। তুমি কিছু মনে কোরো না। আমি সত্যিই নিজেকে ধরে রাখতে পারছি না। আমার ইচ্ছে করছে তোমার মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে একেবারে হারিয়ে ফেলতে।'

'তাহলে দরজাটা আগে বন্ধ করে দাও।'

তারপর দুজনে যেন একেবারে রিক্ত নিঃশেষ হয়ে গিয়ে বিছানায় শুয়ে রয়েছি, যেন পৌঁছে গেছি ঘুমের শেষ প্রান্ত সীমায়। আমার পাশে অনুভব করতে পারছি নাতাশার চুল, ওর নিটোল স্তনভার, ওর স্পন্দিত পাঁজরের মৃদু ওঠা-নামা। যদিও নাতাশা তখনও সম্পূর্ণ নাতাশা কিংবা নামহীন কোনো নারীতে পরিণত হয়নি, তবু নিজেকে আমার পরিতৃপ্ত মানুষের মতো কেমন যেন সুখী মনে হচ্ছে।

নাতাশা বললো, 'আমাকে একটা সিগারেট দাও না, লক্ষ্মীটি।'

'নিশ্চয়ই, আমি একদম ভুলেই গিয়েছিলাম।'

হাত বাড়িয়ে ছোট টেবিল থেকে প্যাকেটটা তুলে নিয়ে আমি ও সিগারেটটা ধরিয়ে দিলাম।

নাতাশা জিগেস করলো, 'বিজলী বাতির এই ঢাকাটা কি তু হলিউড থেকে নিয়ে এসেছো?'

'উঁহু, আমি যখন এ ঘরে উঠে আসি তখন এটা এখানেই ছিলো।'

'এটা মেক্সিকান। এবং আমি বাজি রেখে বলতে পারি জিনিসট কোনো মহিলার।'

'হয়তো তোমার তুটো অনুমানই সত্যি, নাতাশা। কেননা এর আ এই ঘরে যিনি ছিলেন, তিনি মেক্সিকান এবং ভদ্রমহিলার নাম লি ত্রিরুয়েল।'

'কিন্তু এরকম সুন্দর একটা জিনিস ফেলে রেখে কোনো মহিলা কি করে উঠে গেলেন?'

'অনেক সময় অনেক কিছু জিনিসই আমাদের ফেলে রেখে চ যেতে হয়, নাতাশা।'

'হ্যাঁ, বিশেষ করে পেছনে পুলিস লাগলে। সত্যি, মাঝে মাঝে এ বোকার মতো বলে ফেলি, যার কোনো মানেই হয় না।'

ভদকার গেলাসটা ভর্তি করে আমি ওর দিকে এগিয়ে দিলাম।

'আমিও তাই, নাতাশা।'

'জানো রবার্ট, কাল তুমি যখন বলেছিলে তোমার একটা নেম আছে, আমি ঠিক বিশ্বাস করিনি। গুল্যাশের পাত্র দেখে এখন বুঝ পারছি কথাটা সত্যি।'

'তুমি বিশ্বাস করো নাতাশা, আমি খুব কমই মিথ্যে বলার চে করি।'

'কিন্তু আমি তোমাকে খুব কমই সত্যি কথা বলি, রবার্ট। আ তোমাকে কোনোদিনই বলিনি যে আমি তোমার প্রতি অবিশ্বস্ত ছিলাম

'আমাদের দুজনের যা সম্পর্ক, তাতে অবিশ্বস্ত শব্দটা ঠিক খাটে না, নাতাশা।'

'কেন?'

'যেহেতু ওই শব্দটা এমনই একটা চুক্তির প্রতি ইঙ্গিত করে, যা আমরা কখনও করিনি। ওটাকে তুমি বলতে পারো পরস্পরের প্রতি এক ধরনের আইনগত অধিকার। যদি তুমি অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে শুয়েও থাকো, তাহলে তুমি তোমার কাছে অবিশ্বস্ত হতে পারো, কিন্তু আমার কাছে নয়।'

'তবু তোমার কাছে কি শব্দটা ভয়ংকর মনে হচ্ছে না?'

'না, নাতাশা। শব্দটা আমার কাছে মনে হচ্ছে কেউ যেন বলছে—আমি তোমাকে ভালোবাসি, অথচ আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করছি ভালো না বাসার।'

নাতাশা অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকালো আমার দিকে। তাকিয়ে কি যেন ভাবলো। তারপর অস্ফুটে বললো, 'তবু আমি বরাবরই তোমার কাছে অবিশ্বস্ত ছিলাম, রবার্ট।'

'আর আমি বরাবরই তোমাকে ভালোবাসতে চেয়েছিলাম, নাতাশা। কিন্তু ওটার সঙ্গে এটার কোনো সম্পর্ক নেই। দুটো জিনিস সম্পূর্ণ ভিন্ন—জল আর বাতাসের মতো, ওরা পরস্পরকে নাড়িয়ে যায় বটে, কিন্তু কখনও মিশে যায় না।'

'কেন এমন হয় বলতে পারো?'

'ঠিক জানি না—হয়তো আমরা পরস্পরকে বিশ্বাস করি না, কিংবা বিশ্বাস করতে চাই না, তাই। কিন্তু এই মুহূর্তে তুমি আমার পাশে রয়েছো, এর চাইতে বেশি কিছু আমি আর চাই না, নাতাশা।'

পরের দিনই মিশরায় বেড়ালটা আমি দেড় হাজার ডলারে একজন ডাচ-ম্যানের কাছে বিক্রি করে দিলাম। টাকাটা পকেটে পোরার মুহূর্তে কেন জানি আমার কানের কথা মনে পড়ে গেলো। ফোনে ওকে আমি নির্দিষ্ট

একটা রেস্তোরাঁয় আমার সঙ্গে নৈশভোজের জন্যে আমন্ত্রণ জানালাম।

কান যখন এসে পৌঁছলো, ওকে কেমন যেন মনমরা আর ভীষণ অন্যমনস্ক মনে হচ্ছিলো। অনেকদিন পর ওকে দেখে আমি সত্যিই শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। 'কি ব্যাপার কান, তোমার কি শরীর খারাপ?'

'শরীর নয়, মন। গতকাল কারমেনের একটা চিঠি পেয়েছি। ওর ধারণা আমাদের পরস্পরে বিচ্ছিন্ন থাকাই ভালো, কেননা আমরা কেউ কাউকে বুঝতে পারি না। ও জানিয়েছে আমাকে আর কোনো চিঠি লিখবে না। তোমার কি মনে হয় অন্য কারুর সঙ্গে ওর আলাপ হয়েছে?'

স্পষ্টই বুঝতে পারলাম কারমেনের সংবাদ পেয়ে কান গভীরভাবে মর্মাহত হয়েছে। তাই অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গেই বললাম, 'আমার কিন্তু তা আদৌ মনে হয় না। হলিউডের দিনগুলোতে আমি বেশ কয়েকবার ওর সঙ্গে দেখা করেছি। কিন্তু বাড়িউলি আর বাগানে মুরগীর ছানাগুলো ছাড়া ও অন্য কাউকে চেনে বলে আমি সত্যিই ভাবতে পারছি না। আসলে ওকে কিছু করতে হচ্ছে না বলেই ও খুশি।'

'তোমার কি মনে হয় আমার নিজে গিয়ে ওকে ফিরিয়ে আনা উচিত? ও কি ফিরে আসতে চাইবে?'

'আমার তা মনে হয় না, কান।'

'আমারও তাই মনে হচ্ছে। কিন্তু এখন কি করা উচিত আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'কিছুদিনের জন্যে ওর সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রেখে অপেক্ষা করে দেখতে পারো। বলা যায় না, হয়তো একদিন ও নিজে থেকেই ফিরে আসতো পারে।'

'তুমি কি নিজেও তাই বিশ্বাস করো?'

'না, কান।' আমি স্পষ্টই স্বীকার করলাম। কেননা সমস্ত ব্যাপারটাই আমার কাছে কেমন যেন অদ্ভুত আর অবাস্তব মনে হচ্ছে, কি জানি হয়তো বা কিছুটা বিপজ্জনকও বটে। বিপজ্জনক কানের দিক থেকে। তার মতো বলিষ্ঠ, প্রতিভাদীপ্ত একজন মানুষের পক্ষে উদাসীনতায় মেশা

কারমেনের এমন মারাত্মক ধরনের করুণ সৌন্দর্যকে এতটা প্রশ্রয় দেওয়াটা আদৌ বাস্তব হয়নি। আজ যদি হঠাৎ কারমেনের অনীহাকে সে এতটা গুরুত্ব দেয়, তাহলে তার মনোবলই ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে পড়বে। 'আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় কারমেনকে পেলে জীবনে তুমি সত্যিই সুখী হতে ?'

'অর্থাৎ তুমি বলতে চাও আমরা পরস্পরের উপযুক্ত নই ?' এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে কান কি যেন ভাবলো। 'হ্যাঁ, একদিক থেকে কথাটা অবশ্য সত্যি। তবে কারমেনের জন্যে আমাকে যতটা মনমরা ভাবছো, আসলে আমি ততটা মনমরা নই। সব মিলিয়ে কিছুদিন থেকে এমনিতেই মনটা আমার ভারি হয়ে রয়েছে।'

'যুদ্ধ শেষ হয়ে আসছে বলে ?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। কিছুটা সেজন্যেও বটে। বলতে পারো যুদ্ধ শেষের ঠিক পরের মুহূর্তে আমরা কি করবো ?'

'সেটা এখনই বলা খুব মুশকিল, কান। একদিন যুদ্ধ শেষ হবে, সে ব্যাপারে আমরা যেমন সুনিশ্চিত ছিলাম না, ঠিক তেমনি ভাবে যুদ্ধ শেষ হলে আমরা কি করবো সে ব্যাপারেও এখনও সুনিশ্চিত নই।'

'তুমি কি এখানে থেকে যেতে চাও ?'

'সেটা এই মুহূর্তে বলা সম্ভব নয়, কান। অর্থাৎ আমি এখনও পর্যন্ত কিছু ভেবে উঠতে পারিনি।'

'আমি কিন্তু সব সময়ে কেবল এইসব কথাই ভাবছি। আমার তো মনে হয় আমাদের মতো উদ্বাস্তুদের পক্ষে ব্যাপারটা যে শুধু মারাত্মক তাই নয়, হতাশাব্যাঞ্জকও বটে। এতদিন যুদ্ধ আমাদের প্রতি অন্যায় অবিচার করেছে. এই মনোভাবই পোষণ করে এসেছি। কিন্তু এখন যখন যুদ্ধ শেষ হবে, অন্যায় অবিচারও উধাও হয়ে যাবে। আমরা আবার ফিরে যেতে পারবো। কিন্তু কেন ? কোথায় ? কিসের জন্য ? কারা আমাদের চাইবে ? কেমন করেই বা আমরা ফিরে যাবো ?'

'অনেকে আবার এখানে থেকেও যাবে।'

'যারা সত্যিকারের মর্মাহত হয়েছে তারাই এখানে থাকবে, যারা সুবিধেবাদী তারা নয়।'

'আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে একমত হতে পারছি না, কান।'

'আমি বিশেষ করে উদ্বাস্তু ইহুদিদের কথাই বলছি, যারা দুহাজার বছর ধরে পিঠে ক্রুশকাঠের ভারি বোঝা বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে, তারা।'

প্রসঙ্গ পালটাবার জন্যেই বললাম, 'আমাদের শেভাল ব্লাঙ্কের পুরনো বোতলটা কিন্তু খালি হয়ে গেছে। চলো, আর একটা নতুন বোতল নিয়ে আমার ঘরে বসে পান করতে করতে গল্প করি।'

কান কঠিন চোখে আমার মুখের দিকে তাকালো। 'খুব বড়লোক হয়েছো বলে মনে হচ্ছে?'

আমি হাসলাম। 'এই মুহূর্তে আমি কিন্তু খুব একটা গরীব নই, কান।'

'তুমি তো জানো রবার্ট, মাতাল হবার মতো পান আমি করি না।'

'জানি, তবু তুমি আমার হোটেলে চলো।'

আমরা দুজনে বাইরে বেরিয়ে এলাম। কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে।

কান বললো, 'আজ থাক। কাল যাবো।'

আমি জেদ ধরলাম, 'না, কাল নয়। আজই চলো।'

কান চটে উঠলো। 'বোকার মতো বোলো না। আজ রাতে আমার একটা মিলনের ব্যবস্থা পাকা করা আছে।'

আমি ওর কথাটা হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলাম। 'থাক, আর ঠাট্টা করতে হবে না।'

'ঠাট্টা নয়, রবার্ট। সত্যিই আজ আমার লিসি কোলারের সঙ্গে সহবাস করার কথা আছে।'

কানকে অবিশ্বাস করার আমার কোনোদিনই কোনো কারণ ঘটেনি, এবং এই মুহূর্তে তার বলার ভঙ্গিতে, তার কণ্ঠস্বরের দৃঢ়তায় আমি আদৌ অবিশ্বাস করতে পারলাম না। তাছাড়া কারমেনের চাইতে যে অনেক বেশি জীবনমুখীন, সেই সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী লিসিও যে দেহের চাহিদা

অনুভব করবে সেটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু কেন জানি আমার হঠাৎই মনে হলো, কান হয়তো কারমেনের বিরুদ্ধ-প্রকৃতির কথা জেনেই ওর ছিন্নমূল অস্তিত্বকে সযত্নে আগলে রাখতে চেয়েছিলো, আর সেই জন্যেই কানের প্রতি প্রচ্ছন্ন সহানুভূতিতে ভরে উঠলো আমার সারা মন।

কান চায়নি, তবু আমি তাকে ঘর পর্যন্ত পৌঁছে দিলাম। পাশ দিয়ে চলে যাওয়া গাড়ির পেছনের রক্তিম আলোগুলো যেন বৃথাই হিমেল রাত্রিকে উত্তপ্ত রাখার চেষ্টা করছে। দূর থেকেই দেখতে পেলাম রেডিওর দোকানের ওপর কানের ঘরে আলো জ্বলছে। কি জানি লিসি হয়তো এখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল বাঁধছে আর কানের জন্যে ব্যাকুল আগ্রহে প্রতীক্ষা করছে।

সম্ভবত আমার মনোভাব কিছুটা অনুমান করতে পেরেই কান বলল, 'আমার জন্যে তোমাকে অমন মা-মুরগীর মতো উদ্বিগ্ন হতে হবে না। রাত্তিরে আমি যখনই কোথাও যাই, ঘরের আলোটা জ্বালিয়ে রাখি। অন্ধকার ঘরে ঢুকতে আমার সত্যিই খুব খারাপ লাগে। তাছাড়া আলো জ্বালিয়ে রাখলে ঘরটাও একটু গরম থাকে।'

'অন্যান্য শহরের তুলনায় নিউ ইয়র্কে ঠাণ্ডাটা যেন বড্ড বেশি।'

'হ্যাঁ, অনেক বেশি।' কান আমার দিকে তার হাতটা বাড়িয়ে দিল। 'শুভরাত্রি, রবার্ট।'

'শুভরাত্রি, কান।'

## একুশ

জানুয়ারীতে বেটি স্টেইন মারা গেলো। শেষ জার্মান আক্রমনই ওর মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করে দিয়েছিলো। দিনের পর দিন মিত্রশক্তির অগ্রগতি ও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করতো, কিন্তু যেদিন পৃথিবাকে স্তম্ভিত করে দিয়ে জার্মান প্রতিআক্রমনের খবর শুনলো, সেদিনই ওর শক্তির যাকিছু সঞ্চয় একেবারে তাসের প্রাসাদের মতো ভেঙে পড়লো। কেনই জানি ওর মনে

হলো জার্মানীর মানুষ নাৎসিদের বিরুদ্ধে কোনোদিনই কিছু করবে না। এমন কি সেই জার্মান আক্রমনকে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করে দেওয়ার সংবাদও ওর মানসিক শক্তিকে এতটুকু সুসংহত করতে পারেনি। একদিন সকালে লিসি ওকে মৃত অবস্থায় দেখতে পেলো। ওর চিরআকাঙ্ক্ষিত বার্লিন স্বপ্নেই রয়ে গেলো, প্রকৃত পক্ষে যে বার্লিনের এখন আর কোনো অস্তিত্বই নেই।

বেটির ইচ্ছানুসারে ওকে কবর দেবারই ব্যবস্থা করা হলো। কেননা বৈদ্যুতিক চুল্লিতে পোড়ানোর ব্যাপারটা ওকে বরাবরই জার্মান বন্দী-শিবিরের কথা স্মরণ করিয়ে দিতো।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দিন পথ ঘাট তুষারে একেবারে সাদা হয়ে রয়েছে, যেন সারা শহরটাকেই তুষারের নিচে কবর দেওয়া হয়েছে। ঝকঝকে ঘন নীল আকাশ, মাঝ মধ্যিখানে নিরুত্তাপ সূর্যটা জ্বলজ্বল করছে।

কবরখানা সুসংলগ্ন গির্জাটায় ভিড় উপছে উঠছে। ওদের অনেককেই বেটি এককালে সাহায্য করেছিলো, হয়তো সে কথা ওরা ভুলেও গিয়েছিলো, আজ আবার মনে পড়েছে। আনুষ্ঠানিক আড়ম্বরের কোথাও কোনো অভাব ছিলো না। অদৃশ্য ধ্বনি-গ্রাহকযন্ত্র থেকে বাদ্য আর নির্বাচিত সংগীতের রেকর্ড বাজানো হচ্ছে। লোকসংগীতগুলো গেয়েছেন বিংশশতাব্দীর একজন বিখ্যাত জার্মান ইহুদি গায়ক, রিচার্ড টাউবার, যাঁকে একদিন বর্বর নাৎসিরা জার্মানী থেকে বার করে দিয়েছিলো, যে জার্মানীর আর আজ কোনো অস্তিত্বই নেই, আর যিনি প্রায় অখ্যাত অবস্থাতেই ফুসফুসে ক্যান্সার নিয়ে ইংল্যাণ্ডে মারা গিয়েছিলেন। বেটির রুচির সঙ্গে সংগতি রেখেই ছড়িয়ে পড়েছে উদাত্ত জার্মান লোকসংগীতের আশ্চর্য মিষ্টি একটা সুরমূর্ছনা, আর সেই সুরমূর্ছনারই রেশ নিয়ে কবর দেওয়া হচ্ছে জার্মানীর একজন প্রকৃত বীরাঙ্গনাকে।

আমার ঠিক পেছনেই কার যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ওঠা কান্নার শব্দে চকিতে ফিরে তাকালাম। টেনেনবাম। উস্কখুস্ক চুল, না-কামানো দাড়ি, শুকনো মুখ। স্পষ্টই বুঝতে পারলাম ও এই সবে ক্যালিফোর্নিয়া থেকে

এসে পৌঁছেছে। বলা যায় না, জীবনে ও যতটুকু প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে, তার জন্যে হয়তো অন্য অনেকের মতো বেটি স্টেইনের কাছে ঋণী।

শেষ কাজ মিটে যাবার পর আমরা আবার বেটির বাড়িতে মিলিত হলাম। এটাও বেটির শেষ ইচ্ছার অন্যতম নির্দেশ—সব কাজ মেটার পর আমরা সবাই যেন ওর বাড়িতে মিলিত হই এবং উচ্ছল হবার চেষ্টা করি। পূর্ব ব্যবস্থা মতো লিসি আমাদের কেক আর মদ পরিবেশন করলো।

বেটির ইচ্ছা সত্ত্বেও আমাদের পক্ষে উচ্ছল হওয়া সম্ভব ছিলো না। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে আমরা বিচ্ছিন্ন ভাবে পান করছিলাম। আমার সঙ্গে রয়েছে রাভিক, টেনেনবাম আর কুচকুচে কালো চুল, গাট্টাগোট্টা চেহারার এক ভদ্রলোক, যাঁকে আগে কখনও দেখিনি।

ভদ্রলোক রাভিককে জিগেস করলেন, 'এই ঘরগুলোর কি হবে?'

'বাড়িটা এবং যাকিছু জিনিস পত্তর বেটি সবই লিসির জন্যে রেখে গেছে, মিস্টার মেয়ার।'

লিসি তখন দ্বিতীয় দফায় আমাদের মদ পরিবেশন করছিলো, মেয়ার ওকে জিগেস করলেন, 'এত বড় বাড়ি নিশ্চয়ই তোমার কোনো কাজে লাগবে না লিসি? যে তিনজন আমরা এখানে রয়েছি, প্রত্যেকেরই মাথা গোঁজার জন্যে একটা জায়গার বিশেষ প্রয়োজন।'

কেঁদে কেঁদে ফুলিয়ে ফেলা লিসির দু চোখের প্রান্তে তখনও চিকচিক করছিলো দু ফোঁটা অশ্রু, কোনো রকমে নিজেকে সামলে রেখে লিসি বললো, 'এক মাসের ভাড়া আগাম দেওয়া আছে, মিস্টার মেয়ার।'

'ঠিক আছে, মাসটা শেষ হলেই না হয় তুমি আমাদের দিও।' মেয়ার গেলাসে ছোট্ট একটা চুমুক দিলেন। 'এটা তো ঠিক, আমরা সবাই বেটির বন্ধু। আশা করি, বাড়িটা তুমি নিশ্চয়ই অন্য কোনো অপরিচিত লোককে দেবে না।'

'আচ্ছা, মিস্টার মেয়ার,' ক্রুদ্ধস্বরে টেনেনবাম বললো, 'এসব কি এখনই আলোচনা করার সময়?'

'কেন নয়? আজকালকার দিনে নিউ ইয়র্কের মতো শহরে ঘর পাওয়া

চাড্ডিখানিক কথা! তাছাড়া এই বাড়িটার মুখ চেয়ে আমরা দীর্ঘদিন অপেক্ষা করে ছিলাম।'

'তাহলে অনুগ্রহ করে আর কটা দিন অপেক্ষা করে থাকুন।'

'সত্যিই পারছি না। কালই আমি শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছি। হয়তো সপ্তাখানেকের আগে আর ফিরতে পারবো না।'

'সপ্তাখানেক পরেই এসে না হয় কথা বলবেন।'

'কিন্তু একটা জিনিস আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না,' অধৈর্য হয়ে মেয়ার গেলাসটা নামিয়ে রাখলেন। 'বেটি বেঁচে থাকলে ও নিশ্চয়ই চাইতো না ওর বন্ধুরা কেউ না পেয়ে বাড়িটা অন্য কোনো অপরিচিত লোক পাক।'

'না, ও কোনোদিনই তা চাইতো না,' টেনেনবাম প্রায় গর্জন করে উঠলো, কেননা নিজেকে সে যমজ দুই বোনেরই অভিভাবক হিসেবে মনে করে। 'আর চাইতো না বলেই, বিনা স্বার্থে যে ওর দেখাশোনা করছে তাকেই ও সবকিছু দিয়ে গেছে। এ সম্পর্কে আপনার কিছু বলারই থাকতে পারে না।'

মেয়ার চটে উঠলেন। 'মৃতের প্রতি তোমার সম্মান দেখানো উচিত টেনেনবাম।'

'অনুগ্রহ করে আপনি চুপ করুন, মিস্টার মেয়ার।' রাভিক প্রতিবাদ না করে পারলো না।

'কি বললেন?'

'চুপ করুন। বাড়িটা যদি আপনার প্রয়োজন থাকে কুমারী কোলারকে লিখিত প্রস্তাব দিতে পারেন।'

'লিখিত প্রস্তাব! কেন?' বুনো ঘোড়ার মতো মেয়ার ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। 'আমরা কি নাৎসি নাকি? আমার মুখের কথা কি যথেষ্ট নয়?'

'না।' টেনেনবাম গর্জে উঠলো। 'আপনার লজ্জা করছে না, বেটি যতদিন অসুস্থ ছিলো একদিনও দেখতে আসতে পারেননি, আর আজ ও

মরতে না মরতেই বাড়িটা পাবার জন্যে ছুটে এসেছেন?'

কোনো কথা না বলে মেয়ার ঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেলেন।

আমি টেনেনবামকে জিগেস করলাম, 'তুমি এখন এখানেই থাকবে নাকি?'

'না, আমাকে ফিরে যেতে হবে। অভিনয়ের যে কাজটা পেয়েছি এখনও শেষ হয়নি।' হঠাৎ যেন মনে পড়েছে, এমনি ভাবে ও জিগেস করলো, 'কারমেন বিয়ে করেছে আপনি জানেন?'

'সেকি, না তো! কবে?'

'প্রায় সপ্তাখানেক আগে।'

'তুমি ঠিক জানো ও বিয়ে করেছে?'

'নিমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে আমিও ছিলাম। যে ছেলেটির সঙ্গে ওর বিয়ে হয়েছে, ও খুব নামকরা একজন বেসবল খেলোয়াড়। ওদের অবস্থা বেশ ভালো। নিজেদের মুরগীর খামার আছে। ফুল আর শাক-শব্জ নিয়মিত বাজারে যায়।'

আমি কৌতূহলী না হয়ে পারলাম না। 'কারমেনের সঙ্গে ওর আলাপ হলো কি করে?'

'ওর বোন কারমেনের বাড়িউলি।'

'ও, আচ্ছা!' কেন জানি না সেই মুহূর্তে আমার কানের কথা মনে পড়ে গেলো। গির্জায় ভিড়ের মধ্যে ওকে একবার দেখেছিলাম বটে, কিন্তু এই ঘরে এখন ওকে দেখছি না। টেনেনবামকে জিগেস করলাম, 'কান এ খবর জানে?'

'আমি ঠিক জানি না।'

'ও এখন কোথায়?'

'পাশের ঘরে হোলজার আর ফ্রাঙ্কের সঙ্গে গল্প করছে।'

বৈঠকখানায় কানকে খুঁজে পেলাম। ওর সঙ্গে রয়েছে হোলজার, একজন অভিনেতা, আর ফ্রাঙ্ক, হিটলারের আগে যিনি ছিলেন একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠিত

সাহিত্যিক।

১৯৩২ সালে হোলজার ছিলো আশ্চর্য সুন্দর দেখতে, প্রতিভাবান একজন তরুণ অভিনেতা। শুধু অভিনেতা নয়, হোলজার ছিলো মেয়েদের স্বপ্নলোকের নায়ক। অথচ আজ সে আমেরিকায় বাড়তি কোনো চরিত্রে অভিনয় করারও সুযোগ পায়নি।

আমি যখন ভেতরে ঢুকলাম, হোলজার তখন হাসতে হাসতে বলছে 'আমার দর্শকদের বারো বছর বয়েস বেড়েছে ঠিকই, কিন্তু আমরা একই সঙ্গে বুড়ো হয়নি। কেননা ওরা আমাকে কেউ বুড়ো হতে দেয়নি, ওরা আমাকে দেখেছে সেই ১৯৩২-এর আগে।'

'তবু তো তোমার সান্ত্বনা, তুমি অন্তত দর্শকদের কাছে বুড়ো হওনি,' ফ্রাঙ্কও হাসতে হাসতে বললেন, কিন্তু ওঁর সেই হাসির মধ্যে লুকনো ছিলো এমন একটা প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ, যেটাকে কিছুটা ব্যাঙ্গেরই মতো মনে হলো। 'আর ১৯৩৩ সালে ওরা যখন আমার সমস্ত বই পুড়িয়ে দিলো, আমার বয়েস তখন চৌষট্টি। অত বছর বয়সেও আমার নিজেকে কখনও বুড়ো মনে হয়নি, অথচ আজ এই সাতাত্তর বছর বয়েসে শুধু বুড়ো নয় নিজেকে একেবারে নিঃশেষ মনে হচ্ছে।'

অস্থি মজ্জায় মিশে থাকা ফ্রাঙ্ক এমনই এক ধরনের জার্মান সাহিত্যিক যাঁর অনুবাদের সব রকম প্রচেষ্টাই প্রায় ব্যর্থ হয়েছে। আবার উনি এমনই গোঁড়া জার্মান যে ইংরাজি শেখার কোনো রকম চেষ্টাই করেননি।

হোলজার বললো, 'যুদ্ধের শেষে তবু আপনার বই পুনঃ প্রকাশিত হতে পারবে, কিন্তু আমার সে সম্ভাবনাও নেই।'

'আমার বই ? জার্মানীতে ? বারো বছর ধরে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক শিক্ষার পরেও ?'

ঠাট্টার ছলে আমি বললাম, 'হতেও তো পারে ?'

'অসম্ভব !' ম্লান চোখে তাকিয়ে ফ্রাঙ্ক মাথা নাড়লেন।' ওরা আমাকে ভুলেই গেছে। আমাকে ওদের আর কোনো প্রয়োজন নেই। ওদের এখন দরকার নতুন সাহিত্যিকদের। অথচ ১৯৩৩-এর আগে পর্যন্ত আমার মাথায়

ছিলো নানান ধরনের পরিকল্পনা। এখন আর একটাও নেই। আমি সম্পূর্ণ বুড়িয়ে গেছি। বার্ধক্য কখন যে গুঁড়ি মেরে এসে আমার সমস্ত সত্তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে আমি টেরও পাইনি। কখন জানতে পারলাম জানো? যখন বুঝতে পারলাম যে যুদ্ধে নাৎসিরা হেরে যাচ্ছে এবং আমরা আবার ফিরে যেতে পারবো, তখন। কিন্তু কোথায় কিসের জন্যে ফিরে যাবো? আমি যে একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেছি।'

কেউ কোনো জবাব দিলো না। সেই মুহূর্তে ওঁর প্রশ্নের জবাব দেওয়া কারুর পক্ষে সম্ভবও ছিলো না। আমি জানলার বাইরে দিয়ে নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছি। রাস্তা দিয়ে যখনই কোনো ভারি ট্রাক যাচ্ছে, ঘরটা মনে হচ্ছে যেন কাঁপছে।

একটু পরে হোলজার আর ফ্রাঙ্ককে বিদায় জানিয়ে কান আমার পাশে এসে দাঁড়ালো।

'আশা করি কারমেনের খবরটা তুমি নিশ্চয়ই শুনেছো?' ও জিগেস করলো।

'হ্যাঁ, একটু আগেই টেনেনবামের কাছে শুনলাম। তবে আমেরিকায় বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটাটাও খুব সহজ।'

কান হাসলো। 'আর কি বলে আমাকে সান্ত্বনা দেবে, রবার্ট?'

'জানি কান, সত্যিই তোমাকে সান্ত্বনা দেবার কোনো ভাষা আমার জানা নেই। তবু বলবো হোলজার বা ফ্রাঙ্কের চেয়ে তোমার অবস্থা অনেক ভালো। তুমি যেমন মেয়েদের স্বপ্নলোকের নায়ক নও, তেমনি আবার সাতাত্তর বছরের বুড়োও নও।'

'কিন্তু ফ্রাঙ্ক কি বললেন তুমি শুনেছো?'

'শুনেছি। ওঁনার আর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই, উনি একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেছেন। কিন্তু তুমিও কি নিঃশেষ গেছো কান?'

সেই মুহূর্তে কান কোনো জবাব দিলো না। কিন্তু আমি স্পষ্টই বুঝতে পারলাম, সুকঠিন শৃঙ্খলায় এতদিন নিজেকে পরিচালিত করে এসেছে যে মানুষ, আজ তার ধৈর্যে কোথায় যেন একটা চিড় ধরেছে। হয়তো এর

জন্যে বেটির মৃত্যু বা কারমেনের উদাসীনতাই বহুল অংশে দায়ী। ও এখন চাইছে সবার দৃষ্টির আড়ালে থেকে নিজেকে গোপন রাখতে। যদিও জানি কোনো সান্ত্বনাতেই ওকে আর স্বস্তি দিতে পারবো না, তবু জিগেস করলাম, 'বেটির মৃত্যুতেই কি তুমি এমন মুষড়ে পড়েছো, কান?'

'না না, বেটি তো ভাগ্যবতী। ও ঠিক সময়েই মরেছে। যে বার্লিনকে দেখার জন্যে ও এতদিন বেঁচেছিলো, সেই বার্লিনকে দেখার জন্যে ফিরে গেলে ও হতাশাতেই মরে যেতো। বরং সেই তুলনায় ও সুন্দর একটা স্বপ্ন, একটা আশা নিয়েই মরেছে। সুতরাং এর মধ্যে হতাশ হওয়া বা মুষড়ে পড়ার কোনো কারণই থাকতে পারে না, রবার্ট।'

'যাক, শুনে তবু খুশি হলাম। আজ আমি যাই, কান। আমাকে এখন আবার কাজে ফিরতে হবে। কাল বরং তোমার সঙ্গে দেখা করবো।'

'ধন্যবাদ, রবার্ট।'

পূর্ব-প্রতিশ্রুতি মতো স্টুডিওতে গিয়ে নাতাশার সঙ্গে দেখা করলাম। ওখান থেকেই ওকে কোনো রেস্তোরাঁয় নিয়ে যাবো। আমি যখন পৌঁছলাম, মণি-মুক্তোয় সুসজ্জিত হয়ে নাতাশা উজ্জ্বল আলোর বৃত্তে বসে রয়েছে। কানে বড় বড় দুটো সোনার মাকড়ি, গলায় চুনি আর মুক্তোয় মেশানো হার, মধ্যমায় আংটির বেশ বড় একটা পান্না থেকে দ্যুতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

আমাকে দেখে নাতাশা ওখান থেকেই হাত নাড়লো। 'আর কয়েকটা বিশেষ ভঙ্গিতে ছবি তোলা হয়ে গেলেই আমার কাজ মিটে যাবে।'

বাইরে এখন মধ্যশীত, অথচ এখানে বসন্তের রঙিন সমারোহ। আর এসব রঙেরও অদ্ভুত অদ্ভুত নাম—কোবল্ট নীল, নীল নদীয় সবুজ, শস্য-ধূসর, মরুভূমিও বাদামী। এমনি সব রঙের মাঝে ফেনশুভ্র সার্টিনের ঢিলে বাহিবাসে নাতাশা নিষ্পাপ রাণীর মতো বসে রয়েছে। মুখে প্রসাধন, পোশাকের নিচে প্রস্ফুটিত স্তনভার, মুক্তোর মতো ঝকঝকে সাদা দাঁত, রঞ্জিত দীর্ঘ পল্লব, ঠোঁটে প্রান্তে মদালসা হাসি। অথচ কে বিশ্বাস করবে

আমি যদি বলি কয়েকদিন আগে হিমেল রাত্রে আমার উষ্ণ শয্যায় শুয়ে ওকে উল্লসিত শিৎকারে ভরে উঠতে শুনেছিলাম : আমি আর পারছি না, রবার্ট ! জোরে, আরও জোরে ! আঃ, তুমি আমাকে একেবারে ছিন্নভিন্ন করে ফেলো ! ভেতরে, আরও আরও ভেতরে দাও।'

অনেক দূর, যেন ঘন কুয়াশার মধ্যে থেকে আলোকচিত্র শিল্পীর গলা শুনতে পেলাম, 'বাঃ, খুব ভালো হয়েছে ! যাও, এবার জিনিসপত্তর সব বাঁধাছাঁদা করে ফেলো।'

উজ্জ্বল আলো নিক্ষেপকারী বাতিগুলো একসঙ্গে নিভে গেলো। একটু পরে ঠিক যেমন ছিলো তেমনি অবস্থায় নাতাশা বেরিয়ে এলো, শুধু গায়ে চড়িয়ে নিয়েছে লোমের সেই কোটটা। কানে মাকড়ি, গলায় চুনি আর মুক্তোয় মেশানো মালা, স্বল্প আলোয় আংটির পান্না থেকে তখনও বিচ্ছুরিত হচ্ছে দ্যুতি।

রীতিমতো ঘাবড়ে গিয়েই আমি প্রশ্ন করলাম, 'তুমি এইসব পোরেই রেস্তোরাঁয় যাবে নাকি ?'

'হ্যাঁ। জিনিসগুলো এমন সুন্দর যে ফিরিয়ে দিতে মন চাইছে না।'

'কিন্তু এত দামী জিনিস, যদি হারিয়ে যায় ?'

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে নাতাশা হেসে ফেললো। 'ভয় নেই, এগুলোর জন্যে বীমা করা আছে।'

'যাক, তবু বাঁচা গেলো। এখন কোথায় যাবে বলো ?'

'যেখানে খুশি। আমার কিন্তু ভীষণ খিদে পেয়ে গেছে

'চলো তাহলে প্যাভিলনেই যাওয়া যাক।'

'সেই ভালো।' নাতাশা আমার একটা হাত জড়িয়ে ধরলো, তারপর যেন হঠাৎ মনে পড়ায় মুখটা আমার দিকে উঁচিয়ে বললো, 'প্রসাধন তুলিনি বলে খারাপ দেখাচ্ছে না তো ?'

'একটুও না।'

'স্টুডিওর লোকজনের কাছে গেলে ওরা তাড়াতাড়িতে এমন ভাবে মুছে দেয়, হঠাৎ দেখলে তোমার মনে হবে আমি যেন পালক ছাড়ানো

কোনো মুরগী।'

'কিন্তু এখন তোমাকে দেখাচ্ছে ঠিক বিশাল কোনো শহরে হারিয়ে যাওয়া নন্দনকাননের মিষ্টি একটা পাখির মতো।'

রেস্তোরাঁ থেকে ফেরার সময় আমি নাতাশাকে বাড়িতে পৌঁছে দিলাম। হিম ঝরা অন্ধকার সদর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ও বললো, 'সত্যিই আমি দুঃখিত রবার্ট, যে আমাদের আলাদা কোনো ঘর নেই, তবু আমার মনে হয় আস্তে আস্তে প্রেম করলে পাশের ঘরের ভদ্রমহিলা কিছু জানতে পারবে না।'

'না তার চাইতে তুমি বরং আমার হোটেলে চলো। তাহলে আমাদের আর নিঃশব্দে প্রেম করতে হবে না।

'আমাকে যদি তোমার হোটেলেই নিয়ে যাবার ইচ্ছে ছিলো, তাহলে প্যাভিলন থেকে সোজা ওখানে নিয়ে গেলে না কেন?'

'ইচ্ছে থাকলেও তোমাকে ঠিক যেচে বলতে আমার সাহস হয়নি, নাতাশা।'

'তুমি ঠিক বলছো?'

'সত্যি, বিশ্বাস করো।'

'তাহলে যাও, একটা ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে এসো। আমি এখানেই অপেক্ষা করছি।'

আমি মোড়ের দিকে দৌড়ে গেলাম। যদিও অসম্ভব ঠাণ্ডা, তবু আমার জন্যে নাতাশা অপেক্ষা করছে ভাবতেই উষ্ণ আবেশে সারা শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো। ট্যাক্সি নিয়ে ফিরে আসতে না আসতেই নাতাশা অন্ধকার থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলো। আমরা একটা কথাও বলিনি, কেবল ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে পরস্পরের হাতগুলোকে বৃথাই উষ্ণ রাখার চেষ্টা করছিলাম। ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে এমন ভাবে জড়াজড়ি করে হোটেলে ফিরে এলাম, যেন আমরা বহুদিন পরস্পরকে দেখিনি।

পরের দিন ভোরে নাতাশা তখনও বিছানায় শুয়ে রয়েছে, আমি একটা

হোয়াইট আইল ধরিয়ে নিয়ে কফির জল বসিয়েছি। কফির সাজ-সরঞ্জাম আগেই গুছিয়ে রেখেছিলাম। যেহেতু হোটেলে রান্না করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, তাই সতর্কতামূলক ব্যবস্থার কোথাও কোনো রকম ত্রুটি রাখিনি।

সবে যখন পেয়ালায় কফি ঢালতে যাবো, হঠাৎ দরজায় টোকা দেওয়ার শব্দ শুনতে পেলাম। খুব জোরে নয়, কিন্তু বিরামবিহীন।

'তাড়াতাড়ি মাথা পা গুটিয়ে আমার ওভারকোটের মধ্যে ঢুকে পড়ো।'

ফিসফিসিয়ে আমি নাতাশাকে বললাম, তারপর দরজাটা খুলে একটু ফাঁক করলাম। দেখলাম সেই পোর্তো রিকান ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আমাকে দেখেই উনি ঠোঁটে আঙুল রেখে ইশারা করলেন, তারপর চাপা গলায় বললেন, 'পুলিস।'

'সেকি! কোথায়?'

'নিচে। ওরা তিনজন রয়েছে। হয়তো হোটেলের ঘরদোর সব খুঁজে দেখবে। আপনি একটু সাবধানে থাকবেন।'

'ওরা কিসের জন্যে এসেছে?'

'ঠিক জানি না। আপনি একা? সঙ্গে কোনো মেয়ে নেই তো?'

'না।'

'যাক, তবু ভালো। খুঁজে পেলে ওরা কিন্তু আপনাকে গ্রেফতার করবে।'

'সেই জন্যেই কি ওরা এসেছে?'

'বলতে পারবো না। আমার মনে হয়, ওরা হয়তো মেলিকভের জন্যে এসেছে। তবু আপনি একটু সাবধানে থাকবেন।'

নাতাশার জন্যে আমি সত্যিই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম। নিচে যদি পুলিস থাকে, ওর পক্ষে এখন ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। অন্য দিকে ওকে যদি আবার আমার ঘরের খাটের তলায় কিংবা স্নানঘরে খুঁজে পায়, তাহলে তার পরিণাম নিশ্চয়ই আরও খারাপ হবে।

হঠাৎ নাতাশা আমার পাশে এসে দাঁড়ালো। ইতিমধ্যেই ও পোশাক

পরে নিয়েছে। কোথায় কোনো চাঞ্চল্য নেই, শান্ত স্থির গলায় ও বললো, ‘ওরা ভ্লাদিমির ইভানের জন্যেই এসেছে। এই হোটেলের যে মালিক, ওটা একটা পালের গোদা।’

নাতাশাকে দেখে পোর্তো রিকাম ভদ্রমহিলা রীতিমতো শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। ‘শিগগির আপনি আমার ঘরে চলে আসুন, আর পেড্রোকে আমি এখানে পাঠিয়ে দিচ্ছি। কি বলতে চাইছি, বুঝতে পেরেছেন?’

‘হ্যাঁ।’

ভদ্রমহিলাকে অনুসরণ করে নাতাশা চলে যাবার একটু পরেই একজন মেক্সিকান তরুণ আমার ঘরে ঢুকলো। আতঙ্কের সবটুকু ছাপ তখনও ওর মুখ থেকে একেবারে মুছে যায়নি। সলজ্জ ভঙ্গিতে পেড্রো বললো, ‘এক-দিক থেকে এটা বেশ ভালোই হলো, সেনর।’

‘হ্যাঁ।’

অর্থাৎ পুলিস যদি আসে, দেখবে পেড্রো আমার অতিথি আর নাতাশা সেই পোর্তো রিকান ভদ্রমহিলার। স্নানঘরের জানলা টপকিয়ে বরফ জমা ছাদে লাফিয়ে পড়ার মতো অতি নাটকীয়তার চাইতে এই সমাধান অনেক সহজ।

‘বসো, পেড্রো। চুরুট চলবে?’

‘ধন্যবাদ, সেনর রবার্তো। আমার কাছে সিগারেট আছে। আমি বরং একটা সিগারেটই ধরাই।’

আমি স্পষ্টই বুঝতে পারলাম বেচারি বেশ ঘাবড়ে গেছে। সিগারেটটা ধরিয়ে নিয়ে ও বললো, ‘আসলে কি জানেন, আমার কাছে তো কোনো কাগজপত্র নেই, ভয়টা ওইখানে। হয়তো ওরা ওপরে আসবে না, তবু···

‘কাগজের কথা জিগেস করলে বলবেন বাড়িতে ফেলে এসেছেন।’

‘ওতে কোনো লাভ হবে না। ওরা হাঁ করলেই সব বুঝতে পারে আপনার কাগজপত্র সব ঠিক আছে?’

‘হ্যাঁ। কিন্তু কে আর মিছিমিছি পুলিসি ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে চায় বলুন।’ আমার অবস্থাও পেড্রোর চাইতে কিছু কম কাহিল নয়

আমি ওকে জিগেস করলাম, 'একটু ভদকা চলবে নাকি ?'

'ধন্যবাদ। বড্ড কড়া। বরং একটু কফি পেলে বেশ ভালো হতো।'

আমি ওকে কফি ঢেলে দিলাম, কয়েক চুমকেই ও পেয়ালাটা নিঃশেষ করে ফেললো। 'মেলিকভের জন্যে পুলিস কেন এসেছে আপনি জানেন ?' আমি জিগেস করলাম।

পেড্রো ডাইনে বাঁয়ে বেশ জোরে জোরে মাথা নাড়লো। আমার কেন জানি মনে হলো নাতাশার ইঙ্গিতটাই হয়তো সত্যি.

'আচ্ছা, আমরা মেলিকভের জন্যে কিছু করতে পারি না ?'

'উঁহু।' পেড্রো ঘাড় নাড়লো। 'আমার মনে হয় চুপ করে থাকাই ভালো। কিছু করতে গিয়ে ওঁর হয়তো আরও ক্ষতি হতে পারে। আচ্ছা সেনর রবার্তো, আপনার পাত্রে কি আর একটু কফি আছে ?'

বাকি কফিটুকু ওর পেয়ালায় ঢেলে দিলাম. বিজলি কফির পাত্রটা চালান করে দিলাম স্যুটকেসের মধ্যে। তারপর চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম নাতাশা কিছু ফেলে গেছে কিনা। কয়েকটা পোড়া সিগারেটের টুকরোয় রঙিন ঠোঁটের দাগ ছাড়া আর কোনো চিহ্ন নেই। আমি আস্তে আস্তে জানলা খুলে ছাইদানী থেকে পোড়া সিগারেটের টুকরোগুলো বাইরে ফেলে দিলাম. তারপর দরজাটা একটু ফাঁক করে বাইরে কান পেতে রইলাম।

ঝুল-বারান্দায় যেন অস্পষ্ট শব্দ শুনতে পাচ্ছি। একটু পরেই সিঁড়িতে শুনতে পেলাম ভারি পায়ের আওয়াজ। পুলিস ! কেননা ওদের পায়ের শব্দ আমি চিনি। জার্মানী, বেলজিয়াম, ফ্রান্সে ওদের পায়ের শব্দ আমি বহুবার শুনেছি

তাড়াতাড়ি দরজাটা বন্ধ করে দিলাম। 'ওরা আসছে।'

পেড্রোর হাত থেকে সিগারেটটা পড়ে গেলো।

আমি বললাম, 'ওরা ওপরে যাচ্ছে।'

'ওরা তাহলে সেনর মেলিকভের ঘরে যাচ্ছে।' পেড্রো সিগারেটটা তুলে নিলো।

আমি জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখলাম, উঠোনের ওপারের কয়েকটা জানলায় আলো জ্বলছে। পেড্রোকে জিগেস করলাম, 'আপনার বান্ধবীর ঘর কোনটে ? এখান থেকে দেখা যায় ?'

পেড্রো জানলার সামনে এসে দাঁড়ালো। ওর কোঁকড়ানো ঘন কালো চুলে তেলের মিষ্টি একটা গন্ধ পেলাম। জানলা দিয়ে একবার তাকিয়ে নিয়ে ও বললো, 'না, রাকোয়েলের ঘরটা উলটো দিকে। এখান থেকে দেখা যাবে না।'

আপাতত আমাদের অপেক্ষা ছাড়া আর কিছুই করার নেই। প্রতীক্ষার মুহূর্তগুলো মনে হচ্ছে যেন অন্তহীন। মাঝে মাঝে দরজাট একটু ফাঁক করে কান পেতে শুনছি। কিন্তু কোথাও কোনো শব্দ নেই মনে হলো হোটেলের সবাই যেন এতক্ষণে টের পেয়ে গেছে কি ঘটতে চলেছে। অবশেষে নির্ভুল সেই ভারি পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। ওর এখন ফিরে আসছে।

'আমার মনে হয়ে ওরা শুধু মেলিকভের জন্যেই এসেছিলো।'

পেড্রো স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো। 'ওরা মানুষকে কেন একটু শান্তিতে থাকতে দেয় না, আমি বুঝতে পারি না! ওখানে ওরা নিজেদের বোমায় হাজার হাজার মানুষকে মারছে আর এখানে কে কি করছে না করছে তার জন্যে ওদের ঘুম হচ্ছে না।'

'আপনি কি মেলিকভকে অনেকদিন ধরে চিনতেন ?'

'না, খুব বেশিদিন নয়।'

আমার কেনই যেন মনে হলো এভাবে আলোচনা করে মেলিকভকে সাহায্য করা যাবে না, বিশেষ করে অচেনা কোনো মানুষের সঙ্গে, যার কাছে বসবাসের উপযুক্ত অনুমতিপত্র নেই, এর চাইতে বরং চুপ করে থাকাই ভালো।

হঠাৎ দরজাটা খুলে গেলো। নাতাশা ভেতরে ঢুকলো। ওর পেছনে সেই পোয়ার্তো রিকান ভদ্রমহিলা।

'ওরা চলে গেছে।' নাতাশা বললো। 'সঙ্গে ভ্লাদিমিরকে নিয়ে

গেছে।'

পেড্রো উঠে দাঁড়ালো। ভদ্রমহিলা এগিয়ে এলেন। 'ঠিক আছে, পেড্রো। চলো, এবার আমরা যাই।'

আমি ওঁকে বললাম. 'সহযোগিতার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ, মাদাম।'

ভদ্রমহিলা হাসলেন। 'গরিবরাই পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করে।'

'না, সব সময় নয়।'

নাতাশা ওর চিবুকে চুমু দিলো। 'ঠিকানাটার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ, রাকোয়েল।'

'কিসের ঠিকানা?' ওরা চলে যাবার পর আমি জিগেস করলাম।

'মোজার। ওর খুব লম্বা মোজা আছে। অমন সুন্দর মোজা নিউ ইয়র্কে আমার কোনোদিন চোখে পড়েনি। তাই ও কোত্থেকে কিনেছে জিগেস করায় রাকোয়েল আমাকে একটা ঠিকানা দিয়েছিলো।'

'মেলিকভকে ওরা ধরে নিয়ে গেলো কেন কিছু জানো?'

'ঠিক জানি না। তবে হোটেলের যে মালিক, ওর কোকেনের চোরা-কারবার আছে। আমার মনে হয় ইভানকেও ও এর মধ্যে জড়িয়েছে। নিজে আড়ালে থেকে ইভানকে সামনে এগিয়ে দিয়েছে। এ পৃথিবীতে হেন কাজ নেই যা ওই পাজির পা-ঝাড়াটার পক্ষে করা সম্ভব নয়। নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে ভ্লাদিমির যদি অস্বীকার করতো, তাহলে ওকে লাথি মেরে দূর করে তাড়িয়ে দিতো। এই বুড়ো বয়েসে বেচারি কোথায় চাকরি খুঁজতে যাবে বলো?'

রাগে দুঃখে কি জবাব দেবো আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না, তবু জিগেস করলাম, 'ওর জন্যে আমাদের কিছু করার আছে বলে তোমার মনে হয়?'

'না। ওই পালের গোদাটাই যা কেবল ওকে সাহায্য করতে পারে। হয়তো ও ইভানকে জামিনে ছাড়িয়েও আনবে। ওর খুব নামজাদা একজন উকিল আছে। আমার মনে হয় লোকটা ওর নিজের স্বার্থেই ইভানকে সাহায্য করবে।'

'তুমি এত খবর কি করে জানলে, নাতাশা ?'

'কিছু কিছু আমি আগেই জানতাম, বাকিটা রাকোয়েলের কাছে শুনলাম। নাতাশা টেবিলের দিকে তাকালো। 'আমার কফি কোথায় ?'

'পেড্রো খেয়ে ফেলেছে। দাঁড়াও, আমি এক্ষুণি বানিয়ে দিচ্ছি।'

'থাক, লাগবে না। আমি বরং চলে যাই। বলা যায় না, পুলিস হয়তো আবার ফিরে আসতে পারে।'

'অসম্ভব নয়। চলো, আমি তোমাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

'না, তুমি এখানে থাকো। কেউ হয়তো আমাদের লক্ষ্য করতে পারে। তবু আমি একা থাকলে বলতে পারবো রাকোয়েলের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম।'

'একা যেতে তোমার খারাপ লাগবে না তো ?'

'না, রবার্ট। বরং কেন জানি না, বেচারি ইভানের জন্যেই আমার মনটা বেশি খারাপ লাগছে।'

সিঁড়ির মুখ পর্যন্ত নাতাশাকে এগিয়ে দিলাম। ত্রস্ত পায়ে ও নিচে নেমে গেলো। ওর অপসৃয়মান, ঋজু দেহরেখাটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হলো নাতাশাকে আমি বোধহয় আর কোনোদিনও আমার এই ঘরটাতে ফিরিয়ে আনতে পারবো না।

ফিরে এসে আমি টেবিলটা পরিষ্কার করে ফেললাম। বাসি রুটির টুকরোগুলো ফেলে দিলাম জানলা গলিয়ে। আর ঠিক তখনই বিপুল নিঃসঙ্গতায় আমার মনটা ভারি হয়ে উঠলো। একটা চুরুট ধরিয়ে নিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলাম। পঞ্চম সরণীটা একেবারে নির্জন, রাস্তায় তখনও বাতি জ্বলছে। আর তারই আলো পড়ে দোকানের কাঁচের সার্সী-গুলোকে মনে হচ্ছে যেন সারি সারি কাফন সাজানো রয়েছে। দূরের ঝাঁকড়া গাছের চুড়াটার দিকে চোখ পড়তেই মনে পড়ে গেলো সিসিলিতে যে বাদাম গাছটা দেখেছিলাম, আর কয়েকদিন পরেই তাতে ফুল ফুটবে।

# বাইশ

'দেখতে দেখতে সপ্তাগুলো রাস্তায় জমা তুষারের মতো গলে যেতে লাগলো। বেশ কিছুদিন আমি মেলিকভের কোনো খবর পাইনি, তারপর হঠাৎ একদিন সকালে দেখলাম ও ফিরে এসেছে।

'সব মিটে গেছে?' আমি জিগেস করলাম।

মেলিকভ মাথা নাড়লো। 'জামিনে ছাড়া পেয়েছি। এর পরে আবার শুনানি হবে।'

'ওরা কি সত্যিই তোমার বিরুদ্ধে কিছু খুঁজে পেয়েছে?'

'এসব আলোচনা না করাই ভালো, রবার্ট। এ শহরে যত কম জানবে, ততই তোমার পক্ষে মঙ্গল।'

'আমি বুঝতে পেরেছি, ভ্লাদিমির। তোমার শরীর কিন্তু বড্ড ভেঙে পড়েছে। এতদিন ওরা তোমাকে আটকে রাখলো কেন?'

'আমাকে এ সম্পর্কে আর কোনো প্রশ্ন কোরো না, রবার্ট। বরং আমার সঙ্গ তোমার এড়িয়ে চলাই উচিত।'

'না!' আমার কণ্ঠস্বর নিজেরই কাছে কেমন যেন আর্তনাদের মতো মনে হলো।

'সত্যিই কিন্তু তাই। তবে এখন একটু ভদকা খাওয়া যাক। আমরা অনেকদিন এক সঙ্গে কিছু পান করিনি।'

'তোমাকে কিন্তু একটুও সুস্থ মনে হচ্ছে না, ভীষণ রোগা দেখাচ্ছে।'

'এখন আমার বয়েস সত্তোর। জেলখানাতেই একা একা জন্মদিনটা পালন করলাম। তার ওপর আবার রক্তের চাপটাও হঠাৎ অনেক বেড়ে গেছে।'

'ডাক্তার দেখালে নিশ্চয়ই সেরে যাবে।'

'তাতে কিন্তু ঝামেলা একটুও কমবে না। আমার সবচেয়ে খারাপ লাগবে জেলখানায় মরতে।'

দুজনে নিঃশব্দে খানিকক্ষণ পান করলাম আর কান পেতে শুনতে লাগলাম বাইরে তুষার গলে গলে পড়ার টুপ-টাপ টুপ-টাপ শব্দ। এক সময়ে চাপা স্বরে বললাম, 'বিপদেব সময় সাধারণত আমরা সবাই যা করি, তুমিও তো তাই করতে পারো? এতবড় একটা দেশে কেউ তোমার কাগজপত্র অত খুঁটিয়ে দেখতে যাবে না। তাছাড়া এক একটা রাজ্যের আইনও এক এক রকম।'

'না, তা হয় না, রবার্ট। আমি চাই না আমার পেছনে পুলিস হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াক। যে ভদ্রলোক আমার জামিনের ব্যবস্থা করেছিলেন, তিনি হয়তো আমাকে সাহায্য করতে পারেন। আপাতত সুযোগের অপেক্ষায় থাকা ছাড়া কিছুই করার নেই।' ম্লান ঠোঁটে মেলিকভ এক টুকরো হাসি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করলো। 'এখন ওসব কথা থাক রবার্ট। ববং এসো আরও একটু পান করি আর মনে মনে আশা করি যেন মুক্ত অবস্থাতেই হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে খুব সহজে মরতে পারি।'

মার্চে ফ্রিয়েসল্যাণ্ডার তাঁর মেয়ের বাগদানের কথা ঘোষণা করেছিলেন, এপ্রিলে একজন আমেরিকানের সঙ্গে মেয়ের বিয়েও হয়ে গেছে। এই উপলক্ষ্যে ফ্রিয়েসল্যাণ্ডার পৃথক দুটি আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেছিলেন। একটি আমেরিকান নাগরিকদের জন্যে, অন্যটা জার্মান উদ্বাস্তুদের জন্যে। ওঁনার ধারণা বিদায় নেবার পূর্বে উদ্বাস্তুদের হয়তো এটাই শেষ সমাবেশ।

যুদ্ধের শেষে যারা আমেরিকা থেকে ফিরে যেতে চায় কিংবা যারা আমেরিকায় থাকতে চায়—নানান টানাপোড়েনে উভয় পক্ষেরই অবস্থা যখন সঙ্গীন, ফ্রিয়েসল্যাণ্ডার তখনও কিন্তু সেই একই রকম রয়েছেন—অসম্ভব হাসি-খুশি আর চঞ্চল। কানকে রাগাবার জন্যেই তিনি বললেন, 'কি এবার তাহলে উদ্বাস্তু জীবনে ইতি ঘটিয়ে যে যার প্রতিশ্রুতির দেশে ফিরে যেতে পারবে বলে উসখুস করছো তো?'

'প্রতিশ্রুতির দেশ বলে পৃথিবীতে কিছু আছে কিনা অনন্ত আমার জানা নেই, মিস্টার ফ্রিয়েসল্যাণ্ডার।'

'আছে, আছে !' ফ্রিয়েসল্যাণ্ডার মুচকি মুচকি হাসলেন।

বিদ্রূপ বাঁকানো স্বরে কান বললো, 'তাহলে আশাকর্ত্রি আপনি নিশ্চয় সেখানেই ফিরে যাবেন ?'

'পাগল হয়েছো।' ফ্রিয়েসল্যাণ্ডার হো হো করে হেসে উঠলেন। 'আমার প্রতিশ্রুতির দেশ এটাই !'

'তাহলে আপনার বিজয়-উৎসবই পালন করা উচিত ছিলো।'

'ইহুদিরা কখনও বিজয়-উৎসব করে না।'

'নিশ্চয়ই না, ওরা কেবল পালাতে জানে আর বিলাপ করতে পারে।'

'আঃ, তোমরা সারাক্ষণ কি কেবল ঝগড়াই করবে ?' মাঝখান থেকে শ্রীমতী ফ্রিয়েসল্যাণ্ডার এসে ওদের থামিয়ে দিলেন, তারপর কি যেন একটা বিশেষ প্রয়োজনে স্বামীকে ডেকে নিয়ে গেলেন।

আমি চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম। শুধু মুখগুলো যা একই, কিন্তু কোন্ অদৃশ্য ইঙ্গিতে সমস্ত পরিবেশটাই কেমন যেন বদলে গেছে। আর ফ্রিয়েসল্যাণ্ডারদের সুখী পরিবারটাকে দেখে মনে হলো ওরা যেন দেওয়াল বিহীন বেশ আরামদায়ক একটা কারাগারে বাস করছে।

'এতাদিন আমরা চেয়েছিলাম যুদ্ধ থেমে যাক, যুদ্ধ থেমে গেছে,' টাক মাথা বয়স্ক এক ভদ্রলোক বললেন। ওঁর মুখ চিনি, বেটির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দিন দেখেও ছিলাম, কিন্তু নামটা কিছুতে মনে করতে পারলাম। 'কিন্তু এখনও বিপদ কাটেনি।'

রাবিনোভিৎজ বললো, 'দেশটার এখন কি চেহারা হয়েছে তাই বা কে জানে।'

'তবু দেশটা দেশই।'

কে যেন কটাক্ষ করলো, 'হ্যাঁ, একটা শবাচ্ছাদন যেমন শবাচ্ছাদনই।'

'তা সত্ত্বেও আমি ভেবেছি ফিরে যাবো,' ম্লান স্বরে ফ্রাঙ্ক বললেন। 'কেননা এখানে আমার কিছুই করার নেই।'

এটাই মর্মকথা এবং এই ভাবনাটাই সন্ধ্যা-উৎসবকে আরও বিষণ্ণ করে তুলেছে। কেননা আর কয়েকদিনের মধ্যেই ইউরোপে ফিরে যাওয়া সম্ভব

হবে। কিন্তু যারা থাকতে চায়, সবকিছু হারানোর ভয়ে আর সন্দেহের দোলায় তারা দুলতে শুরু করেছে। যদিও আমেরিকার কোথাও কোনো পরিবর্তন হয়নি, তবু এখানে বাস করার সম্ভাবনা তাদের কাছে তেমন আর আকর্ষণীয় মনে হচ্ছে না। আর যারা ফিরে যেতে চায়, যারা জার্মানীকে এখনও নিজেদের দেশ মনে করে, তাদের মনে হচ্ছে নন্দনকানন নয়, ওটা একটা বিধ্বস্ত ধ্বংসস্তূপ, যেখানে নতুন করে জীবন শুরু করা খুব কঠিন। ফলে যারা ফিরে যেতে চায় কিংবা চায় না, সবাইকেই কেমন যেন হতোদ্যম মনে হচ্ছে।

'যুদ্ধ শেষ হলেও দেখবেন নাৎসিরা ঠিক টিঁকে আছে। সবার সঙ্গে মিশে গেলেও ওরা কোনোদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে না।' বিদ্রূপে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো অচেনা সেই তরুণটির কণ্ঠস্বর। 'হয়তো একদিন দেখবেন উচ্চপদস্থ নাৎসি সেনাধ্যক্ষদেরই সম্মান-চিহ্নে ভূষিত করা হচ্ছে।'

'কথাটা অবশ্য মিথ্যে বলোনি।' রাবিনোভিৎজ ওকে সমর্থন করলো। 'যারা যাবে কিংবা যাবে না, সবারই সুখের স্বপ্ন দেখবেন ভেঙে খান খান হয়ে গেছে।'

লাখ্‌মান হঠাৎ আমায় প্রশ্ন করলো, 'তুমি কি করবে কিছু ভেবেছো?'

আমি হাসলাম। 'এখনও কিছু ভাবিনি কুর্ট, ভাবার অবশ্য অনেক সময় আছে।'

'তা আছে,' বয়স্ক সেই ভদ্রলোক সায় দিলেন। 'তবে হঠাৎ কিছু না করলে কোনোদিন করাও হবে না।'

কান হঠাৎ বললো, 'আজ আমি উঠি, রবার্ট।'

'এখুনি যাবেন?'

'হ্যাঁ। এই ধরনের উত্তেজনা, বিদ্রূপ আর অনিশ্চয়তার জগাখিচুড়ি আমার ভালো লাগে না। এইসব লোকদের দেখলে আমার মনে হয় ওরা যেন সব অন্ধ পাখি, এতদিন খাঁচার যে শিকগুলোকে ভাবতো, লোহার হঠাৎ একদিন দেখলো ওগুলো ক্ষিরের তৈরি। ওরা কাঁদবে না গান

গাইবে কিছুই বুঝতে পারলো না। আর যারা গান গাইতে শুরু করলো, কয়েকদিনের মধ্যেই দেখলো সব গান শেষ হয়ে গেছে, নিঃশেষ হয়ে গেছে স্পর্শাতুর গৃহকাতরতা আর কাল্পনিক যত ঘৃণা।' কান ম্লান ঠোঁটে হাসলো। 'সত্যিই তো, যা বিধ্বংস হয়ে গেছে তার প্রতি ঘৃণা পোষণ করাও সম্ভব নয়! যাগগে, আমি চলি, রবার্ট! শুভরাত্রি।'

ওকে কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত আর অসম্ভব ক্লান্ত মনে হচ্ছে। আমি বললাম, 'তোমাকে কি বাড়িতে পৌঁছে দেবো?'

'না, রবার্ট; তুমি থাকো, আমি যাই।'

'তাহলে শুভরাত্রি, কান! কাল মধ্যাহ্ন-ভোজের সময় তোমার সঙ্গে দেখা করবো।'

'আচ্ছা।'

ওর সঙ্গে যাবার ইচ্ছে থাকলেও, হঠাৎ এভাবে চলে যাওয়াটা আদৌ শোভন হতো না। তাছাড়া সবার সঙ্গে আর কোনোদিন হয়তো দেখাও হবে না। তাই আমি চুপচাপ বসে রইলাম, আর মহিলাদের সম্পর্কে লাখ্‌মানের অদ্ভুত অদ্ভুত সব অভিজ্ঞতার গল্প শুনছিলাম। সম্প্রতি একজন বিধবার সঙ্গে ওর অবৈধ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, এবং ওর ধারণা যৌন-আচরণে ও আর পাঁচজন মানুষের মতোই স্বাভাবিক।

আমি ওকে জিগেস করলাম দেশে ফেরা সম্পর্কে ও কিছু ভেবেছে কিনা।

লাখ্‌মান বললো, 'হয়তো কয়েক বছরের মধ্যে যাবো। বেড়াতে তাড়াহুড়ো করার কিছু নেই!'

ঈর্ষার চোখে আমি ওর দিকে তাকালাম। জিগেস করলাম, 'দেশ ছেড়ে আসার আগে কি করতে?'

'আমি তখন ছাত্র ছিলাম। হিটলার ক্ষমতায় আসার আগে আমাদের অবস্থা বেশ ভালোই ছিলো। ফলে আমাকে কোনোদিনই কিছু করতে হয়নি।'

আমি আর জিগেস করতে পারলাম না ওর বাবা মার ভাগ্যে কি

ঘটেছে, তবু ওর মানসিক প্রস্তুতিতে মনে মনে খুশি না হয়ে পারলাম না। মনে আছে কান একবার বলেছিলো ইহুদিরা প্রতিশোধ নিতে জানে না, প্রতিশোধ নেওয়ার কথা ভাবতেই ওরা স্নানবিক অবসাদে একেবারে ম্লান হয়ে যায়। ফলে কিছুদিনের মধ্যেই দেখা যায়—নিজেদের সম্মান বজায় রাখার জন্যে ওরা শত্রুর সঙ্গেই গলাগলি করছে। ওর ধারণা কতটা সত্যি আমি জানি না, কেননা ইহুদিদের সম্পূর্ণ মানসিকতা আমার পক্ষে জানা সম্ভব নয়। এইসব উদ্বাস্তু ইহুদিদের মাঝে আমার অবস্থা অনেকটা গুহা-বাসী কোনো মানুষের মতো। অথচ এর মধ্যে থেকে বাইরে বেরিয়ে আসার জন্যে আমি প্রাণপণ সংগ্রাম করি, কখনও কখনও মনে হয় বোধহয় কৃতকার্য হতে পেরেছি, কিন্তু পরক্ষণেই দেখি ফিরে এসেছে সেই অতীত দুঃস্বপ্ন, আমার নিশ্চল ভাগ্যের চাকাটা আবার ঘুরতে শুরু করেছে এবং তখনই বুঝতে পারি এর থেকে মুক্তি পাওয়া এত সহজ নয়।

'তোমাদের আজ কি হয়েছে বলো তো?' শ্রীমতী ফ্রিয়েসল্যাণ্ডার ধমক দিলেন। উনি কখন আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন খেয়াল করিনি। 'কোথায় আনন্দ করবে তা নয়, সবাই মনমরা হয়ে রয়েছো। এত মন খারাপ করলে চলে? আর কিছু না হোক, উদ্বাস্তু হিসেবে এটা তো আমাদের শেষ সমাবেশ।'

আমি অবিশ্বাসের চোখে তাকালাম ওঁর মুখের দিকে। অত্যন্ত সরল, কোমল হৃদয় এই মহিলাটি এতদিন কোথায় ছিলেন? এর আগে ওঁকে তো কখনও দেখিনি! গোলগাল চেহারা, গোলাপী চিবুক, টলটলে ভরাট মুখখানার দিকে তাকিয়ে মনে হলো—সত্যিই তো, এভাবে নিঃশব্দে বিলাপ করার কোনো মানেই হয় না।

আমি বললাম, 'আপনি ঠিকই বলেছেন, মিসেস ফ্রিয়েসল্যাণ্ডার; বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ার আগে আমাদের প্রত্যেকেরই প্রত্যেকের কাছে উচ্ছল হওয়া উচিত। যুদ্ধ শেষ হবার পর আমরা সবাই যেন সৈনিক—আজ অন্তরঙ্গ সাথী, কলি বন্ধু, তারপরেই অপরিচিত। সুতরাং বিদায় নেবার আগে আমাদের পরস্পরের কাছে যে একটা মূল্য ছিলো,

সেটা অন্তত উপলব্ধি করতে দেওয়া উচিত।'

শ্রীমতী ফ্রিয়েসল্যাণ্ডারের চোখদুটো খুশিতে ঝিকিয়ে উঠলো। 'হ্যাঁ, আমি ঠিক এই কথাটাই বলতে চাইছিলাম।'

কেন জানি না, সেই মুহূর্তে নিজেকে আমার এমন হালকা আর প্রসন্ন মনে হলো যে আমি প্রায় ভেবেই নিলাম—আমার জীবনে কখনও অশুভ কিছু ঘটতে পারে না।

পরের দিন দুপুরে কানকে তার ঘরেই খুঁজে পেলাম। পিস্তলের গুলিতে আত্মহত্যা করেছে। জানলার খোলা পরদা দিয়ে দুপুরের আশ্চর্য উজ্জ্বল একফালি রোদ লুটোপুটি খাচ্ছে সারা ঘরে আর তারই মাঝমধ্যিখানে কান চেয়ার থেকে হুমড়ি খেয়ে পড়ে রয়েছে মেঝেতে। প্রথমটায় আমি নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারিনি, টনক নড়লো মেঝেতে চাপ চাপ রক্তের দাগ দেখে। সারা দেহ আর মুখটা অক্ষত রয়েছে, কেবল মাথার খুলিটা একেবারে গুঁড়িয়ে গেছে।

কি করবো কিছু বুঝতে পারলাম না। শুধু শুনেছি এই রকম পরিস্থিতিতে পুলিসে ফোন করতে হয় আর কোনো কিছু নাড়াচাড়া করতে নেই। বেশ কিছুক্ষণ আমি নিষ্প্রাণ দেহটার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইলাম, যেটাকে আমার মনে হলো আদৌ কানের নয় এবং যার প্রতি আমার কিছুই করণীয় নেই। কিন্তু পরক্ষণেই বিহ্বল একটা আতঙ্ক আর গভীর বিষাদে সারা মন আচ্ছন্ন হয়ে গেলো। বুকের অতল থেকে কে যেন আর্তনাদ করে উঠলো—ওর মৃত্যুর জন্যে তুমি, তুমিই দায়ী! এই ভাবনাটা আমাকে কিছুতেই স্বস্তি দিলো না, বরং তীব্র থেকে আরও তীব্রতর হয়ে উঠলো। শেষের কটা দিন ও অসম্ভব নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিলো, যেটা আমার বোঝা উচিত ছিলো। নাতাশাকে ফিরে পাবার জন্যে এমনই উন্মুখ হয়ে উঠেছিলাম যে ওর দিকে ফিরে তাকাবার কোনো অবকাশই হয়ে ওঠেনি।

এতক্ষণ রেডিওটা চলছিলো, আমি ওটা বন্ধ করে দিলাম। পাবো না

জেনেও খুঁজলাম, যদি কোনো স্বীকারুক্তি জাতীয় কিছু লিখে যায়। কিন্তু পেলাম না। নিঃসঙ্গ ও বেঁচেছিলো, নিঃসঙ্গতার মুহূর্তে, অসভব একটা নিঃসঙ্গতার মুহূর্তেই ও আত্মহত্যা করেছে। ইহুদিরা সাধারণত এভাবে মরে না, এ মৃত্যু কানের আদৌ উপযুক্ত নয়। তবু একটা মানুষের পক্ষে নিঃসঙ্গতা কতটা দুর্বিসহ হলে তবেই সে আত্মহত্যা করতে পারে— কথাটা ভাবতেই আমি শিউরে উঠলাম এবং মনে মনে নিজেকে কিছুতেই অপরাধী না ভেবে পারলাম না। কানের মৃত্যুর জন্যে আমি দায়ী, হ্যাঁ, আমিই!

শেষ পর্যন্ত কিছু একটা করতেই হবে ভেবে আমি মনে মনে নিজেকে প্রস্তুত করে নিলাম। প্রথমে ফোনে রাভিকের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। ওকে বললাম, 'কান পিস্তলের গুলিতে আত্মহত্যা করছে। এখন কি করা উচিত ঠিক বুঝতে পারছি না। তুমি কি একবার আসতে পারো?'

সেই মুহূর্তে রাভিক কোনো জবাব দিলো না। সম্ভবত বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা সামলে নিতে একটু সময় লাগলো।

'তুমি কি সুনিশ্চিত যে ও মারা গেছে?'

'হ্যাঁ, মাথার খুলিটা একেবারে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে।'

'তুমি কিছু কোরো না বা ছুঁয়ো না। ওখানে থাকো, আমি এখুনি যাচ্ছি।'

ফোনটা রেখে দিয়ে আমি জানলার সামনে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলাম। কিন্তু কয়েক মিনিটের জন্যেও সুস্থির হয়ে বসে থাকতে পারলাম না। কানের শেষ মুহূর্তের মানাসকতা খুঁজে পাবার জন্যে সারা ঘর পায়চারি করে বেড়ালাম। কিন্তু তেমন কিছুই পেলাম না, শুধু সামনের টেবিলে একটা বই আধ-খোলা অবস্থায় ওলটানো রয়েছে। ওপর থেকেই দেখে বুঝতে পারলাম, ওটা জার্মান কবিতার কোনো সংকলন বা ফ্রানৎস্ ভেরফেলের কোনো উপন্যাস নয়, নিতান্তই সাধারণ একটা আমেরিকান উপন্যাস।

মাঝে মাঝে যানবাহনের শব্দে ভেঙে যাচ্ছে নিটোল নৈঃশব্দ্য। কানের

মতো বিপ্লবী একজন নায়কের মৃত্যু এই মুহূর্তে ফুটপাতে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা কোনো মৃত পাখির চাইতে আদৌ ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছে না। রাভিক নিঃশব্দেই প্রবেশ করেছিলো, কিন্তু হঠাৎ ওকে দেখে আমি অসম্ভব চমকে উঠলাম। রাভিক সোজা এগিয়ে এসে কানকে দেখলো। ঝোঁকেনি বা ছোঁয়ওনি। আমাকে বললো, 'পুলিসে খবর দিতে হবে। ওরা যখন আসবে, তুমি কি এখানে থাকবে?'

'তোমার কি মনে হয় আমার থাকার দরকার নেই?'

'বলতে পারি আমিই ওকে প্রথম দেখেছি। ওরা নানান প্রশ্ন করবে। ইচ্ছে করলে তুমি ওদের এড়িয়ে যেতে পারো।'

'এখন আমার আর কিছুই এসে যায় না।'

'তোমার কাগজপত্র সব ঠিক আছে?'

'রাভিক,' শব্দটা আমার নিজেরই কাছে আর্তনাদের মতো মনে হলো, 'ওসব আমি এখন আর কিছুই ভাবতে পারছি না।'

রাভিক আমার কাঁধে আলতো করে হাত রাখলো। 'ভাবতে হবে, রস। নইলে কানের কোনো উপকারই আমরা করতে পারবো না।'

'আমি এখানে থাকবো। পুলিস যদি ভাবে আমি ওকে খুন করেছি, তাতেও আমার কিছু এসে যায় না।'

রাভিক ম্লান ঠোঁটে হাসলো। 'তুমি তাই ভাবছো বুঝি? অবশ্য পুলিস ভাবতে পারে। কিন্তু আমি জানি—যুদ্ধ শেষ হলে কান কি করবে ও কিছুই ভেবে উঠতে পারেনি।'

'তুমি ভেবেছো?'

'ডাক্তারদের পক্ষে ব্যাপারটা খুব সহজ। আমরা লোকজনদের সারিয়ে তুলি যাতে আগামী যুদ্ধে ওরা আবার মরতে পারে।' গ্রাহযন্ত্রটা তুলে নিয়ে ও পুলিসে ফোন করলো। নাম আর ঠিকানাটা ওকে বেশ কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করতে হলো। 'হ্যাঁ, মারা গেছে। হ্যাঁ। আচ্ছা··· আচ্ছা। কখন? ঠিক আছে।' গ্রাহযন্ত্রটা ও নামিয়ে রাখলো। 'ওরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আসার চেষ্টা করছে। তবে শহরে এটাই একমাত্র আত্ম-

হত্যার ঘটনা নয়।'

আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম। আবার আমাদের দুজনকে ঘিরে ঘনিয়ে উঠলো নৈঃশব্দ্য। মাঝে হঠাৎ-বেজে-ওঠা ঘড়ির শব্দে চমকে উঠলাম। এতক্ষণ ওটাকে খেয়ালই করিনি। কানের ঘড়ি, যেটার সঙ্গে এখন ওর আর কোনো সম্পর্ক নেই।

'তুমি কি আমেরিকাতেই থাকছো?' আমি রাভিককে জিগেস করলাম।

রাভিক মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মতি জানালো, তারপর কানের দিকে ইঙ্গিত করে বললো, ওর ধারণার সঙ্গে আমিও একমত। ওরা হয়তো আগেরই মতো আমাদের ঘৃণা করবে। তুমি কি সেই বানানো গল্পে বিশ্বাস করে যে ইচ্ছের বিরুদ্ধেই বেচারি জার্মানদের এই সব জঘন্য কাজ করতে বাধ্য করা হয়েছে? কাগজ খুললেই দেখতে পাবে, যুদ্ধে হেরে যাচ্ছে জেনেও প্রতিটা বাড়ি প্রতিটা ইঞ্চি জায়গা বুকে বুক দিয়ে আগলে রাখার জন্যে ওরা চেষ্টা করছে। বিপদের সময় সিংহী যেমন তার বাচ্ছাদের আগলে রাখে, ওরাও ঠিক তেমনি ভাবে নাৎসিদের আগলে রেখেছে, এমন কি নাৎসিদের জন্যে ওরা মরতেও প্রস্তুত আছে।' একটু চুপ করে থেকে রাভিক কি যেন ভাবলো। ক্রোধের পরিবর্তে বিষণ্ণতার ম্লান একটা ছায়া পড়েছে ওর সারা মুখে। বেদনার্ত স্বরেই ও বললো, 'কান কিন্তু ভালো করেই জানতো ও কি করছে। এটা হতাশ বা মরিয়া হয়ে ওঠার কোনো ব্যাপার নয়। ও যেন সবকিছু আগে থেকেই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলো। আমার সব থেকে কোথায় খারাপ লাগছে জানো রস, ১৯৪০ সালে এই কানই আমার জীবন বাঁচিয়েছিলো। আমি তখন ফ্রান্সে একটা অন্তরণ-শিবিরে বন্দী রয়েছি। জার্মানরা ফ্রান্সে ঢুকে পড়েছে। কান কেমন করে যেন জানতে পারলো আমি ওই অন্তরণ-শিবিরটাতে বন্দী রয়েছি। উর্দি পরা দুজন এস. এস.-কে সঙ্গে নিয়ে ও একদিন আমাদের শিবিরে এসে হাজির হলো। শিবিরনিয়ন্ত্রককে বললো আমাকে গ্রেফতার করার নির্দেশ আছে।'

'তাতে কাজ হলো ?'

'হ্যাঁ, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। প্রথমে নিয়ন্ত্রক অস্বীকার করেছিলো। কিন্তু কান প্রচণ্ড বিক্রমে তর্জন গর্জন করে যখন জানালো যে আমাকে না পেলে তাকেই গ্রেফতার করবে, তখন নিয়ন্ত্রক ব্যাপারটার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারলো। বেচারি তখন রীতিমতো ঘাবড়ে গিয়ে জানালো যে আমি নেই, আমাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কান এস. এস. দুজনকে শিবির তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখার নির্দেশ দিলো। সে এক বিদিকিচ্ছিরি ব্যাপার। ওরা যখন শিবির তোলপাড় করে খুঁজছে, আমি তখন কাঠের পাটাতনের নিচে লুকিয়ে রয়েছি। আমি ভেবেছি গেস্টাপো বুঝি আমাকে ধরতে এসেছে। শিবিরের বাইরে নিয়ে আসার একটু পর কান আমার দিকে ব্রাণ্ডির বোতলটা এগিয়ে দিলো। হিটলারী গোঁফ আর কটা চুলে আমি ওকে তখনও চিনতে পারিনি। প্রয়োজনে মানুষ যে কতটা বেপরোয়া হয়ে উঠতে পারে কিংবা ভয়ঙ্কর বিপদেও হাসিখুশি থাকতে পারে, ওকে না দেখলে আমি কোনোদিন বিশ্বাস করতে পারতাম না। আসলে এখানকার শান্ত জীবনই ওকে দমিয়ে দিয়েছিলো, যেটা দিন দিন আরও খারাপের দিকে যাচ্ছিলো এবং শেষ পর্যন্ত এর হাত থেকে ও নিজেকে বাঁচাতে পারলো না। এসব কেন বলছি, আশা করি তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছো ?'

'পারছি, রাভিক।'

'সেই দিক থেকে, তোমার চাইতে বরং আমার নিজেকে অপরাধী ভাবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। কিন্তু আমি তা ভাববো না। কেননা বেঁচে থাকতে গেলে আমাদের এসব ভাবলে চলবে না।'

সিঁড়িতে ভারি পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। রাভিক বললো, 'এই একটা শব্দ যা কোনোদিনও ভোলা যাবে না।'

আমি জিগেস করলাম, 'ওরা এখন একে কোথায় নিয়ে যাবে ?'

'লাসকাটা ঘরে।'

দরজার কপাট দুটো যেভাবে দড়াম্ করে খুলে গেলো, আগে থেকে

প্রস্তুত না থাকলে হয়তো চমকে উঠতাম। এক ধরনের নিষ্ঠুর বর্বরতায় ছোট্ট ঘরখানা ভরে উঠলো। উদ্ভট উদ্ভট সব প্রশ্নের জবাব দিতে হলো, এবং পুলিস সার্জেন্টকে ছোট একটা খাতা আর একটুকরো পেনসিলের সাহায্যে সেগুলোকে টুকে রাখতে দেখা গেলো। আমি জীবনে কখনও কোনো পুলিসের হাতে গোটা পেনসিল দেখিনি এবং আমেরিকাতেও তার কোনো ব্যতিক্রম দেখলাম না। তারপর ওরা স্ট্রেচারে করে মৃতদেহটা বয়ে নিয়ে গেলো। আমাদেরও ওদের সঙ্গে থানায় যেতে হলো, কিন্তু নাম ঠিকানা লিখে রাখার পর আমাদের ছেড়ে দেওয়া হলো। আমরা কানকে ওখানেই ফেলে রেখে চলে এলাম।

নিজে থেকে সিদ্ধান্ত নেবার তেমন কোনো প্রয়োজনই হয়নি, দ্বিধা জড়িত অস্থিরতার মাসগুলোতেও ওটা সুপ্ত ছিলো আমার মনের অতলে। কখনও অতীত দুঃস্বপ্নের আতঙ্কে শিউরে উঠেছি, কখনও বা ভবিষ্যৎ জীবনের রঙিন কল্পনায় পুলকিত হয়েছি। স্বপ্ন আর বাস্তবের নানান সিঁড়ি ভেঙে সচেতন ভাবেই এমন একটা মুহূর্ত এলো, যখন মনে হলো এবার আমি যেতে পারি। আমি যাবো। আমাকে যেতে হবে। নইলে আমি কিছুতেই স্বস্তি পাবো না। কেননা আমার বুকের মধ্যে তখন আর প্রতিশোধ নেবার কোনো চিহ্নও অবশিষ্ট নেই।

যুদ্ধ বিরতি ঘোষণার কয়েকদিন পর আমি ফ্রিয়েসল্যাণ্ডারের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। আমাকে দেখে উনি যেন খুশিতে উপচে উঠলেন। 'যাক, এতদিনে একটা কদর্য অধ্যায় শেষ হলো। এবার আমরা আবার নতুন করে গড়ে তোলার কাজ শুরু করে দিতে পারবো।'

'গড়ে তোলার কাজ?'

'নিশ্চয়ই : জার্মানীতে এখন কোটি কোটি ডলার বিনিয়োগ করা হবে। এবং বিনিয়োগ করবে আমেরিকানরাই।'

'যে আমেরিকা জার্মানীকে বিধ্বস্ত করছে, সেই আমেরিকাই আবার জার্মানীকে গড়ে তুলবে—ব্যাপারটা কি আপনার কাছে অদ্ভুত মনে হচ্ছে

না, মিস্টার ফ্রিয়েসল্যাণ্ডার ?'

ফ্রিয়েসল্যাণ্ডার হো হো করে হেসে উঠলেন। 'অদ্ভুত মনে হলেও এটাই কিন্তু বাস্তব। আমরা ধ্বংস করেছি একটা ধারাকে, এবার আমরা গড়ে তুলবো দেশটাকে।'

মনে মনে ফ্রিয়েসল্যাণ্ডারের গভীর দূরদৃষ্টির প্রশংসা না করে পারলাম না। তবু প্রশ্ন করলাম, 'আপনার কি মনে হয় ধারাটাকে সত্যিই ধ্বংস করা গেছে ?'

'নিশ্চয়ই, এমন বিপুল পরাজয়ের পর এ সম্পর্কে আর কোনো দ্বিধাই থাকতে পারে না।' প্রতিভাদীপ্ত কোনো তরুণের মতো অসীম উৎসাহ নিয়ে ফ্রিয়েসল্যাণ্ডার বলে চললেন, 'হিটলার মারা গেছে। মিত্রশক্তি বাকি নাৎসিদের হয় ফাঁসিকাঠে ঝোলাবে, নয়তো বন্দী করবে। সূচনা হবে একটা নতুন যুগের। তার জন্যে আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে।' উনি আমার দিকে চোখ টিপলেন। 'তুমি কি ঠিক সেই জন্যেই আমার সঙ্গে দেখা করতে আসোনি, রস ?'

'হ্যাঁ, অনেকটা সেজন্যেও বলতে পারেন।'

'আমি কিন্তু আমার প্রতিশ্রুতির কথা ভুলিনি।'

প্রকৃতপক্ষে আমি একটা ক্ষীণ আশা নিয়েই ওঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। উনি অবশ্য ওঁনার প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে গেলে আমার কিছুই করার ছিলো না। তখন হয়তো রাহা খরচের জন্যে আমাকে আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হতো। তাতে এই দেশটাকে আরও কিছুদিন থাকার সুযোগ পেতাম। দেশে ফিরে যাবার মানসিক প্রস্তুতির পর থেকেই এই দেশটা আমার সত্যিই কেমন যেন মায়াকাননের মতো মনে হচ্ছিলো।

'কাউকে প্রতিশ্রুতি দিলে আমি কখনও তা ভাঙি না, রস।' সম্ভবত আমাকে চুপ করে থাকতে দেখেই উনি পুনরাবৃত্তি করলেন। 'তুমি কিভাবে টাকাটা নেবে—নগদে, না চেকে ?'

'নগদে।'

'আমিও তাই ভেবেছি। কিন্তু এই মুহূর্তে আমার কাছে অত টাকা নেই। তুমি কাল একবার এসে নিয়ে যেও। আর ফেরোৎ দেওয়ার জন্যে তোমাকে একটুও তাড়াহুড়ো করতে হবে না। আশা করি টাকাটা তুমি নিশ্চয়ই কোনো ব্যবসায় বিনিয়োগ করবে?'

চকিতে ভেবে নিয়ে বললাম, 'হ্যাঁ।'

'বাঃ, খুব ভালো কথা! এর জন্যে তুমি আমাকে ছ' শতাংশ সুদ দিও। আশা করি তুমি এর থেকে একশো ভাগই লাভ করতে পারবে।'

'আমি আপ্রাণ চেষ্টা করবো।'

'তাহলে তুমি কাল একবার এসো।'

না স্বস্তি, না বিতৃষ্ণা—এই দুয়ের মাঝামাঝি অদ্ভুত একটা অনুভূতি নিয়ে আমি উঠে দাঁড়ালাম। 'অসংখ্য ধন্যবাদ, মিস্টার ফ্রিয়েসল্যাণ্ডার।'

'তুমি কি শিগগিরই ফিরে যাচ্ছো?'

'হ্যাঁ, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জাহাজ ধরতে পারলেই চলে যাবো।'

'খুব বেশি সময় লাগবে না। জাপানীদের সঙ্গে যুদ্ধও প্রায় শেষ। শুধু পরাজিত শত্রুবাহিনীকে খুঁজে বার করার কাজটাই যা বাকি রয়েছে। আমার মনে হয় তার আগেই ইউরোপে যাওয়া-আসার ব্যবস্থা চালু হয়ে যাবে। তোমার এখানকার কাগজপত্র সব ঠিক আছে?'

'হ্যাঁ, আরও তিনমাস এখানে বাস করার অনুমতি আছে।'

'তাহলে তোমার কোনো অসুবিধেই হবে না।' উনি এমন ভাবে কথাটা বললেন যেন যুদ্ধ বলে কোনো জিনিস পৃথিবীতে ছিলো না এবং প্রতিদিনই আমেরিকা থেকে জাহাজ ছাড়ছে। 'যাবার আগে একবার আমার সঙ্গে দেখা করে যেও।'

'নিশ্চয়ই। আজ আমি চলি মিস্টার ফ্রিয়েসল্যাণ্ডার। অসংখ্য ধন্যবাদ।'

ফ্রিয়েসল্যাণ্ডার যেমন ভেবেছিলেন ব্যাপারটা তত সহজ ছিলো না। লাল ফিতের বাঁধন কেটে, যাওয়ার সমস্ত ব্যবস্থা পাকা করতে করতে প্রায়

মাস ছুয়েক কেটে গেলো। তা সত্ত্বেও গত কয়েকটা বছরের তুলনায় আমার মন অনেক বেশি সুস্থির। ফিরে যাবো, ফিরে যেতে হবে— মানসিক এই প্রস্তুতি নেবার পর থেকে ফিরে গিয়ে কি করবো, এই ধরনের ভাবনা প্রায় সম্পূর্ণ ই ছেড়ে দিয়েছিলাম—ভঙ্গিটা এই রকম. আগে গিয়ে পৌছোই, তারপর যা হবে দেখা যাবে। তা বলে অতীত তুঃস্বপ্নগুলো যে একেবারে ছেড়ে চলে গেছে তা কিন্তু নয়, বরং আগের চাইতে আরও ঘন ঘনই হানা নিয়েছে আমার ঘুমের মধ্যে! কখনও আমি লুকিয়ে রয়েছি কোনো গভীর অরণ্যে, কখনও বা ক্রসেলস যাত্নঘরে যে ঢাকা-বারান্দার মধ্যে দিয়ে গুড়ি মেরে হেঁটে চলেছি সেটা সংকার্ণ ক্রমশ থেকে আরও সংকীর্ণতর হয়ে আসছে, আর বিহ্বল আতঙ্কে আমি চিৎকার করে জেগে উঠছি। যিনি আমাকে লুকিয়ে রেখেছিলেন, পরে খুঁজে পেয়ে গেস্টাপো যাঁকে ধরে নিয়ে গিয়েছিলো, এতদিন যে মুখটা ছিলো আমার কাছে অস্পষ্ট—এখন সেই ক্লান্ত মুখ, উদ্বিগ্ন চোখত্নটো যেন আরও স্পষ্ট দেখতে পাই। তবে এখন আর জেগে ওঠার পর বিহ্বল আতঙ্কে মনে হয় না আত্মহত্যা করি। এখনও যে আমার বুকের মধ্যে তিক্ততা বা প্রতিশোধ নেবার কোনো স্পৃহা নেই, তা নয়। তবে এখন আর নিজেকে ততটা অভিশপ্ত বা বঞ্চিত মনে হয় না। একদিন যারা নির্যাতিত হয়েছে, নিহত হয়েছে, নির্মমভাবে, গ্যাস-চেম্বারে যাদেরকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে, তারা আর কোনোদিনই জীবনে ফিরে আসবে না। সেদিক থেকে দেখতে গেলে আমি এখনও বেঁচে আছি এবং কোনো না কোনো দিক থেকে জীবনকে এখনও সমৃদ্ধশালা করে তুলতে পারি। কেন জানি না আমার এমনই একটা বদ্ধমূল ধারণা জন্মেছে যে প্রতিটা অপরাধের চরম শাস্তি একদিন না একদিন পেতেই হবে, নইলে নৈতিকতার ভিত্তিভূমি একেবারে ধুলোর সঙ্গে মিশে যাবে, মাথা তুলে দাঁড়াবে বিশৃঙ্খলা।

আমার শেষের দিনকটা আমেরিকার সমস্ত ছবিটাকেই কেমন যেন অদ্ভুত ভাবে বদলে দিয়েছিলো, যেন কুয়াশার অবগুণ্ঠন সরিয়ে প্রায়ই উঁকি

দিতো মন-কেড়ে-নেওয়া স্নিগ্ধ একটা সোনালী আভা। বেলাশেষের আরক্তিম আলো আমাকে স্মরণ করিয়ে দিতো আসন্ন বিদায়। প্রতিটা গোধূলিবেলাই মনে হতো এই শেষ, একে বুঝি আমি আর কোনোদিনও দেখতে পাবো না।

মনে মনে ঠিক করেছিলাম শেষ মুহূর্ত না আসা পর্যন্ত নাতাশাকে কিছু বলবো না। যদিও জানি ও মনে মনে কিছুটা আঁচ করতে পেরেছে, তবু আমি নিজে থেকে ওকে কিছু বলিনি। কেননা ওকে ছাড়া বিদায় নেবার আগের মুহূর্তগুলো যে নিঃসীম তিক্ততা আর নিঃসঙ্গতায় ভরে উঠতো, আমার একার পক্ষে তা বহন করা সত্যিই সম্ভব হতো না।

আমার এইটুকুই সান্ত্বনা যে নাতাশা নিজে থেকে কিছু জিগেস করে নি। ফলে আমার আলোকোজ্জ্বল দিনগুলো সযত্নে লালিত মৌমাছিদের পরিপূর্ণ মধুচক্রের মতোই ভালোবাসায় আপ্লুত হয়ে উঠেছিলো। দেখতে দেখতে বসন্ত পা দিলো গ্রীষ্মে, আর তখনই যুদ্ধোত্তর ইউরোপের প্রথম খবর এসে পৌঁছলো আমার কাছে। যেন দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে অবরুদ্ধ করে রাখা কফিনের ঢাকনাটাকে এই প্রথম খোলা হলো। আগে পারত-পক্ষে আমি খবরের কাগজের ধারে কাছেও ঘেঁষতাম না, এখন যুদ্ধোত্তর প্রতিটা খবর গোগ্রাসে গিলি। এমনভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ি যেন এরই সঙ্গে আমার ফিরে যাওয়ার একটা নিবিড় সম্পর্ক জড়িয়ে রয়েছে।

'তুমি কবে ফিরে যাচ্ছো?' হঠাৎই নাতাশা আমাকে জিগেস করলো।

ক্ষণিকের জন্যে আমি চুপ করে রইলাম, তারপর বললাম:

'জুলাইয়ের প্রথম দিকে। তুমি কেমন করে জানলে?'

'যেমন করেই হোক, অন্তত তোমার কাছ থেকে নয়। তুমি আমাকে বলোনি কেনো?'

'আমি কেবল গতকালই ঠিক করেছি।'

'মিথ্যে কথা।'

'হ্যাঁ, সত্যিই মিথ্যে কথা।' মুহূর্তের জন্যে ইতস্তত করলাম। 'আমি

'তোমাকে ঠিক বলতে চাইনি, নাতাশা।'

'কেন?'

'তোমাকে বলতে আমার সত্যিই খুব খারাপ লাগতো।'

'কিন্তু কেন? কিছু দিনের জন্যে আমরা পরস্পরে এক সঙ্গে ছিলাম। আমরা কেউ কাউকে কখনও ধাপ্পা দিইনি, বরং আমরা পরস্পরকে ব্যবহার করেছি। এখন আমাদের বিচ্ছিন্ন হবার সময় হয়ে এসেছে, এর মধ্যে খারাপটা কোথায়?'

'আমরা কি সত্যিই পরস্পরকে ব্যবহার করেছি, নাতাশা?'

'নিশ্চয়ই, আমরা উভয়েই উভয়কে ব্যবহার করেছি। এর জন্যে কারুরই মিথ্যে ছলনার আশ্রয় নেবার কোনো প্রয়োজন নেই। অন্তত শেষের এই কটা দিন তুমি ইচ্ছে করলে আমার কাছে সত্যি বলতে পারো।'

'আমি আপ্রাণ চেষ্টা করবো, নাতাশা।'

নাতাশা চকিতে আপাঙ্গে তাকালো আমার মুখের দিকে।

'তাহলে তুমি স্বীকার করছো?

'তোমার যা পছন্দ তার কোনো কিছুই আমি অস্বীকার করতে চাই না, নাতাশা। কেমন করে করবো বলো? আমি চলে যাচ্ছি এটাই বড় কথা। কিন্তু কেন যাচ্ছি, সে কথা তোমাকে সত্যিই ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারবো না। তবু আমার এই চলে যাওয়াটা মনে হচ্ছে যেন যুদ্ধে যাওয়া। আমি জানি তুমি মনে মনে হাসছো। ভাবছো আমি মিথ্যেবাদী, স্বার্থপর আর প্রতারক। তুমি যদি সত্যিই তাই ভাবো, আমি একটুও বাধা দেবো না। কেননা এখন আর কিছুই এসে যায় না, যেমন এখন যদি বলি আমি তোমায় ভালোবাসি।'

ম্লান, অথচ অদ্ভুত রহস্যময় ভঙ্গিতে নাতাশা হাসলো। 'থামলে কেন, বলো।'

'আমি জানি এখন যাই বলি না কেন, আমার কোনো কথাই তুমি বিশ্বাস করবে না।

'বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন এটা নয় রবার্ট,' এমন বেদনার্ত স্বরে নাতাশা বললো, ওর নিঃশব্দ যন্ত্রণার প্রতিটা রেখাই আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠলো। 'আমরা যতটা ভাবতাম আমাদের পরস্পরের কাছে সত্যিকারের অর্থ ছিলো তার চাইতে অনেক কম। আমরা উভয়েই উভয়ের কাছে মিথ্যে বলতাম।'

'হ্যাঁ।' স্বীকার না করে আমার অন্য কোনো উপায় ছিলো না।

'যখন আমরা একসঙ্গে ছিলাম, তখনও আমি অন্যজনের সঙ্গে শুতাম। তুমিই একমাত্র পুরুষ নও, রবার্ট।'

'আমি জানি, নাতাশা।'

দীর্ঘ পল্লব ঘেরা নাতাশার আয়ত চোখদুটো আরও বিস্ফারিত হয়ে উঠলো। 'তুমি জানতে?'

'না মানে···আমি কখনও বিশ্বাস করিনি।'

'তোমার বিশ্বাস করা উচিত ছিলো, রবার্ট। যেহেতু কথাটা সত্যি।

আমি জানি ওর আহত অভিমান এই ধরনের মিথ্যে একটা ছলনারই আশ্রয় নেবার চেষ্টা করছে। এমন কি সেই মুহূর্তেও আমি ওকে বিশ্বাস করতে পারলাম না। তবু বললাম, 'আমি তোমাকে সম্পূর্ণই বিশ্বাস করি, নাতাশা। আসলে আমি কখনও ঠিক অমনটা আশা করিনি।'

নগ্ন দুই জানুর ওপর চিবুক রেখে নাতাশা এমন ভাবে নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে রয়েছে, যেন কোনো বিষাদ প্রতিমা। সেই মুহূর্তের চেয়ে ওকে আমার আর কখনও এত ভালো লাগেনি। আমি নিজেই হতাশায় ম্লান হয়ে উঠেছি, ওকে তার চাইতে আরও বেশি ম্লান মনে হচ্ছে। আমি জানি পেছনে যে পড়ে থাকে, তাকেই সহ্য করতে হয় দুর্বিসহ যন্ত্রণা।

'তুমি বিশ্বাস করবে কিনা জানি না নাতাশা, আমি তোমাকে সত্যিই ভালোবাসতে চেয়েছিলাম।'

'মিথ্যে কথা!' ছিলা ছেঁড়া ধনুকের মতো নাতাশা ছিটকে উঠলো। আর ঠিক তখনই আমি আমার নিজের ভুলটা বুঝতে পারলাম। 'আমরা

কেউ কোনোদিনই কাউকে ভালোবাসতে চাইনি, রবার্ট। ঘটনাচক্রেই আমরা কিছুদিনের জন্যে পরস্পরের কাছে এসেছিলাম. এখন আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছি। আসলে আমরা কেউ কাউকে কোনোদিন বুঝতে চাইনি।'

আশা করছিলাম ও বুঝি এখুনি আমার জার্মান চরিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করবে এবং মনে মনে আমি প্রস্তুতিও নিয়েছিলাম যে ওর কোনো ধারণারই বিরোধিতা করবো না। নাতাশা কিন্তু তার ধারেকাছেও ঘেঁষলো না, বরং ঋজু স্বরে বললো, 'একদিক থেকে এটা অবশ্য ভালোই হলো। আমি নিজেই তোমাকে ছেড়ে যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু কিভাবে তোমাকে জানাবো শুধু সেটাই ভেবে পাচ্ছিলাম না।'

বুকের মধ্যে প্রচ্ছন্ন একটা বেদনা অনুভব না করে পারলাম না। 'সত্যিই তুমি আমাকে ছেড়ে যেতে চেয়েছিলে, নাতাশা?'

'হ্যাঁ, অনেকদিন ধরেই কথাটা ভাবছিলাম। কেননা দীর্ঘদিন আমরা একসঙ্গে রয়েছি। এ ধরনের ব্যাপার যত সংক্ষিপ্ত হয় ততই মধুর।'

'তবু এতদিন অপেক্ষা করে থাকার জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ না জানিয়ে পারছি না, নাতাশা।'

দীর্ঘ ভ্রূদুটোকে ধনুকের মতো বেঁকিয়ে নাতাশা তাকালো আমার দিকে। 'কেন?'

'তুমি না থাকলে আমার নিজেকে সত্যিই ভীষণ নিঃসঙ্গ মনে হতো।'

'মিথ্যে কথা।'

'মিথ্যে নয়, নাতাশা।'

'থাক, আর কিছু বলতে হবে না। বা আমার দিকে তাকাতেও হবে না।'

চকিতে উঠে নাতাশা পোশাক পরতে লাগলো। আমি খোলা জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলাম। বেহালায় কে যেন 'লা পালোমা' অনুশীলন করছে। আট মাত্রায় পৌঁছে বারবার ভুল করছে, বারবারই সেই ভুল আবার সংশোধন করার চেষ্টা করছে। আমার কেনই যেন মনে হলো

—আমি যদি ফিরে নাও যেতাম, আমাদের দুজনের মধ্যে এই যে সম্পর্ক, স্বাভাবিক ভাবেই এ একদিন শেষ হয়ে যেতো।

দরজা খোলার শব্দে আমি ঘুরে তাকালাম। নাতাশা বললো, 'আমার সঙ্গে আসার দরকার নেই, আমি একাই চলে যেতে পারবো। আর আমার সঙ্গে কখনও যোগাযোগ করার চেষ্টা কোরো না।'

ওর দিকে ভালো ভাবে তাকাবার আগেই দরজাটা বন্ধ হয়ে গেলো।

আমি ওর পেছন পেছন ছুটে যাইনি বা অসহায়ের মতো আর্তনাদও করে উঠিনি। কয়েক মুহূর্তের জন্যে শুধু স্থাণুর মতো চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলাম। তারপর পেয়ালা পিরিচ গেলাস সরিয়ে টেবিলটা পরিষ্কার করলাম, উপচে ওঠা ছাইদানীটা জানলার কাছে নিয়ে গিয়ে খালি করলাম। আর তখনই মনে হলো একটা ট্যাক্সি নিলে হয়তো নাতাশাকে নিশ্চয়ই ধরতে পারবো, কিন্তু তার পরের নাটকীয় দৃশ্যটার কথা ভাবতেই আমি মনে মনে সঙ্কুচিত হয়ে উঠলাম। অবশেষে ঠিক করলাম পোশাক পালটে বাইরে থেকে একটু ঘুরে আসবো।

সিঁড়ির নিচে মেলিকভের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। কিছুটা অবাক হয়েই ও প্রশ্ন করলো, 'নাতাশাকে বাড়ি পৌঁছে দাওনি?'

'না, ও একাই যেতে চেয়েছিলো।'

মেলিকভ ছোট্ট করে হাসলো। 'বুঝতে পেরেছি। ও নিয়ে তোমাকে কিচ্ছু ভাবতে হবে না। কয়েকদিন পরে দেখবে ও আবার নিজে থেকেই এসে হাজির হয়েছে।'

ক্ষীণ একটা আশাকে আঁকড়ে ধরার ভঙ্গিতে আমি বললাম, 'তোমার কি সত্যিই তাই মনে হয়, ভ্লাদিমির?'

'নিশ্চয়ই। ও নিয়ে তুমি একটুও মন খারাপ করো না। বরং এসো, দুজনে একটু পান করা যাক।'

কেনই যেন মনে হলো দুজনে একসঙ্গে পান করলে বা দাবা খেললে নাতাশা নিশ্চয়ই আবার ফিরে আসবে কিংবা ফোন করবে। কেননা ঠিক এমনি ভাবে দুজনের ছাড়াছাড়ি হবে আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি,

তাছাড়া আমার জাহাজ ছাড়তে এখনও দু সপ্তা বাকি।

'ধন্যবাদ, ভ্লাদিমির। তোমার শুনানির খবর কি?'

'এখনও সপ্তাখানেক বাকি। জানি না তারপর কি হবে।'

'তোমার কি মনে হয় ওরা তোমাকে সত্যিই অপরাধী সাবস্ত করবে?'

'ওরা যেকোনো লোককেই অপরাধী সাবস্ত করতে পারে।'

'প্রমাণ ছাড়াই?

'কোনো কিছু প্রমাণ করাটা ওদের পক্ষে আদৌ কঠিন নয়, রবার্ট।

তারপর নাতাশার সঙ্গে আমার আর কখনও দেখা হয়নি। হয়তো আমরা দুজনেই পরস্পরের সংকেতের প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়েছিলাম। যতবারই আমি ওর বাড়ির পাশ দিয়ে গেছি কিংবা কাঁচের জানলায় সাজানো সম্রাজ্ঞী ইউজিনের টায়রাটা চোখে পড়েছে, ততবারই আমার বুকে ভেতরটা নিঃশব্দ যন্ত্রণায় মুচড়ে উঠেছে। যতবারই ওকে ফোন করার জন্যে তীব্র আর্তি অনুভব করেছি, প্রতিবারেই নিজেকে আপ্রাণ বোঝাবার চেষ্টা করতে হয়েছে—এতে কোনো লাভ হবে না, এ নিজের ছায়ার পেছনে ছোটা ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু স্মৃতি কাউকে অত সহজে ছেড়ে কথা কয় না। এখন আমার কেন জানি প্রায়ই মনে হয় নাতাশা মুখে যতটা স্বীকার করতো, আমাকে ও তার চাইতে অনেক বেশি ভালোবাসতো। যদিও ভাবনাটা আমাকে একেবারে নিঃসীম হতাশায় ভরিয়ে তোলে, তবু দেশে ফেরার উত্তেজনার সঙ্গে তাকে মিশিয়ে কোনো রকমে দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করেছি। যতবারই রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেছি, তন্নতন্ন করে নাতাশাকে খুঁজেছি, কিন্তু পলকের জন্যেও ওর সঙ্গে আমার আর দেখা হয়নি।

মেলিকভের এক বছরের জন্যে কারাদণ্ড হয়ে যাওয়ায় শেষের কটা দিন আমাকে নিঃসঙ্গই কাটাতে হলো। পারিশ্রমিকের অঙ্গ হিসেবে সিল-ভারস আমাকে অতিরিক্ত পাঁচশো ডলার দিয়েছেন। নতুন কিছু ছবি

কেনার জন্যে উনি আর কয়েক দিনের মধ্যেই ফ্রান্সে যাচ্ছেন। আমাকে বারবার করে অনুরোধ করেছেন আমি যেন চিঠির মাধ্যমে ওঁনার সঙ্গে যোগাযোগ রাখি। আমিও যোগাযোগ রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। একটা ব্যাপারে মনে মনে কিছুটা স্বস্তি পেলাম, অত্যন্ত সাধারণ কোনো প্রয়োজনে উনি যদি ইউরোপ যেতে পারেন, আমার ইউরোপ যাত্রাই বা শুভ হবে না কেন?

আমি আবার অপরিচিত একটা পৃথিবীতে ফিরে এসেছি। আমি চলে আসার পর থেকে ব্রুসেলস যাদুঘরে কি ঘটেছে কেউ কিছুই জানে না। যিনি আমার প্রাণ রক্ষা করেছিলেন তাঁকে অনেকেই চিনতো, কিন্তু তাঁর শেষ পরিণতি সম্পর্কে কেউই আমাকে স্পষ্ট করে কিছু বলতে পারেনি। দীর্ঘ কয়েক বছর আমি সেই তত্ত্বাবধায়ক আর তাঁর হত্যাকারীদের খোঁজার চেষ্টা করেছি। বৃথাই খুঁজেছি আমার বাবাকে। জার্মানীতে ফিরে আসার পর নিঃসীম তিক্ততায় আমার প্রায়ই কানের কথা মনে পড়েছে। ওর ধারণাই ঠিক—একদিন যে আমরা গোপন কোনো সংগঠনের সভ্য ছিলাম, এখন সেকথা আর কারুর মনে নেই। জাতীয় স্বার্থে এতদিন যে কাজ ওরা করেছে তার দায়িত্ব সম্পর্কেও ওরা সম্পূর্ণ উদাসীন। বলা যায় না, জার্মানীতে কয়েকদিন আগেও যে গ্যাস চেম্বার বা বন্দীশিবির বলে কিছু ছিলো, হয়তো সেকথাও ওরা এখন ভুলে গেছে। এ এমনই এক অদ্ভুত দেশ, যেখানে শুরু হয়েছে হত্যাকারীদের এক নতুন প্রজন্ম, যেখানে প্রতিদিনই হাজার হাজার মানুষ অন্য নামে ফিরে আসছে তার স্বদেশ-ভূমিতে।

একটু একটু করে নাতাশার স্মৃতি আমার কাছে তীব্র থেকে আরও তীব্রতর হয়ে উঠেছে। বেদনা বা অনুতাপ নয়, আমার জীবনে ওর প্রকৃত অর্থটা যেন এখন স্পষ্ট অনুভব করতে পারছি। তিক্ত হতাশা আর ব্যর্থ অনুসন্ধানের আগুনে স্মৃতির ধাতুপিণ্ড এখন গলে খাঁটি সোনায় পরিণত হয়েছে। এখন আমি বুঝতে পারি নাতাশা আমার জীবনে এক দুর্লভ

অভিজ্ঞতা। তবু একটা ব্যাপারে আমি সুনিশ্চিত—আমি যদি নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে না পারতাম, নাতাশাকে অতদিন আমার কাছে ধরে রাখতে পারতাম না। অন্য দিকে আবার আমি যদি ওকে হালকা ভাবে গ্রহণ না করতাম, তাহলে নিজের স্বাতন্ত্র্যও বজায় রাখতে পারতাম না। কখনও কখনও মনে হয় জার্মানীতে যে এমনটা ঘটবে যদি আগে জানতে পারতাম, তাহলে হয়তো আমেরিকাতেই থেকে যেতাম। কখনও আবার মনে হয় এখানে এসে যাকিছু জেনেছি, ওখানে থাকলে তার কিছুই আমার জানা হোতো না। সেই সঙ্গে এটাও ভালো করে জানি এখন আর ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। কেউই ফিরে যেতে পারে না, কেউ বা কোনোকিছুই চিরকাল এক রকম থাকে না। কেবল কখনও কখনও মনে পড়ে যেতে পারে কোনো এক বিষণ্ণ সন্ধ্যার কথা, কেননা একমাত্র বিষণ্ণতাই মানুষ যাকে স্পষ্ট করে উপলব্ধি করতে পারে।